আমি বিশ্বাস করি

বিমল মিত্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

AMI BISWAS KARI

[I BELIEVE]

Bimal Mitra

A Collection of autobiographical Sketches

Published by

BISWABANI PRAKASHANI,

79/1B Mahatma Gandhi Road, Cal-700009.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :

গৌতম রায়

মুদ্রাকর :

রণজিৎকুমার মণ্ডল

লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস

৬ শিবু বিশ্বাস লেন,

কলকাতা-৬

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্য জানাই যে সম্প্রতি শতাধিক উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-মহলে আমার জনপ্রিয়তার ফলেই এই দুর্ঘটনা সম্ভব হয়েছে। ও-নামে কোনও দ্বিতীয় লেখক নেই। একজন পুরো দাগী আসামীরই এই কীর্তি। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়াআমার লেখাপ্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। আমার বই কেনবার আগে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে সেদিকে দৃষ্টি দেন।

॥ বিমল মিত্রের এযাবৎ লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা ॥

[এই তালিকা-ভুক্ত বইগুলি ছাড়া বাজারে বিমল মিত্রের নামে যে শতাধিক বই চলছে তার সবগুলিই জাল ।]

কড়ি দিয়ে কিনলাম
বেগম মেরী বিশ্বাস
সাহেব বিবি গোলাম
একক দশক শতক
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
একক দশক শতক (নাটক)
পতি পরম গুরু
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন
চার চোখের খেলা
নফর সংকীর্তন
শ্রেষ্ঠ গল্প
সখী সমাচার
সাহিত্য বিচিত্রা
মিথুন লগ্ন
ফুল ফুটুক
ও হেনরির গল্প (অনুবাদ)
মন কেমন করে
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)
অন্যরূপ
নিশি পালন
কন্যাপক্ষ
সরস্বতীয়া
বরনারী (জাবালি)
চলো কলকাতা
বেনারসী
কুমারী ব্রত
তিন নম্বর সাক্ষী

পরস্ত্রী
রাগ ভৈরব
দু চোখের বালাই
এর নাম সংসার
চাঁদের দাম এক পয়সা
লজ্জাহরণ
রাজা বদল
স্ত্রী
কথা চরিতমানস
বিষয় বিষ নয়

আসামী হাজির
এক রাজার ছয় রানী
প্রথম পুরুষ
গুলমোহর
রাণী সাহেবা
আমি
কাহিনী সপ্তক
কলকাতা থেকে বলছি
বাহার
বিমল মিত্রের গল্পসম্ভার
মৃত্যুহীন প্রাণ
টক ঝাল মিষ্টি
পুতুল দিদি
মনে রইলো
হাতে রইলো তিন
দিনের পর দিন
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
তোমরা দু'জনে মিলে
তিন ছয় নয়
নিবেদন ইতি
রং বদলায়
সুয়োরানী
নবাবী আমল
নটনী
বিনিদ্র
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
যে যেমন

শ্রীসাগরময় ঘোষ

সুহৃদ্বরেষু

ভ্রম সংশোধন

"৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত "সুতরাং এটা আমার প্রকাশিত রচনা হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবি নামঞ্জুর হয়ে গেল।"

এর পরিবর্তে পড়তে হবে—

"সুতরাং এটা আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবি নামঞ্জুর হয়ে গেল।"

বক্তব্য

সৃষ্টিশীল সাহিত্য-রচনার অনবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার মধ্যেও প্রত্যেক লেখকের জীবনে কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর ঘটনা ঘটে। সেই বিভ্রান্তির কবলে পড়ে অনেক-বার আমারও ধ্যানভঙ্গ হবার আশঙ্কা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক মানুষ হওয়ার অপরাধে সমস্ত কিছু আমি নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ব্যস্ততা এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি স্বীকার করেও এমন কিছু রচনা আমাকে লিখতে হয়েছে যা আমার ইচ্ছানুকূল নয়। বর্তমান গ্রন্থের সমস্ত রচনাগুলিই তাই সেই ধ্যানভঙ্গের ফলশ্রুতি। নিজের সম্বন্ধে নিজের কলমে কিছু বলার ধৃষ্টতা আমার কোনও কালে ছিল না এবং এখনও নেই। কিন্তু সম্পাদক বন্ধুদের ভালবাসার তাগিদে অনেকবার আমাকে সেই ধৃষ্টতাও প্রকাশ করতে হয়েছে। তাতে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা আমি জানি না, তবে এই রচনাগুলির মাধ্যমে আমি নিজেকেও যে কিঞ্চিৎ জানতে পেরেছি সেইটুকুই যথেষ্ট। সেইটুকুই আমার পরম লাভ বলে আমি স্বীকার করে নিয়েছি। 'এক নং বর্মণ স্ট্রীট', 'আমি বিশ্বাস করি', এবং 'চিত্র ও নাটক নিয়েই চিত্রনাট্য'—এই তিনটি রচনা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাহিত্যের অন্তরালে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি অখ্যাত-নামা পত্রিকায়, সম্পাদকের বিশেষ অনুরোধে। 'আমি লেখক নই' প্রবন্ধটি তেমনি দিল্লীর কালিবাড়ির সংলগ্ন দুর্গোৎসব কমিটির প্রচার-পুস্তিকার সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত হয়েছিল। 'তেরো বছরের সালতামামি' প্রবন্ধটি লিখেছিলাম 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে। যাঁরা কোনও লেখক-বিশেষের অনুষাঙ্গিক যন্ত্রণা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পরিচয় পেতে চান তাঁদের কাছে এগুলির কিছু মূল্য হয়ত থাকতে পারে। আর আমার দিক থেকে এগুলি শুধু নিজেকে জানার কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টার ক্ষীণ স্মৃতি-মন্থন মাত্র। 'গল্প লেখার গল্প' রচনাটি বেতারে পরিবেশনের জন্য লিখিত এবং পঠিত হয়েছিল। আমার সমগ্র রচনাবলীর সম্যক বিচারে এগুলি যদি আমার পাঠক-পাঠিকাদের কিছু সাহায্য করে তাহলেই আমি কৃতার্থ বোধ করবো।

এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট

আমার ওপরে এমন একটি বিষয় লেখবার নির্দেশ এসেছে যার সঙ্গে আমি নিজে শুরু থেকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আর এ এমন একটা বিষয় যাতে নিজের কথা কিছু-না-কিছু বলতেই হবে। তবু বলে রাখি 'দেশ' পত্রিকার সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে এখানে যদি আমার সেই 'আমি' কোনওভাবে আমার অগোচরেও প্রকাশ হয়ে পড়ে তো তা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করলে আমি খুশী হবো।

সাংস্কৃতিক জগতে তখন দু'টি ঠিকানা ছিল সুবিখ্যাত। প্রথমটি ছিল এক নম্বর গারষ্টিন প্লেস। সেখানে ছিল 'আকাশ-বাণী'র কলকাতা-কেন্দ্র। আর দ্বিতীয়টি ছিল এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট। সেখানে ছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'দেশ' কার্যালয়। পরে দু'টি ঠিকানাই স্থানান্তরিত হয়ে চৌরঙ্গীর সাহেব-পাড়ায় চলে যায়।

এই 'দেশ' পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল, এবং পত্রিকা-জগতে তার কী গুরুত্ব তা তখন, সেই তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে আমাদের জানবার কথা নয়। তখনকার দিনে 'প্রবাসী'ই ছিল শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। তার সঙ্গে ছিল 'মাসিক বসুমতী' 'ভারতবর্ষ' আর 'বিচিত্রা'। এই চারটে পত্রিকায় লেখা ছাপা হলেই তখন লেখকরা ধন্য হতো, এবং এক কথায় বলতে গেলে লেখকরা জাতেও উঠতো।

প্রত্যেক যশাকাঙ্ক্ষী লেখকই চায় যে এমন পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হোক যেখানে স্বনামধন্য লেখকেরা লেখেন। তখনকার দিনে শরৎচন্দ্র লিখতেন 'ভারতবর্ষে' আর রবীন্দ্রনাথ লিখতেন 'প্রবাসী'তে। আর 'বিচিত্রা'তে লিখতেন রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র দু'জনেই। 'বিচিত্রা'র সম্পাদকের কৃতিত্ব ছিল এই যে তিনি এই দুই দিকপালকেই নিজের করতলগত করতে পেরেছিলেন। তাই উঠতি লেখকদের যত ভিড় ছিল এই তিনটি পত্রিকায়।

আমি যেমন এখনও অভাজন, তখনও ছিলাম ঠিক তাই। সেই সতেরো আঠারো বছর বয়েস থেকেই আমি ওই তিনটি পত্রিকায় নিয়মিত লিখে এসেছি, এবং রীতিমত সম্মান-দক্ষিণা পেয়েছি।

শেষকালে একদিন কেন জানি না মনে হলো যে, লিখে কিছু হয় না, লেখা কেউ পড়ে না, এবং লেখার কোনও পারমার্থিক মূল্যও নেই। সুতরাং লেখা ত্যাগ করে একদিন কলকাতা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলাম। তারপর জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যখন কিছু প্রজ্ঞা হয়েছে বলে মনে হলো তখন কলকাতায় ফিরে এসে দেখি এখানকার আবহাওয়া ফিরে গেছে। একজন পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই সে অবাক হয়ে গেল। বললে—কী হে, কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন ?

নিজের অনুপস্থিতির কারণ বলার পর সে বললে—তা এখন আবার লেখো না, এখন তো লেখার খুব কদর হচ্ছে, এখন বাজারে তো আবার বই-টই বিক্রি হচ্ছে খুব—

খবরটা আমার কাছে একটা আবিষ্কারের মতন। ঠিক করলাম লিখবো। আগে যে-যে পত্রিকার কাছ থেকে লেখবার জন্যে অনুরোধ-পত্র পেতাম, তাদের কাছে গিয়ে আবার নিজের গরজেই দেখা করলাম। শুধু দেখা করলাম না, এক-একটা গল্পও সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম। পুরোন পরিচয়ের সূত্র ধরে এই রকম প্রায় ছ'টা গল্প ছ'টি পত্রিকায় গিয়ে দিয়ে এলাম। আমি ফিরে এসে আবার লেখা শুরু করেছি দেখে সবাই খুশী হলেন। সবাই সসম্মানে গল্পগুলো পত্রস্থ করলেন।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটলো। ঘটনাটা বলি।

এক বন্ধুর সঙ্গে আমার রোজই দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতো। তিনি অফিসের পর রোজ কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে যেতেন। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি রুচিতে ছিলেন উন্নাসিক, তাই বসতেন তেতলার ব্যালকনিতে, যেখানে পেয়ালা-পিছু দাম পড়তো এক আনা বেশি। তাঁকে ঘটনাটা বললুম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ কোন্ কাগজে লেখা দিলেন ?

আমি বললাম—বসুমতী, যুগান্তর, বঙ্গশ্রী, আনন্দবাজার, প্রবাসী, মৌচাক—

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সে কি, 'দেশ' পত্রিকায় দিলেন না ?

'দেশ' পত্রিকার নাম শুনে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম। 'দেশ' নামে

একটা পত্রিকা আছে জানি, কিন্তু সেটা কি খুব প্রচলিত ? 'দেশ' কি তেমন কেউ পড়ে ?

বন্ধু বললেন—হ্যাঁ পড়ে, আজকাল কাগজটা উঠছে, আপনি তো বাঙলা দেশের বাইরে ছিলেন, তাই খবর পাননি—ওতেও একটা লেখা দিলে পারতেন—

জিজ্ঞেস করলাম—ওর সম্পাদক কে ?

বন্ধু বললেন—বঙ্কিমচন্দ্র সেন।

'দেশ' পত্রিকায় আমি তখনও লিখিনি বা আমাকে লিখতে কেউ অনুরোধও করেনি। আর কেনই বা অনুরোধ করবে ? আমি তো দেশ-ছাড়া। সেই-দিনই আমি বাড়িতে গিয়ে সারা রাত জেগে একটা নতুন গল্প লিখে ফেললাম। আর তার দু'দিন পরে সোজা এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অফিসে গিয়ে মন্মথ সান্যাল মশাইকে তা দিয়ে এলাম। বললাম—এই গল্পটা 'দেশ' পত্রিকার জন্যে লিখেছি, আপনি সম্পাদককে দিয়ে দেবেন—

পরের দিন যথারীতি কফি-হাউসে আমার বন্ধুকে গিয়ে সব বললাম। বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—গল্পটার প্লটটা কী ?

আমি সমগ্র গল্পটার কাহিনী আনুপূর্বিক বলে গেলাম। বন্ধু শুনে বললেন—আপনার এ গল্প তো 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হবে না।

আমি তো অবাক—আমার গল্প তো কোনও পত্রিকার সম্পাদক ফেরত দেন না। কারণ আমি তখন অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত। বন্ধু বললেন—না, ফেরত দেবেন অন্য কারণে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেন খুব নীতিবাগীশ মানুষ, আপনার গল্প অশ্লীলতার অপবাদে ছাপা চলবে না।

আমি তো মুশকিলে পড়লাম কথাটা শুনে। একই বছরে একসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প ছাপানোর উদ্দেশ্য ছিল পাঠকদের জানানো যে আমি অজ্ঞাতবাস শেষে আবার সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাবির্ভূত হয়েছি। তাহলে কী হবে ? বাড়িতে এসে সেই রাত্রেই আর একটা গল্প লিখে শেষ করে ফেললাম। বঙ্কিমচন্দ্র সেনকে আমি চিনি না। তাঁর রুচিবোধ সম্বন্ধেও আমার কোনও ধারণা নেই। আমি তাই এমন একটা গল্প লিখলাম যাতে স্ত্রী-চরিত্রের বালাই নেই। পরের দিনই আবার সেটা নিয়ে সোজা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অফিসে চলে গেলাম। মন্মথ সান্যাল মশাইকে গিয়ে সব ঘটনা সবিস্তারে বলার পর তিনি বললেন—আমি আপনার সে গল্প তো ওদের দিয়ে দিয়েছি—

আমি বললাম—সে-গল্পটা ওঁরা ছাপতে পারবেন না, তার বদলে আমি অন্য আর একটা গল্প লিখে এনেছি—

পাশেই মন্মথ সান্যাল মশাই-এর সহযোগী সুবোধ ঘোষ বসেছিলেন। সুবোধ ঘোষ বললেন—আপনি নিজে গিয়েই দিয়ে আসুন না—

জিজ্ঞেস করলাম—বঙ্কিম সেনকে তো আমি চিনি না—

সুবোধ ঘোষ বললেন—বঙ্কিমচন্দ্র সেন 'দেশ' অফিসে বসেন না, তাঁর এক সহযোগী আছেন, আসলে তিনিই সমস্ত সম্পাদকীয় কাজ-কর্ম দেখাশোনা করেন—তিনি নতুন এসেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কে তিনি? কী নাম তাঁর?

সুবোধ ঘোষ বললেন—সাগরময় ঘোষ।

এই হলো সূত্রপাত। চিৎপুরের এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের সেই পুরোন বাড়িটিতে 'দেশ' পত্রিকার দফতরে সেই আমার প্রথম প্রবেশ। সাল তারিখ মনে নেই। কিন্তু চিত্রটা স্পষ্ট মনে আছে। পুব দিকে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটা এক ফালি দোতলা বাড়ি। মাথায় টিনের এ্যাস্‌বেস্‌টোসের চাল আর দরমার সিলিং। ওপরে পর-পর তিনখানা ঘর। দক্ষিণের সুরেশচন্দ্র মজুমদার আর অশোককুমার সরকারের ঘর পেরিয়ে একটা ব্রিজ। সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে বাঁ দিকে মোড় ফিরতেই সরু লম্বা একটা করিডোর। করিডোর দিয়ে যেতে গেলে ডান দিকে প্রথমে পড়বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় অফিস। সেখানে বিরাট আকারের দু'টি টেবিল। একটিতে বসেন মন্মথ সান্যাল আর একটিতে সুবোধ ঘোষ। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পর বাঙলা সাহিত্যে আর কারো আবির্ভাব যদি সমসাময়িক কালে বিস্ময়-বিস্ফারিত রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে থাকে তো তা একমাত্র এই সুবোধ ঘোষ।

এই সুবোধ ঘোষই ছিলেন আমাদের তৎকালীন সাহিত্য-কেন্দ্রের মধ্যমণি। চোরবাগানের বালক দত্ত লেনের অখ্যাত একটি মেসের একটা অন্ধকার। ঘরের বাসিন্দা এই সুবোধ ঘোষ সেদিন সাহিত্য সংসারে যে-আলোড়ন তুলেছিলেন তা আমাদের সকলের স্মৃতিতে এখন ইতিহাস হয়ে আছে।

কিন্তু সুবোধ ঘোষের প্রসঙ্গ এখন থাক। তার আগে সেদিন 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথাটা বলি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় দফ্‌তর ছাড়িয়ে পাশের ঘরটিই ছিল লাইব্রেরী-ঘর। আর সেই লাইব্রেরী-ঘরের পরেই ছিল 'দেশ' পত্রিকার দফ্‌তর। জায়গাটা একটু ছায়া-ছায়া। ছায়া-ছায়া কারণ একটা মস্তবড় কদমগাছ তার ঝাঁকড়া মাথার ডাল-পালা-পাতা বিস্তার করে জায়গাটাকে ঘিরে থাকতো। অত বড় কদমগাছ কলকাতা শহরের কেন্দ্রে বড় একটা দেখা যায় না। তার যেমন ঘন সবুজ পাতার ঘন-ঘটা, তেমনি সমস্ত বর্ষাকালটা ধরে তার অসংখ্য ফুল-সম্ভারের সমারোহ আর সৌরভ জায়গাটাকে দিন-রাত মোহাবিষ্ট করে রাখতো। তারই তলায় করিডোরের শেষ প্রান্তে ছিল নিচেয় যাবার আর একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে প্রেসের কম্পোজিটাররা যাতায়াত করতো। আর দরকার হলে ওই সিঁড়িটা বাইরের সদর রাস্তায় যাওয়ার খিড়কী পথ হিসেবেও ব্যবহার করা হতো।

আগে ওই রাস্তা বা ওই করিডোর দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি কিন্তু 'দেশ' পত্রিকার দফ্‌তরে কোনও দিন ঢুকিনি বা ঢোকবার প্রয়োজন হয়নি। 'দেশ' পত্রিকায় লিখলে যে সে-লেখা ভদ্র শিক্ষিত চক্ষুষ্মান পাঠকের নজরে পড়ে তা-ও কখনও মনে হয়নি।

কিন্তু এবার ঘটনাচক্রে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি দরজার দিকে মুখ করে এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। টেবিলে কিছু কাগজপত্র। তিনি সেই সব নিয়ে ব্যস্ত। আমি যেতেই তিনি মুখ তুললেন। অনুমান করে নিলাম ইনিই সেই সাগরময় ঘোষ। যাঁর কথা সুবোধ ঘোষ বলেছেন।

সামনে গিয়ে বললাম—আমার নাম অমুকচন্দ্র অমুক—মন্মথ সান্যাল মশাই আপনাকে কি আমার লেখা একটা গল্প দিয়েছেন ?

সাগরময় ঘোষ বললেন—হ্যাঁ।

—সেই গল্পটা ফেরত দিন, সেটা আপনার কাগজে চলবে না, আমি শুনেছি—

সাগরময় ঘোষ একটু বিস্মিত হলেন। বললেন—কেন চলবে না ?

আমি বললাম—আমার এক বন্ধু বলেছে আপনাদের যিনি সম্পাদক তিনি নাকি একজন গোঁড়া নীতিবাগীশ লোক, ও-গল্পটা ছাপাতে তাঁর রুচিবোধে বাধবে। তার বদলে আমি আর একটা নতুন গল্প লিখে এনেছি—

বলে আমার হাতের গল্পটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু সাগয়ময় ঘোষ সেটা নিলেন না। টেবিলের ড্রয়ার খুলে আমার সেই

আগেকার দেওয়া গল্পটাই বার করলেন। বললেন—আপনি বসুন, আমি এটা আগে পড়ে দেখি—

বলে গল্পটা পড়তে লাগলেন আর আমি সামনের চেয়ারে চুপ করে বসে রইলাম। সেকেণ্ড-মিনিট কাটতে লাগলো মার্চ করে করে সঙ্গীন খাড়া করে। খানিকক্ষণ পরে তিনি মুখ তুললেন। বললেন—আমি এই গল্পটাই ছাপবো—

—ছাপবেন ?

—হ্যাঁ—বলে তিনি পাণ্ডুলিপিটা স্বহস্তে আবার ড্রয়ারের খোলের ভেতরে রেখে দিলেন।

আমি তবু বললাম—কিন্তু কেন মিছিমিছি এ-ঝুঁকি নিচ্ছেন ? আমি তো আপনার জন্যে অন্য একটা নিরাপদ গল্প এনেছি, এইটেই ছাপুন! ও-গল্পটা ছেপে শেষকালে আপনার যদি কোনও বিপদ হয় ?

কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। সেই আগেকার গল্পটা রেখে দিলেন।

আমি সদ্য লেখা গল্পটা নিয়ে সোজাসুজি 'বঙ্গশ্রী' অফিসে গিয়ে দিয়ে এলাম।

পরের দিন আমার বন্ধুর সঙ্গে যথা-জায়গায় আবার দেখা হলো। সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম। তিনি বললেন—দেখবেন, ও-গল্প আপনার ছাপা হবে না।

আমি বললাম—কিন্তু তিনি যে সমস্ত পড়ে বললেন—ওটা ছাপবেনই—

বন্ধু বললেন—বললে কী হবে, সাগরময় ঘোষ তো আর সম্পাদক নন্, সম্পাদক তো বঙ্কিমচন্দ্র সেন—

তা এই-ই আদিযুগের সেই সাগরময় ঘোষ। এমন এমন দিন গেছে যেদিন সমস্ত অফিস ছুটি, আশে পাশে কেউ কোথাও নেই, এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের 'দেশ' সাপ্তাহিকের দফতরে সেই ছোট টেবিলটার সামনে বসে সাগরময় ঘোষ একলা সম্পাদকীয় কাজ-কর্ম করে চলেছেন। তখন আমাদের সকলের নতুন উৎসাহ, কম বয়েস। সাহিত্যই আমাদের নেশা, সাহিত্যই আমাদের ধ্যান, সাহিত্যই আমাদের ধারণা। যে-সব রচনা ডাকযোগে সম্পাদকের নামে আসে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়াই সম্পাদকের পবিত্র দায়িত্ব। আজকাল সে-পবিত্র দায়িত্ব কেউ পালন করেন কিনা জানা নেই, কিন্তু তখন তা পালন করা হতো। এখন নাম-করা লেখকদের লেখার পাণ্ডুলিপি পেলে তা আর আগে পড়া হয়

না। সঙ্গে সঙ্গে তা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনকার দিনে নিমন্ত্রিত লেখাও আগে পড়া হতো এবং অমনোনীত হলে অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে তা লেখককে ফেরত দেওয়াও হতো।

এই সাগরময় ঘোষের সহকারী হিসেবে তখন কাজ করতেন আর একজন। তাঁর নাম শ্রীঅদ্বৈত মল্লবর্মণ। ছোট আকারের শরীর, ততোধিক ছোট একটা টেবিলে বসে তিনি-নিখুঁত নিষ্ঠার সঙ্গে 'দেশ' সাপ্তাহিকের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতেন। বেশির ভাগ দিনই তাঁকে দেখা যেত না। কারণ আমরা যারা বাইরের লোক তারা বেশির ভাগই বিকেলের দিকে গিয়ে হাজির হতাম। তখন তিনি কাজ শেষ করে বাড়ি চলে গেছেন।

এক-একজন মানুষ থাকে যারা সব সময়েই নিজেকে আড়াল করতেই ব্যস্ত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন আসলে সেই জাতীয় মানুষ। তাই বিকেল বেলার দিকে যে আমাদের লেখকদের জমায়েত হতো তাতে তিনি নিয়মিতভাবেই অনুপস্থিত থাকতেন। শুনেছিলাম উত্তর কলকাতার একটা বাড়ির ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি পুরোন-বইএর পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে পুরাতত্ত্ব নিয়ে অবসর সময়টুকু যাপন করতেন।

কিন্তু তিনি যে ভেতরে ভেতরে উপন্যাস লিখতেন তা আমরা জানতুম না। নিজে চাকরি করতেন 'দেশ' পত্রিকায়, কিন্তু একদিন অন্য একটি অখ্যাত পত্রিকায় তাঁর একটি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সে-উপন্যাসটির নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—এত কাগজ থাকতে আপনি ওই পত্রিকায় লিখছেন যে?

অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেছিলেন—ওঁরা চাইলেন—

আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওটা তাঁর সত্যভাষণ নয়। আসল কথা হলো তিনি 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই সেই পত্রিকার পাতার ওপর তাঁর নিজের লেখার বোঝা চাপাতে চাইতেন না। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে দেখে আমার মনে হতো তিনি যেন সব সময় নিজেকে নিয়ে বিব্রত, কিম্বা নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিড়ম্বিত। অথচ তাঁর এমন সাহস ছিল না যে সেই দুর্ভাগ্যের বিবরণ অন্য কাউকে শুনিয়ে নিজের বোঝা লাঘব করেন।

এই অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথা পরে আরো বলবো।

মনে আছে সেই সময়ে সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' নামে একটা উপন্যাস

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল। একে তো যুদ্ধের সময়কার দুর্ভিক্ষের পটভূমিকার ওপরে সেটি লেখা, তার ওপর সুবোধ ঘোষের তীক্ষ্ণ কলম। সুবোধ ঘোষ তখন ক্রেজ্। তাঁর লেখা তখন পড়তে পায় না পত্রিকায়। আড্ডাবাজ মানুষ তিনি। অফিসে তাঁর কাজের চাপ কম, কিম্বা যাঁরা লেখার সূত্রে অফিসে আসেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাও হয়ত তাঁর কাজের একটা অঙ্গবিশেষ। যখন গল্প বলতে বসেন তখন আর আমরা কলকাতায় থাকি না, একেবারে সশরীরে চলে যাই কখনও বিহারের কোনও অসমতল পার্বত্য অঞ্চলে কিম্বা কখনও চলে যাই ভারত মহাসমুদ্রের এডেন, পোর্ট সৈয়দ বন্দর ছাড়িয়ে একেবারে আফ্রিকার টিম্‌বাকটোতে।

আমরা শ্রোতার দল সুবোধ ঘোষের গল্প শুনতে শুনতে একেবারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। গল্প বলার একটা বিশেষ আকর্ষণীয় ভঙ্গি ছিল সুবোধ ঘোষের যা শুনতে শুনতে আমাদের সময়-অসময় জ্ঞান থাকতো না কখনও। উল্লেখ করা ভালো যে এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট-এর ভৌগোলিক অবস্থানটা খুব সুবিধেজনক ছিল না। পুবে ফল-পট্টি, দক্ষিণে তরিতরকারীর বাজার, উত্তরে কী ছিল জানি না, কারণ সেদিকে যাবার দরকার হয়নি আমাদের কোনওদিন। আর পশ্চিমদিকে ছিল চিৎপুরের ট্রাম রাস্তা। কলকাতা শহরের সবচেয়ে নোংরা অঞ্চল বলতে যে-জায়গাটা বোঝায় 'দেশ' অফিসটা ছিল সেই জায়গার কেন্দ্রস্থলে। বেশি রাত হলে জায়গাটা ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠতো। কিন্তু আমরা প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বেলার দিকে সেখানে হাজির হতুম। আমাদের মনে হতো কলকাতা শহরে অমন সুন্দর শান্তিপূর্ণ চমৎকার জায়গা বুঝি আর দুটি নেই। রাস্তার ওপর গরু-মোষের খাটাল, দুর্গন্ধের ভারে রাস্তা চলাই দায়, তার ওপর একটু বেশি রাত হয়ে গেলে ও-পাড়ার কুখ্যাত গুণ্ডাদের কীর্তি-কলাপ আর অত্যাচারের কাহিনী শোনা ছিল। কিন্তু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ছিল না। আমাদের লোভ ছিল সুবোধ ঘোষের গল্পের ওপর।

এখানে বলে রাখা ভালো আমরা মানে কারা। আমরা মানে সাগরময় ঘোষ আর সুবোধ ঘোষ ছাড়া আরো চার-পাঁচ-ছ' জন। এখানে আসতেন সুশীল রায়, আর আসতেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দু'জনেরই বেশ কবিখ্যাতি হয়েছে তখনই। আর আসতেন প্রভাত দেবসরকার। গল্প লেখক। আসতেন ব্যাঙ্কের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। আর ডিউটি না থাকলে এসে বসতেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তখন সুবিখ্যাত গল্পলেখক। নরেন্দ্রনাথ

আমাদের মধ্যে বসে থাকতেন বটে কিন্তু আমাদের আড্ডার স্রোতে তিনি পুরোপুরি গা ভাসাতেন কিনা বোঝা যেত না। শ্রাবণ মাসের আকাশের মতন জলদ গম্ভীরও নয় আবার শরৎকালের আকাশের মত রৌদ্রোজ্জ্বলও নয়। কখনও দম ফাটিয়ে তাঁকে হাসতেও যেমন দেখিনি আবার গভীর আঘাতে মুখভার করে থাকতেও দেখিনি কখনও তাঁকে। অথচ সব কাজের সব রসের কাজী এবং রসিক বলে তাঁকে আমরা চিনে নিয়েছিলুম। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হতো সব ব্যাপারে মনোযোগী হয়েও তিনি যেন সব সময়েই অন্যমনস্ক। গল্পের মধ্যেই তিনি হঠাৎ উঠে পড়তেন, বলতেন—যাই, ডিউটি আছে—

সুবোধ ঘোষের গল্প তখন মাঝপথে। আমরা সবাই হাঁ করে শুনছি। নীরেন চক্রবর্তী হঠাৎ সেই অবস্থায় বলে উঠলেন—সাগরদা, আর একবার চা হলে ভালো হতো—

সাগরময় ঘোষের কিছুতেই আপত্তি নেই, বললেন—হোক—

এই সব খাওয়া বা খাওয়ানোর ব্যাপারে নীরেন্দ্র চক্রবর্তীই প্রধান হোতা। নিজের পকেট থেকে নগদ দু'আনা পয়সা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন—সবাই দু'আনা করে বার করুন—

সস্তাগণ্ডার দিনকাল তখন। চার আনার মুড়ি আনলে দশ জনে খেয়ে কুলোন দায়। একটা আলুর চপ এক পয়সা। ডাক পড়লো অমরের। অমর সেন হয়ত এখনও আনন্দ-বাজারের একজন কর্মী হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু তখন সে ছেলেমানুষ। আমাদের যত উৎসাহ তার উৎসাহ তার চেয়ে দশগুণ বেশি।

—যাও অমর, এক টাকার তেলেভাজা মুড়ি আর চা নিয়ে এসো—

অমর সঙ্গে সঙ্গে টাকা নিয়ে উধাও। আর তার খানিক পরেই খাদ্য-সম্ভার নিয়ে এসে হাজির। আর তারপর 'দেশ' পত্রিকার সেই টেবিলের ওপর পুরোন খবরের কাগজ পেতে মুড়ি আলুর চপ ঢেলে দিত। আর সকলের হাতে-হাতে মাটির ভাঁড়ে চা। পরবর্তী জীবনে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হোটেলে গিয়ে কত দামী খাদ্য যে খেয়েছি তার বোধহয় ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেদিনকার সেই ১নং বর্মণ স্ট্রীটের সস্তা তেলে-ভাজা আর মাটির ভাঁড়ে চা খেয়ে যে-তৃপ্তি পেয়েছি তা বোধহয় আর কখনও পাইনি।

কিন্তু সুবোধ ঘোষের গল্প তখনও চলছে। বিকেল পাঁচটা বেজেছে ঘড়িতে। ছ'টাও বাজতে চললো। তারপর সাতটা। তারপর আটটা বাজে-বাজে…

গল্পের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছেন আনন্দবাজারের কানাইলাল সরকার। তখন তিনি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কানাই-লাল সরকার সাহিত্যের ওপর শ্রদ্ধাশীল, সাহিত্যিকের ওপরও তাই। তিনি কাজের লোক। গল্প করবার বেশি সময় তাঁর হাতে থাকে না, কিন্তু আবার আড্ডার লোভও সংবরণ করতে পারেন না সব সময়। তারপর এসেছেন আনন্দবাজারের তৎকালীন সার্কুলেশন ম্যানেজার ভূপেন গুহ মশাই। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও আড্ডায় তাঁর উৎসাহ তরুণদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

কোথা দিয়ে যে আমাদের সময় কেটে যেত আমরা তা টের পেতুম না। কিন্তু সুবোধ ঘোষের তাড়া ছিল। পাশের বাড়ি থেকে জরুরী তলব আসতো তাঁর। সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য তলব পাঠিয়েছেন। তাঁকে সম্পাদকীয় লিখতে হবে পরের দিনের কাগজের জন্যে।

আমরা ক্ষুণ্ণ হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতুম। তারপর ট্রামে চড়ে যে-যার বাড়ির দিকে। ট্রামে দক্ষিণ কলকাতার দিকে আসতুম সাগরময় ঘোষ, প্রভাত দেবসরকার, সুশীল রায়, পঙ্কজ দত্ত প্রভৃতি। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা উচিত যে পঙ্কজ দত্ত তখন ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত চলচ্চিত্র-সমালোচক। চলচ্চিত্র-সমালোচনাও যে এক উচ্চ পর্যায়ের শিল্পসৃষ্টি হতে পারে সেদিন তাঁর সেই সব রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন।

যা হোক, মনে আছে এই আড্ডাতেই একদিন এসে হাজির হলেন এম-সি-সরকার অ্যাণ্ড সন্স নামে গ্রন্থ প্রকাশনার কর্ণধার সুধীরচন্দ্র সরকার। সুধীর-চন্দ্র সরকার শুধু প্রকাশক নন, সাহিত্য-রসিকও বটেন। শরৎচন্দ্রের গোড়ার যুগে তিনিই তাঁর প্রথম ছ'টি বই-এর প্রকাশক। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান। তাঁর আগমনে আমরা সবাই বিস্মিত। কী চাই? না, সুবোধ ঘোষের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। 'দেশ' পত্রিকায় তখন 'তিলাঞ্জলি' নামে যে উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে সেটির প্রকাশন স্বত্ব তাঁর চাই।

অতি আনন্দের কথা। সুবোধ ঘোষকে ডাকা হলো। প্রস্তাব শুনে সুবোধ ঘোষের অরাজি হওয়ার কারণ নেই। তিনি বললেন—বেশ—

কিন্তু উপন্যাস শেষ হয়ে গেল একদিন। পাণ্ডুলিপি গেল সুধীর সরকার মশাইএর কাছে।

সুধীর সরকার মশাই 'তিলাঞ্জলি' বইটির পাণ্ডুলিপিখানা যথাসময়ে

ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে-খবর আমরা জেনেছিলাম। কিন্তু সেখানি পুস্তকাকারে বেরোতে কেন দেরি হচ্ছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলুম না।

ইতিমধ্যে সুধীরবাবু আবার একদিন এসে হাজির হলেন এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটে। তিনি সুবোধ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চান।

সাগরময় ঘোষ বললেন—কিন্তু সুবোধবাবু তো ছুটিতে আছেন—

—ছুটিতে? তাহলে কি তাঁর বাড়িতে যাবো? আমার খুব জরুরী দরকার ছিল তাঁর সঙ্গে—

সাগরময় ঘোষ বললেন—না, তিনি এখন অসুস্থ, হাসপাতালে আছেন—

—হাসপাতালে? কোন্ হাসপাতালে?

হাসপাতালের ঠিকানা নিয়ে সুধীরবাবু সেখানেই সুবোধ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হাসপাতালে সুবোধ ঘোষ সুধীরবাবুকে কী বললেন জানা নেই। কিন্তু পরদিনই সুধীরবাবু আবার এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটে এসে হাজির। একেবারে সোজা আমাদের আড্ডায়।

এসে বললেন—দেখুন সাগরবাবু, আমি এক মুশকিলে পড়েছি 'তিলাঞ্জলি' নিয়ে। বইটা তো অনেকদূর ছাপাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রুফ্ দেখতে গিয়ে ভাবছি এ-বই ছেপে কোনও বিপদে পড়বো না তো?

—কীসের বিপদ?

সুধীরবাবু বললেন—আমার সন্দেহ হচ্ছে এ-বই গভর্মেণ্টের চোখে আপত্তি-কর মনে হতে পারে—

সাগরময় ঘোষ বললেন—তা সুবোধবাবুকে এ-কথা বললেই পারতেন?

—বলেছিলুম, কিন্তু সুবোধবাবু বললেন—এখন তো আমি হাসপাতালে, এ-সম্বন্ধে সাগরময় ঘোষ যা বলবেন তাই-ই হবে, আপনি তাঁকে গিয়ে সব খুলে বলুন—

সাগরময় ঘোষ খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—তাহলে এক কাজ করুন, আপনার ফার্মের নামে 'তিলাঞ্জলি' ছাপতে যদি সঙ্কোচ হয় তো প্রকাশক হিসেবে আমার নাম ছেপে দিন। আপনি তো বই ছাপিয়েই ফেলেছেন, এখন যদি বই বাজারে না বার করেন তো আপনার অনেকগুলো টাকা লোকসান যাবে—তার চেয়ে আপনি টাইটেল-পেজএ আমার নাম-ঠিকানা ছাপিয়ে দিন, পুলিশ যদি ধরে তো আমাকেই ধরবে। না-হয় মনে করবো একটা সৎ কাজের জন্যে জেলই খাটলুম। জীবনে একবার তো জেল খেটেছি, জেল খাটার অভিজ্ঞতা আমার আছে, না-হয় আরো একবার জেল খাটার অভিজ্ঞতা হবে—

এ-কথার পর আর কথা চলে না। সুধীরবাবু রাজি হলেন। 'তিলাঞ্জলি' প্রেসে পাঠানো হলো। দিন কতক পরে তা ছেপেও বেরোল। প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হলো—শ্রীসাগরময় ঘোষ, ২০নং বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

মনে আছে সেই 'তিলাঞ্জলি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একটা তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে গেল সম-সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তখনকার দিনে কলকাতায় যে-কটি সাহিত্য-কেন্দ্র ছিল তার সবই কোনও-না-কোনও পত্রিকাকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত। পত্রিকাবিহীন সাহিত্য-কেন্দ্র ভালো করে মাটিতে শেকড় গজাতে পারে না। তখন এমনি পত্রিকা ছিল তিনটি। একটি হলো 'কবিতা', সেটি দক্ষিণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। সেখানে কবিদেরই ছিল বেশি জমায়েত। কারণ সে-পত্রিকায় কবিতা বা কাব্য-আলোচনা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশিত হতো না। দ্বিতীয়টি ছিল 'পূর্বাশা'। সেটির অবস্থান ছিল মধ্য কলকাতায়। সেখানে যশাকাঙ্ক্ষী কবি আর গল্পলেখক দু'দলেরই আনাগোনা ছিল। নতুন লেখকদের প্রতি 'পূর্বাশা' সম্পাদকের ছিল একটা আন্তরিক সহমর্মিতা। সম্পাদক তাঁদের নিজের কাছে ডাকতেন; তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা করতেন। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাঁদের কথা শোনবার চেষ্টা করতেন। আর তৃতীয় পত্রিকাটি ছিল কলকাতার উত্তর প্রান্তে। নাম—'পরিচয়'। 'পরিচয়' পত্রিকা ছিল বিশেষ করে উঁচু-মহলের। অর্থাৎ যাঁরা নিজেদের 'ইনটেলেকচুয়্যাল' বলে অপ্রকাশ্য-ঘোষণা করতেন তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত। এই পত্রিকা তিনটির যে-কোনও একটির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করার মধ্য দিয়ে তখনকার কবি-সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের বাসনা চরিতার্থ হতো। কিন্তু আমি ছোটবেলায় যখন লিখেছি তখন এই পত্রিকাগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতন ছিলাম। আসলে লেখার জগৎ থেকে অন্তর্ধান করবার পর এগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তির উদ্ভব হয়েছিল। আমার তখনকার আত্মপ্রকাশের প্রধান প্ল্যাটফরম ছিল মাত্র তিনটি পত্রিকা—'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' এবং 'বিচিত্রা'। সেগুলির সম্পাদকের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল ডাকঘর। কিন্তু ঘটনাচক্রে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক-স্থানীয়ের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে যাওয়ায় লেখা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত যোগসূত্র স্থাপিত হলো। সুবোধ ঘোষ আগে থেকেই এখানে ছিলেন। তারপরে 'দেশ'-এর আড্ডায় 'সত্যযুগ'

পত্রিকা থেকে এলেন নীরেন চক্রবর্তী, এলেন 'বিশ্বভারতী'র সুশীল রায়, এলেন গৌরকিশোর ঘোষ, প্রভাত দেবসরকার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আর এলেন নরেন্দ্র মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। মনে আছে শনিবার-শনিবার সন্ধ্যেবেলার দিকে 'দেশ' সাপ্তাহিকের সমস্ত আড্ডাটা স্থানান্তরিত হয়ে উঠতো বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সদানন্দ রোডের দোতলার ঘরখানাতে। 'দেশ' দফ্তরের মধ্যে যে-সব আলোচনা হতো সদানন্দ রোডেও তাই। সেখানেও সেই 'দেশ' প্রসঙ্গ। আমাদের তখন দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই কাটতো 'দেশ' প্রসঙ্গ নিয়ে। কানু ছাড়া গীত থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু 'দেশ' ছাড়া আলোচনা অসম্ভব। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় হয়ত তিন-চারটে গল্প লিখেছিলেন 'দেশ' পত্রিকায়, কিন্তু তার বেশি নয়। তবে মনে আছে তিনি এই আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিতেন। গল্প শুনতেন আর গল্প শোনাতেনও। বিশ্বনাথবাবুর গল্প শুনতে শুনতে আমাদের সকলের উপস্থিতি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতো। কেমন যেন একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা গড়ে উঠতো পরস্পরের মধ্যে। এই যে আত্মীয়তা বোধের সৃষ্টি হওয়া, এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ আর সুশীল রায়ের। মনে আছে প্রধানত নীরেন চক্রবর্তীর প্রস্তাবেই মাঝে মাঝে দল বেঁধে বিভিন্ন বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আর জলযোগের ব্যবস্থা হতো। এভাবে কখনও গিয়েছি সুশীল রায়ের বাড়িতে, কখনও নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে। একবার মনে আছে নারায়ণ চৌধুরীর আহ্বানে তাঁর বাড়িতে জমায়েত হয়েছিলাম। আর একবার গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যির ছাদের ওপর। আর সুশীল রায়ের বাড়িতে ছিল আমাদের বার্ষিক জমায়েত। উপলক্ষ্য ছিল সুশীল রায়ের জন্মদিন পালন। সেটা সাধারণত পুজোর অল্প কয়েকদিন আগেই অনুষ্ঠিত হতো। অর্থাৎ পুজো-সংখ্যা প্রকাশের ঠিক অব্যবহিত আগে। যাঁরা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তাঁদের তখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকতো না। কিন্তু সুশীল রায়ের বাড়ির সেই আন্তরিক আহ্বান আর সেই ভূরিভোজনের আকর্ষণ আমাদের কাছে ছিল লোভনীয়। আমাদের মধ্যে যাঁরা লেখক তাঁদেরও তখন সময়াভাব, কিন্তু পুজোর কাজের তাড়া থাকলেও সুশীল রায়ের বার্ষিক জন্মোৎসবে আমাদের কাজ-অকাজের প্রশ্ন নেই, আমরা ঠিক সময়েই গিয়ে হাজির।

সুশীল রায়ের বাড়ির সামনে ছিল একটা লম্বা ফুটবল খেলার মাঠ। একবার সবাই হাজির হয়েছি। খাওয়া-দাওয়া শেষ। খেয়ে শরীর ভার। এমন সময়

দেখি পাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলছে সেখানে। সুশীল রায় জিজ্ঞেস করলেন—আসুন, আমরা সবাই মিলে বল খেলি, খেলবেন? ইয়ং ভার্সাস ওল্ড।

সুবোধ ঘোষই ছিলেন এ-সব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। তিনি প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—হ্যাঁ, রাজি। বলেই সোজা তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। তখন তিনি থাকতেন কাঁকুলিয়া রোডের একটা বাড়িতে। সেখান থেকে খেলার পোশাক হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট পরে এসে হাজির হলেন।

সঙ্গের আমরা আর রাজি না হয়েই বা কী করি। মন্মথনাথ সান্যাল, সাগরময় ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত দেবসরকার, নীরেন চক্রবর্তী সবাই সঙ্গে সঙ্গে মালকোঁচা মেরে মাঠে নেমে পড়েছেন। সুশীল রায় ততক্ষণ ছেলেদের বলে আমাদের সঙ্গে তাদের খেলতে রাজি করিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু মুশকিল আমারই। আমি তখন ধারাবাহিক একটা উপন্যাস লিখছি 'দেশ' পত্রিকায়। যদি খেলার উত্তেজনায় আমার ডান হাতটা জখম হয়ে যায়, তাহলে? লেখা যে বন্ধ হয়ে যাবে?

কিন্তু মনের দিক থেকে আমরা যেন তখন সেই মুহূর্তে শিশু হয়ে গিয়েছিলাম। শিশু যখন খেলে তখন কি তার দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে? আনন্দটাই তখন বড়, দায়িত্বটা গৌণ! মনে আছে সেইদিন সুশীল রায়ের আগ্রহে আমাদের সকলকার একটা আলোকচিত্রও নেওয়া হয়েছিল।

কোন্ সালে মনে নেই, সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। এদিকে যখন পারস্পরিক প্রীতি আর সহযোগিতায় আমাদের সহাবস্থানের ভিত দিন-দিন সুদৃঢ় হচ্ছে তখন সন্তোষকুমার ঘোষ কিন্তু আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো তিনি তখন অন্য দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বড় বেশি কাজ তাঁর। কাজের চাপে আসতে পারেন না নিয়ম করে। তবু মাঝে-মাঝে তাঁর তখনকার প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে আমাদের ভোজনে আপ্যায়িত করে গল্পে-হাসিতে-রসাত্মক বাক্যে মুগ্ধ করে রাখতেন। 'তিলাঞ্জলি'র পরে 'কিনু গোয়ালার গলি' পাঠক-মহলে যে সাড়া জাগিয়েছিল তার বুঝি সত্যিই তুলনা নেই। কিন্তু বেশিদিন তাঁর সাহচর্য পাওয়া বোধহয় আমাদের কপালে সইল না। তিনি চাকরির সূত্রে চলে গেলেন দিল্লিতে। তাতে সাহচর্য বন্ধ হলো বটে, কিন্তু তা বলে যোগাযোগ বন্ধ হলো না। কলমের যোগসূত্র সেখান থেকেই প্রসারিত

হলো 'দেশ' পত্রিকার পাতায়। যা ছিল শারীরিক উপস্থিতি তার বদলে তা হয়ে গেল আত্মিক। কিন্তু তবু যখনই তিনি কলকাতায় আসতেন, তাঁর অনুপস্থিতির খেসারৎ দিয়ে যেতেন তাঁর অফুরন্ত হাসি-গল্প আর আড্ডার অমৃত বিতরণ করে।

কিন্তু সকলকে টেক্কা দিতো প্রভাত দেবসরকার। কলকাতায় তার বাসা-বাড়ি। কিন্তু দেশ কলকাতার কাছেই একটা গ্রামে। সে-গ্রামের নামটাও ভারি মিষ্টি। মালা। মালা গ্রামে তিনি আমাদের নিয়ে যাবেনই।

প্রভাত দেবসরকার প্রায়ই বলতো—ভাই তোমরা একবার আমার দেশে যাবে না?

তা আমাদেরই কি যেতে অনিচ্ছে? আমরাও তখন চাইছি আমাদের সেই এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটটা আরো সুদূর বিস্তারিত হোক। যে-প্রীতি আর বন্ধুত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধন আমাদের একটা টিনের চালের তলায় চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে দিয়েছিল, তার থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা বৃহৎ পৃথিবীর বৃহত্তর ছাদের তলায়, দেয়ালহীন মুক্তাঙ্গনে একত্রিত হয়ে বিচরণ করি। এ সুযোগ তো আমরা বহুদিন থেকেই অনুসন্ধান করছিলাম। কলকাতা শহরে তখন রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক নাটমঞ্চে খুব দ্রুত পট পরিবর্তন চলছে। ব্ল্যাকআউটের রাত-গুলোতে আমরা কোনও রেস্টুরেন্টে ঘেরাটোপপরা আলোর তলায় বসে সাহিত্যের তথা জীবনের দুর্ভেদ্য সমস্যাগুলোর জট ছাড়াই, তাতে বেশির ভাগই সঙ্গী থাকেন সুবোধ ঘোষ আর পঙ্কজ দত্ত। সুবোধ ঘোষ তাঁর জীবনের এক-একটা রোমাঞ্চকর গল্প বলেন আর আমরা সেই কাহিনীর মধ্য থেকে গল্প-উপন্যাসের প্লটের হদিশ পাই। এমনি এক আড্ডায় বসে প্রভাত দেবসরকার আবার তার মালা গ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে।

বললে—কই ভাই, তোমরা আমার দেশে একবার যাবে না?

সাগরময় ঘোষ রসিকতার সুরে বললেন—তোমাদের দেশে গেলে আমাদের কী খাওয়াবে প্রভাত?

প্রভাত দেবসরকার বললে—তোমরা যা খেতে চাইবে ভাই তাই খাওয়াবো, ধরো যত মাংস খেতে চাও, যত মাছ খেতে চাও, যত ডাব খেতে চাও—যত···

প্রভাত দেবসরকারের বড় সাধ আমাদের প্রতি তার প্রীতির প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর সে রাখবেই। তা সেদিনের সেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানসিকতার মধ্যে একটা জিনিসই

পরম কাম্য ছিল আমাদের কাছে—সে হলো প্রীতি। আমরা কেউই তখন খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করিনি, অর্থ-কামনাও আমাদের তখন ছিল কল্পনার বাইরে। আমরা বড় হয়েছি এমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশে যখন জীবন আমাদের কাছে 'ফসিলে'র নামান্তর, পৃথিবী আমাদের চোখে 'কিনু গোয়ালার গলি', সংসার আমাদের কাছে মাত্র 'বারো ঘর এক উঠোন', মানুষ আমাদের দৃষ্টিতে শুধু তুচ্ছ 'খড়কুটো'। দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধ তাই আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকেই একেবারে অস্বীকার করতে শিখিয়েছিল। আমরা তখন কলকাতার রাস্তায় সার-সার চলন্ত কঙ্কাল দেখেছি, মৃতদেহ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে পথ চলেছি, 'ফ্যান দাও' চিৎকারে আমাদের নৈশ বিশ্রাম বার-বার বিভ্রান্ত হয়েছে। আর ঠিক তার পাশাপাশি দেখছি মিলিটারি ঠিকেদারির কল্যাণে রাতারাতি ঐশ্বর্যের অসুস্থতায় ফেঁপে-ফুলে স্ফীতাকৃতি হওয়া। আর আমাদের এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের এই ক'জন শিল্পীর মনের আকাশে তখন আরো ভয়াবহ বিপর্যয়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। কী নিয়ে লিখবো আমরা? ঈশ্বরের অমেয় করুণার কথা? প্রেমের পরম পবিত্রতার কথা? সে-সব লেখা হোক ওই 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রায়', ওই 'কবিতা', 'পূর্বাশা', 'পরিচয়ে'। 'যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ' বা 'লেকের সকাল' কিম্বা 'ব্রাহ্মীলিপি'র রহস্য-উদ্ধার' আমাদেব কাজ নয়। আমরা এই ধ্বংসস্তূপেব ভস্মাবশেষের ভেতর থেকে প্রীতির ঐশ্বর্য উদ্ধাব করতে চাই। আমরা জীবনের তর্পণ করতে চাই প্রীতির 'তিলাঞ্জলি' দিয়ে।

তাই যখন দেখলুম যে প্রভাতের আমন্ত্রণ আন্তরিক, তখন আমবা রাজি হয়ে গেলুম। তালিকা তৈরি হলো। মন্মথ সান্যাল থেকে শুরু করে সর্ব-কনিষ্ঠ রমাপদ চৌধুরী পর্যন্ত কেউ-ই বাদ নেই। কাকেই বা বাদ দেওয়া যাবে? সবাই তো প্রীতিভাজন। আশ্চর্য মানুষ প্রভাত দেবসরকার। তার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এতগুলি মানুষকে তার নিজেব জন্মভূমিতে নিয়ে গেছে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন বায়নাক্কা। কেউ ডাব খাবার বায়না ধরেছে, কেউ ধরেছে রসগোল্লার বায়না। চব্বিশ ঘণ্টার আতিথ্য গ্রহণ কবে আমরা যেন তাকে কৃতার্থ করেছি। সে হাসিমুখে আমাদের সব অত্যাচার সহ্য করেছে। শুধু থাকা খাওয়া নয়, রাত্রে আবার প্রত্যেকের শোবার বিছানার বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। প্রভাত, তার ভাই, তার গৃহিণী আর তার আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসী-প্রতিবেশী সবাই আমাদের তুষ্টিবিধানের জন্যে তটস্থ।

আর এ কি শুধু একবার? তার পরের বছরেও যেতে হলো। আবার তার

পরের বছরে। প্রভাত দেবসরকারের অপরাধ সে আমাদের একজন, এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের নিয়মিত হাজিরাদার।

এমনি করেই চলেছিল আমাদের যাত্রা। সাগরময় ঘোষ তো নিমিত্ত মাত্র। আসলে আমরাই সব। 'দেশ' পত্রিকাকে যারা ভালবাসে তারা সবাই আপনজন। আমরা মনেপ্রাণে চাই 'দেশ' পত্রিকার প্রচার আরো বাড়ুক। 'দেশ' পত্রিকার প্রভাব আরো সুদূর-বিস্তারিত হোক। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকার কর্মী বলতে কেউ বড় নেই তখন। এক সাগরময় ঘোষ, আর সঙ্গে মাত্র একজন সাহায্যকারী। প্রথমে ছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, তাঁর কথা আগেই বলেছি। তিনি সকাল-সকাল অফিসে এসে আবার সকাল-সকাল কোথায় চলে যেতেন। আর তারপর ছিলেন আর একজন। তিনি হলেন, কবি যতীন্দ্র সেন, তিনি সন্ধ্যে সাতটা-অটটা-ন'টা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কূল পান না। শরীরের ভারটা তাঁর একটু বেশী বলে কাজে কর্মেও তাই একটু মন্থর। অনেকদিন দেখেছি রাত দশটা বেজে গেছে, কাজ করতে করতে ক্লান্ত। বিশেষ করে পুজো-সংখ্যার চাপ পড়েছে। সাগরময় ঘোষ তো লেখা-সংগ্রহে ব্যস্ত, কিন্তু অন্য কাজগুলো করে কে? কে অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়? কে চিঠিগুলো সাজিয়ে রাখে? কে গেলি-প্রুফ দেখে? একদিন অসময়ে ঘরে ঢুকে দেখি তাঁর হাতে কলম, প্রুফের ওপরে নত মুখ, কিন্তু নাক ডাকছে বিকট শব্দ করে। সেদিন তাঁর ঘুম না ভাঙ্গিয়ে নিঃশব্দে চলে এসেছি।

কয়েকমাস পরে যতীন সেনের বোধহয় প্রমোশন হলো চাকরিতে, কিম্বা তিনি বদলি হয়ে বেশি মাইনেতে চলে গেলেন 'আনন্দবাজারে'। তাঁর জায়গায় এলেন অন্য লোক, অন্য মুখ।

চুপি চুপি সাগরময় ঘোষকে জিজ্ঞেস করলাম—ইনি আবার কে? নতুন লোক বুঝি?

সাগরময় ঘোষ বললেন—এর নাম জ্যোতিষ দাশগুপ্ত, ইনি আনন্দবাজারের কর্মী, খুব কাজের লোক, এঁকে আমি নিজে আমার অফিসে বেছে নিয়ে এসেছি—

তা দিনকতক বাদেই বুঝতে পারলাম সাগরময় ঘোষের নির্বাচন কত সুষ্ঠু। লোক চিনতে তাঁর ভুল হয় কদাচিৎ। 'দেশ' পত্রিকায় সুনির্বাচিত রচনা প্রকাশে সাগরময় ঘোষের যতখানি নিষ্ঠা, তাকে নিয়মিত তারিখে নির্ভুল আকারে প্রকাশ করার জন্যে জ্যোতিষ দাশগুপ্তের নিষ্ঠা তার চেয়ে কোনও

অংশে কম নয়। সাগরময় ঘোষ অফিসে থাকুন আর না-থাকুন জ্যোতিষ দাশগুপ্ত থাকলেই হলো। তাতেই লেখকদের সব সমস্যা মিটে যাবে। লেখার মধ্যে যদি কোনও তথ্যে ভুল থাকে তো জ্যোতিষ দাশগুপ্তের চোখে তা এড়াবে না। তিনি তীক্ষ্ণদর্শী, ব আর র-এর মধ্যে ফারাক শুধু একটি ফুটকির। সেটা কম্পোজিটার বাবুদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও জ্যোতিষ দাশগুপ্তের চোখকে এড়াতে পারবে না। একাই তিনি কপি-হোল্ডার, আবার একাই প্রুফ-রীডার। আর জ্যোতিষ দাশগুপ্ত মশাই-এর চোখকে যদি ফাঁকিই দিতে পারো তো ছাপাখানায় অশ্বিনীবাবু আছেন কী করতে? 'দেশ' পত্রিকার যত মেক-আপ প্রুফ্ তো অশ্বিনী সরকারের হাত দিয়েই আসবে। যখনই কপি নিয়ে আমরা গিয়েছি ছাপাখানায়, হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছেন অশ্বিনীবাবু। 'দেশ' পত্রিকার কর্মী-তালিকায় হয়ত 'মেক-আপ-ম্যান' হিসেবেই তাঁর পরিচিতি, কিন্তু 'দেশ' পত্রিকার লেখকদের চোখে তিনি ছিলেন 'দেশ'-এর কর্ণধার। আমরা সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অশোককুমার সরকার বা বঙ্কিমচন্দ্র সেনকে জানতুম না। আমরা জানতুম ছাপাখানার ভেতরে আমাদের রচনার হাল শক্ত হাতে ধরে কাঠের টুলের ওপর বসে আছেন সেই অশ্বিনীবাবু। তাঁর হাতেই আমাদের মরণ-বাঁচন। আর তিনি যদি হাতের কাজ থামিয়ে দিয়ে কোনও পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে মশগুল হয়ে যান তো লেখক বুঝবে সে-লেখার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! তাই লেখকরা চুপি চুপি গিয়ে সেই অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞেস করতো—আমার লেখাটা কেমন হয়েছে অশ্বিনীবাবু?

অবশ্য কর্তৃপক্ষ যে 'দেশ' পত্রিকা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন তা বলতে পারবো না। তবে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তাঁরা কোনওদিন কোনও বাধা-নিষেধের সৃষ্টি না করে বরং সহ-সম্পাদক এবং লেখকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দানের নীতিতেই বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। আর সেই কারণেই তখন পাঠক-মহলে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি অত আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

একদিন সাগরময় ঘোষ বললেন—ভাবছি একটা সাহিত্য-সংখ্যা বার করলে কেমন হয় নীরেন?

নীরেন চক্রবর্তী বললেন—সাহিত্য-সংখ্যা মানে?

—পঁচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসবের সময় একটা বিশেষ সংখ্যা বার করলে ভাল হবে—নাম দেব সাহিত্য-সংখ্যা—নামটা কেমন হবে?

কথাটা সমর্থন করবার মানুষের অভাব হলো না। 'দেশ' যখন সাহিত্য-

পত্রিকা বলে বিজ্ঞাপিত তখন প্রস্তাবটা যুক্তি-সঙ্গত বলে সবাই মত প্রকাশ করলেন। আসলে বাঙলা সাহিত্যের সব চেয়ে বড় গৌরব হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যেই আমরা নিজেদের সংস্কারাবদ্ধ প্রকৃতিকে বাধাবিমুক্ত করে সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সম্প্রসারিত দেখতে পাই। আমরা যেখানে সীমিত রবীন্দ্রনাথ সেখানে অসীম। আমরা যেখানে সঙ্কীর্ণ রবীন্দ্রনাথ সেখানে অবাধ, এক কথায় রবীন্দ্রনাথ মানেই সাহিত্য আর সাহিত্য মানেই রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং সাহিত্য-সংখ্যা প্রকাশ করার মহৎ উদ্দেশ্য হলো সেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে একটা ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা আর অনুভব করা যে সেই ঐক্যবোধের মধ্যেই আমাদের পরম মঙ্গল, আমাদের পরম পরিত্রাণ। আমাদের আগে আমাদের অগ্রজরা ঘোষণা করেছিলেন 'সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর…মোর পথ আরো বহুদূর।' কিন্তু 'দেশ' পত্রিকার পথ ঠিক তার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়, রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথকে অঙ্গীকার করে আরো বহুদূরে পৌছতে হবে। আর সাহিত্যই হবে সেই বহুদূরের যাত্রার একমাত্র বাহন। বিজ্ঞান আর সাহিত্যের মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে। বিজ্ঞান আর সাহিত্য দুইএরই লক্ষ্য ঐক্যবোধ। কিন্তু বিজ্ঞান যে-ঐক্যবোধে পৌছতে চায় তা প্রয়োজনের দ্বারা শাসিত বলে বেশিরভাগ সময়েই তার অগ্রগমনের পথে হিংসার বিঘ্ন ঘটে থাকে। কিন্তু সাহিত্যের যে ঐক্যবোধ তা প্রীতির দ্বারা শাসিত বলেই তা নিষ্কলুষ ঐক্যবোধ বা বিশ্ববোধ। 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যার মধ্যে দিয়ে তাই সেই বিশ্ববোধের দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তাব নিহিত ছিল।

তা পিঠে খাবার লোকের তো অভাব নেই, কিন্তু পিঠের ফোঁড় গুনবে কে ? অর্থাৎ লেখকরা তো লিখেই খালাস, কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার খরচ-খরচা জোগাবে কে ? লেখকরাও তো সে-বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। প্রদীপ জ্বালানোটা লেখকদের কাজ হলেও সলতে পাকানোটা কি অন্যের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে ?

প্রস্তাবটা শুনলেন কানাইলাল সরকার। কানাইলাল সরকারকে বাইরে থেকে দেখে যা বোঝা যেত আসলে তিনি তা নন। তাঁর অন্তরে একটা চিরকালের শিশু সব সময়ে লুকিয়ে থাকে। তাই তিনি এই মুহূর্তে গরম আর এই মুহূর্তেই আবার নরম। এক হাতে তাঁর খড়্গ আর এক হাতে বরাভয়। তাঁর সাহায্য না পেলে কোনও কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞাপন যোগাড়

করবেন তিনিই। বিজ্ঞাপন মানেই প্রদীপের তেল। তেলের যোগান না পেলে প্রদীপ আলো দেবে কী করে? আর তা ছাড়া এ তো সাধারণ বিজ্ঞাপন নয় যে বোম্বাইতে গিয়ে বড় বড় ফার্মের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তাদের সম্মতি আদায় করতে হবে! এর রসদ যোগান দেবে কলেজ স্ট্রীটের সাধারণ পুস্তক-প্রকাশকরা, যাঁরা স্বল্প-পুঁজি, যাঁরা ব্যবসা-সংসারের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শরিক। যে-দেশে শতকরা তিরেনব্বুই জন নিরক্ষর সেখানে প্রকাশন-ব্যবসা কি আবার একটা ব্যবসা? সাহিত্য-সংখ্যায় তাঁদেরই তো প্রাধান্য থাকা উচিত! সুতরাং তাঁদের কাছে কথাটা পাড়বার উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গে সাগরময় ঘোষই প্রথমে একদিন কলেজ স্ট্রীটের বই-পাড়ায় গিয়ে হাজির হলেন। এম-সি-সরকারের সুধীরচন্দ্র সরকার আমার উপন্যাসের প্রথম প্রকাশক। তাঁর দোকানেই গেলাম প্রথমে। সুধীরবাবুর ছেলে সুপ্রিয় সরকার প্রস্তাব শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন—খুব ভালো পরিকল্পনা করেছেন সাগরবাবু, আমরা এক পাতা বিজ্ঞাপনের গ্যারান্টি দিয়ে রাখলুম—

আরো বললেন—বাঙলা বই-এর একটা আনুপূর্বিক ক্যাটালগ নেই, এতে সে-অভাবটাও মিটবে—

এমনি করে সাগরময় ঘোষকে নিয়ে আমার পরিচিত আরো কয়েকটি প্রকাশকের কাছে গেলাম। তাদের মধ্যে আমার 'নিউ এজ' কোম্পানীও ছিল। তাঁরা সকলেই প্রস্তাবটাকে স্বাগত জানালেন।

সাগরময় ঘোষ সকলকেই বললেন—আপনারা যদি অন্তত আট পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনও দেন তাহলেই আমার চলবে, তার বেশি আমি চাই না—

সকলেই রাজি হলেন। এরপর কানাইলাল সরকারের পালা। আগেই বলেছি তিনি আক্লান্তকর্মা পুরুষ। 'দেশ' পত্রিকার আজ যে বিজ্ঞাপন-প্রাচুর্য এর পেছনে কানাইবাবুর অবদান সর্বাধিক। আর তারপর যাঁর অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরণীয় তিনি হলেন ইন্দু রায়। ইন্দু রায়কে যিনি দেখেছেন, ইন্দু রায়কে যিনি চেনেন তিনিই জানেন ইন্দু রায় আপন বিদ্যায় কতখানি পারদর্শী। ইন্দুবাবু শুধু সৎ কর্মঠ পারদর্শী মানুষই নন, তাঁর আর একটি অব্যর্থ অস্ত্র আছে, সেইটি তাঁর চরিত্রের মহামূল্যবান মূলধন। সেটি হলো তাঁর হাসি। এখনও রাস্তায়, পার্কে, বাজারে আমার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হলেই মাঝে মাঝে মনে হয় জিজ্ঞেস করি—এমন হাসিটা আপনি কোন্ দোকান থেকে কিনেছেন?

কিন্তু সেই সময়ে হঠাৎ দেশময় একটা দৈব-বিড়ম্বনা শুরু হলো। ভারত-ইতিহাসের সে এক কলঙ্কময় পরিচ্ছেদ। সেটা যে রাজনীতির বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ষড়যন্ত্র তা তখন আমরা সবাই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমরা তো তার ক্রীড়নক মাত্র, দাবার ঘুঁটি। তার ফলে সারা দেশময় শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রক্তে রক্তে ভেসে গেল আমাদের বিবেক আর আমাদের শিল্প। ঘর থেকে বাইরে বেরোন বিপজ্জনক, বাইরে থেকে ঘরে আসাও অনিশ্চিত। বহুদিন আগে আর একজন সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলে গিয়েছিলেন—'রাজনীতি এমনই এক রাজ্য যার কোনও নীতি নেই।' আর সেদিনকার দাঙ্গা, সে তো মাত্র রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি। রাজনীতির হেলে সাপ কাটলে তবু রক্ষা পাবার পথ আছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেউটে সাপের কামড় একেবারে মোক্ষম কামড়।

মনে আছে এতদিনকার 'দেশ' পত্রিকা—যা বরাবর কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত তারিখে প্রকাশিত হয়ে এসেছে, তার প্রথম এবং শেষ ব্যতিক্রম হলো সেই সময়ে। শুক্রবারের সংখ্যাটা হয়ত বেরোল পরের বুধবারে। পত্রিকা প্রকাশের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বজায় রাখা আর সম্ভব হলো না। আমাদের অত সাধের আড্ডা ভেস্তে গেল আকস্মিকভাবে। এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল এমনই এক রাস্তার সঙ্গমস্থলে যার দুই দিকে দুই প্রতিপক্ষ বাহিনী মারমুখী হয়ে পরস্পরের প্রাণ নিতে প্রস্তুত। যারা 'আনন্দবাজার' প্রতিষ্ঠানের কর্মী তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের সেখানে যে-কোনও ঝুঁকি নিয়ে যেতেই হবে। একবার সেখানে গিয়ে পড়তে পারলেই হলো। রাত্রে সেখানে থাকা আর খাওয়ার সুচারু বন্দোবস্ত করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আমরা? বিশেষ করে আমার ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তি প্রতি সপ্তাহে কী রকম করে পাঠাই? বাড়িতে বসে সমস্ত রাত জেগে লিখি, আর সারা রাত 'বন্দেমাতরম্' কিম্বা 'আল্লা হো আকবর' শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। রাত্রে যখন ঘুম আসবেই না তখন সময়টা নষ্ট না করে লিখে-লিখেই রাত কাটাই। আর সকাল বেলা 'দেশ' অফিসে যেতে না পেরে নিজের হাতে ২০নং বালিগঞ্জ প্লেসের সাগরময় ঘোষের বাড়িতে গিয়ে পাণ্ডুলিপির পাতা ক'টা পৌছিয়ে দিয়ে আসি। দিন রাতের অক্লান্ত পরিশ্রমে আর মাসের পর মাস অবিরাম রাত জাগার ফলে যা হবার তাই হলো। আমি আর কিছু চোখে দেখতে পাই না। সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের মাঝপথেই সমাপ্তি টেনে দিতে বাধ্য হলাম।

দীর্ঘ সাত মাস পরে যখন আবার চোখ খুলেছি, দেখি একটা চোখ একেবারে গেছে, বাকি চোখটা দিয়ে কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাও যৎসামান্য। সূর্যাস্তের পর লেখা-পড়া করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

কিন্তু একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনে আমার নিজের দুর্ভাগ্যও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। শুনলাম অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর নেই। সেই 'তিতাস একটি নদীর নামে'র লেখক। অনেক আর্থিক দুর্গতি আর অনুগত গলগ্রহদের বোঝা শেষপর্যন্ত তাঁকে বাঁচতে দেয়নি। বুঝলাম অদ্বৈতবাবু হয়ত গেলেন, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের একটি অক্ষয় স্বাক্ষর তিনি রেখে গেলেন তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। সাহিত্যের বিচারে কোন্‌টা গিলটি আর কোন্‌টা খাঁটি সোনা তা বেশির ভাগ পাঠকের কাছেই লেখকের জীবদ্দশায় ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে আখেরে। আজ এতকাল পরে ধরা পড়ছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' সত্যিই ছিল খাঁটি সোনা।

যা'হোক, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধের দরুন ব্ল্যাক-আউট প্রভৃতি যখন একদিন কেটে গেল, তখন এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট আবার খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। তখন দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকা ভেঙ্গে অনেকে এসে আনন্দবাজারে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে নীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রধান। আগে তিনি ছিলেন আমাদের আড্ডার আংশিক শরিক, তখন থেকে হলেন সর্বাত্মক। এরপর এলেন গৌরকিশোর ঘোষ। গৌরকিশোর ঘোষের লেখা আগেই পড়েছিলাম কিন্তু এবার 'দেশ' পত্রিকায় তিনি 'রূপদর্শী' হয়ে আবার নতুন রূপে দর্শন দিলেন। নতুন নাম-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষেরও যেন নব-জন্মগ্রহণ হলো। 'শরৎচন্দ্রের' পর থেকে প্যানপেনে ভাবালুতায় আর কান্নার আতিশয্যে যখন বাংলা-সাহিত্য-সরস্বতীর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল তখন 'রূপদর্শী' এসে হাসিয়ে, ভাবিয়ে, চমকে দিয়ে, চাবুক মেরে আমাদের চাঙ্গা করে তুললেন। এমন কি শ্লেষসম্রাট 'পরশুরামে'র পর্যন্ত টনক নড়ে উঠলো রূপদর্শীর রচনা পড়ে। তাঁর মনে হয়েছিল আমি তো 'বিরিঞ্চিবাবা' লিখে সব ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়েছি। কিন্তু এ আবার কে? 'রূপদর্শী'র লেখা পড়ে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে জীবনরূপের এমন শ্লেষাত্মক দর্শন আগে তিনি দেখেননি।

তারপর আবার আড্ডা জম-জমাট হয়ে উঠতে লাগলো দিন দিন। শুধু বংশ-গৌরবে জম-জমাট হওয়া নয়, কর্ম-কৌলিন্যেও জম-জমাট। রূপে, গুণে,

মর্যাদায়, রম্যতায়, চাকচিক্যে 'দেশ' পত্রিকার প্রচার তখন আর শুধু দেশের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না। দেশ অতিক্রম করে সুদূর বিদেশে গিয়ে তার পরিক্রমা শুরু হলো। দেশ তখন রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের 'দেশ'ও মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। সংস্কার থেকে মুক্তি, অনাচার থেকে মুক্তি, ভণ্ডামি থেকে মুক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, শঠতা, কূপমণ্ডূকতা সব কিছু থেকে মুক্তি। সুবোধ ঘোষ, নীরেন চক্রবর্তী, গৌর-কিশোর ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রভাত দেবসরকার, সুশীল রায় তো ছিলেনই, তার সঙ্গে যোগ দিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর 'দেশে-বিদেশে' ধারা-বাহিক প্রকাশিত হয়ে তখন বেশ হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে বাজারে। এককালে প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর চিন্তার আর ভাষার মুক্তিসাধন করে বাঙলা-সাহিত্যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তার বহুদিন পরে আর একবার তেমনি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল। সে ইতিহাস সকলের জানা ছিল। এবার এলেন তাঁদেরই উত্তর-সূরী সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব। আলি-সাহেবকে কখনও আড্ডায় দেখতে পাইনি কিন্তু তাঁর লেখা দেখি, লেখা পড়ি। পড়ে মনে হয় সশরীরে আড্ডা না দিলেও কলমে তাঁর বৈঠকী-আড্ডার আমেজ পাচ্ছি, তাতেই পুষিয়ে যায় তাঁর অনুপস্থিতি।

এদিকে এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের কর্তৃপক্ষও 'দেশ' পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখে আরো বেশি করে সচেতন হয়ে উঠলেন। আমরা সাগরময় ঘোষকে প্রায়ই তাগাদা দিতাম—'দেশ'-এর মলাটটা একটু ভালো করুন না, একটু মোটা চক্‌চকে কাগজে কভার ছাপতে পারেন না?

তখন কভারের ওপর একই ব্লক এক মাস ধরে চলতো। পাতলা নিউজ-প্রিন্টের ওপর মামুলি দু-রঙা একটা ব্লক, এটা আমরা যারা পত্রিকার লেখক তাদের কাছে খারাপ লাগতো। 'দেশ' পত্রিকাকে আমরা আমাদের নিজেদের কাগজ মনে করতাম বলে তার বহিরঙ্গের দারিদ্র্য আমাদের মনকে বড় পীড়া দিত। আমরা সাগরময় ঘোষকে একদিন বললাম—আপনি অশোকবাবুকে একটু বলুন, যে-পত্রিকার এত প্রচার, তার চেহারা দেখলে লোকে কী বলবে? 'দেশে'র দারিদ্র্য তো আমাদেরই দারিদ্র্য—

সাগরময় ঘোষ বললেন—নতুন বাড়িতে গিয়ে এর চেহারা বদলাবে—

—নতুন বাড়িতে মানে?

সুবোধ ঘোষ ব্যাপারটা খুলে বললেন—'দেশ' পত্রিকার অফিস এই এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট থেকে চৌরঙ্গী পাড়ায় উঠে যাচ্ছে—

—উঠে যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ, চৌরঙ্গী পাড়ায় আনন্দবাজারের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সে বাড়ি শেষ হতে আরো কয়েকমাস লাগবে—

আমাদের খারাপ লাগতো কথাটা শুনে। এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট হোক নোংরা জায়গা, কিন্তু এতদিনের এত স্মৃতিজড়ানো এক কদমগাছের তলায় এই টিনের চালের ঘর, এ ছেড়ে চলে যেতে হবে ! শুনে বড় কষ্ট হতো মনে। চৌরঙ্গী পাড়ার সে-অফিসে কি এই টেবিলের ওপর খবরের কাগজ পেতে মুড়ি তেলে-ভাজা আর মাটির ভাঁড়ে চা খাওয়া মানাবে ? সে তো সাহেব-পাড়া। এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটে যা সাজে, চৌরঙ্গী পাড়ায় কি তা সাজে ?

কিন্তু জগৎ-সংসারের প্রতিদিনের পরিচালনায় আমাদের ইচ্ছের কতটুকু দাম ? আমাদের ইচ্ছায় সূর্য উঠেছে না, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতের আবির্ভাব কিম্বা বিদায় কিছুই সংগঠিত হচ্ছে না। আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কোন কিছুই চলছে না। আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের দায় বহন করবার দায় যখন কারোরই নেই তখন তেমন ইচ্ছে না পোষণ করাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং আমাদের এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের আড্ডার সীমাবদ্ধ আয়ুকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্যে আড্ডার সীমান্ত আরো দীর্ঘ প্রসারিত করে দিলাম। আগে যদি বা সন্ধ্যে সাতটা আটটা পর্যন্ত ছিল সেই সীমান্ত, শেষে তা দীর্ঘতর হয়ে কোনও চায়ের দোকানের ঘুপচি ঘরের ভেতর গিয়ে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত সেই আড্ডা বিলম্বিত হতে লাগলো। অর্থাৎ 'দেশ' অফিস থেকে বাইরে বেরিয়েও 'দেশ' প্রসঙ্গ। ঘরে-বাইরে তখন আমাদের 'দেশ' ছাড়া গতি নেই।

এমনি সময়ে একদিন পরিচয় হলো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে। তিনি যদিও 'দেশে' লিখতেন, কিন্তু বরাবরই ছিলেন নেপথ্যচারী। এবার হলো সাক্ষাৎ পরিচয়। তারপর যতবার দেখা হয়েছে, ততবারই আরো নিবিড় পরিচয় পেয়েছি তাঁর। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে মিশে আমাদের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছে। তাঁর লেখা সম্বন্ধে পাঠকরা অনেক বার অনেক সাধুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু সেই মানুষটা ? মানুষটার সম্বন্ধে আমার মনে হয়েছে তিনি যেখানে থাকেন, সেখানকার বাতাস পর্যন্ত পরিশুদ্ধ, তিনি যে-রাস্তায় হাঁটেন সে-রাস্তার মাটিও বুঝি তাঁর পদস্পর্শে পবিত্র।

আমাদের জমায়েত এবার ষোলকলায় পূর্ণ হলো রমাপদ চৌধুরীর আবির্ভাবে। তিনি আসার আগেই সুবিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর 'দরবারী'র জন্যে, তাঁর এই গল্পসংকলনটি তখন সাড়া তুলেছিল। সেই রুক্ষ-দর্শন মানুষটির ভেতরটা যে এত সরস তার পরিচয় পাওয়া গেল তার শারীরিক সান্নিধ্যের সুযোগে। আর এলেন বিমল কর। তিনিও এসে যোগ দিলেন 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজে। 'দেশ' পত্রিকার প্রচার আর প্রভাব যখন তুঙ্গে তখনই তাঁর আবির্ভাব। যেমন মিষ্টভাষী মানুষ তিনি, তেমনি কলম-কুশলী। রমাপদ চৌধুরী আর বিমল কর দু'-জনেই সোজা সড়ক ধরে সদর রাস্তা দিয়েই বাঙলা সাহিত্যের অন্দর-মহলে প্রবেশ করলেন। রমাপদ চৌধুরীর যে-কলম একদিন 'দরবারী'র ছোট গল্পগুলো লিখেছিল, সেই কলমই আবার একদিন অন্যত্র লিখলো 'লালবাঈ'। আর সেই 'লালবাঈ' লেখার পরই রমাপদ চৌধুরী রমাপদ চৌধুরী হয়ে উঠলেন। আর বিমল করের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন তাঁর 'দেওয়াল' উপন্যাসে। এপিক উপন্যাস জগতে 'দেওয়াল' সেই সময়েই বিমল করকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন স্থান নির্দিষ্ট করে দিল।

তা এও যেন আর এক রকমের সূতিকাগৃহ।

বাঙলা-সাহিত্যের আত্মা নতুন করে জন্মগ্রহণ করবে বলে 'দেশ' পত্রিকার সূতিকাগৃহে বুঝি এমনি করেই তখন নানা রসের, নানা সুরের, নানা রংএর মঙ্গল-প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। একদিকে যেমন সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি', সন্তোষ ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সূর্যমুখী' আর 'বারো ঘর এক উঠোন,' হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইরাবতী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হরিবংশ', কালকূট ওরফে সমরেশ বসুর 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' আর বিমল করের 'খড়কুটো' প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি একদিন ধারাবাহিক পরিবেশিত হলো গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। এদের অনুসরণ করে একদিন এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের আর এক প্রতিভা এসে হাজির হলেন—তাঁর নাম শংকর। বয়সে একেবারে নবীন কিন্তু দৃষ্টি আর চিন্তার গভীরতায় তিনি অতলস্পর্শী। চেহারা দেখে যা বোঝা যায়নি লেখা পড়ে তা হৃদয়ঙ্গম হলো যখন তাঁর প্রথম রচনা পরিবেশিত হলো 'দেশ' পত্রিকাতেই। পরে তা 'কত অজানারে' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। মনে আছে আমরা দেখে অবাক হয়ে গেলাম সে-রচনার কোথাও প্রথম রচনার আড়ষ্টতা তো নেইই বরং নবীনের

বলিষ্ঠতা রয়েছে আর তার সঙ্গে প্রবীণের প্রজ্ঞার সংযম তাতে স্থায়িত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। শংকরকে আবিষ্কারের কৃতিত্বটুকু অবশ্য সমস্তই গৌরকিশোর ঘোষের, অর্থাৎ আমাদের 'রূপদর্শী'র।

এইভাবে একদিকে যেমন 'দেশ' পত্রিকার সূতিকাগৃহ নবজাতকদের প্রাণ-চেষ্টার ক্রন্দনধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে, তেমনি আবার বাঙলা সাহিত্যের পাঠকবর্গও তাদের প্রত্যাশার পূর্ণ প্রাপ্তিতে দিকে দিকে আনন্দ শঙ্খ বাজিয়ে চলেছে। সমরেশ বসু তখন নবাগত। তাঁর 'গুণিন' গল্পটি তখন প্রথম দেশে প্রকাশিত হয়েই পাঠক-জগৎ জয় করে ফেলেছে। নবীনের জীবন-বেগ আর যৌবনের উদ্দাম ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তাঁর আবির্ভাবকে সবাই স্বাগত জানিয়েছে। স্বাগত জানিয়েছে তাঁর 'অমৃত কুম্ভের সন্ধান'কে। এরই পাশাপাশি চলছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গরহস্য', বনফুলের 'স্থাবর'। প্রফুল্ল রায় নতুন আবির্ভাবেই চমকে দিলেন তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস 'পূর্ব-পার্বতী' দিয়ে। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ওরফে জরাসন্ধের জীবনের এই শ্রেষ্ঠ রচনা শুধু তাঁকেই অবিস্মরণীয় করলো তাই নয়, বাঙলা-সাহিত্যও সমৃদ্ধতর হলো এতে। তারাশঙ্কর লিখলেন 'কালান্তর', বনফুল লিখলেন 'স্থাবর', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'দুয়ার হতে অদূরে', 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', প্রমথনাথ বিশী লিখলেন 'কেরীসাহেবের মুন্সী', সতীনাথ ভাদুড়ী লিখলেন 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', মনোজ বসু লিখলেন 'নিশিকুটুম্ব,' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন 'সূর্য সারথি', প্রবোধকুমার সান্যাল লিখলেন 'হাসুবানু', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন 'প্রথম কদম ফুল'······

নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে সেদিন যে সাহিত্য-যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন সাগরময় ঘোষ, তাতে সমিধ যোগাতে লাগলেন কানাইলাল সরকার, ইন্দু রায়, জ্যোতিষ দাশগুপ্ত, প্যারীমোহন দাস, অশ্বিনী সরকার প্রভৃতি। এঁরাই চৌরঙ্গী এলাকায় সাহেব-পাড়ার নতুন প্রাসাদপুরীতে এসে আজো সেই একই উৎসাহে তেমনি করেই সমিধ জুগিয়ে যাচ্ছেন। সেদিন যাঁরা নবীন ছিলেন, তাঁরা আজ প্রবীণ হয়েছেন, তাঁদের অনুসরণ করে কত নতুন নতুন প্রতিভা আবার এসে আবির্ভূত হয়েছেন, নবীনের সঙ্গে প্রবীণের সমন্বয়ের যে সাধনা 'দেশ' পত্রিকায় শুরু থেকে হয়েছিল এখনও তাই-ই চলছে। এখন আবার এসেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের নতুন প্রাণচেষ্টার পসরা নিয়ে। এখন

জ্যোতিষ দাশগুপ্তের পরে এসেছেন রবি বসু, রাধাকান্ত শী, জুটেছেন সেদিনকার পঙ্কজ দত্ত। এবং সেবাব্রত গুপ্ত।

কিন্তু এ-সব চৌরঙ্গীর সাহেব পাড়ার ব্যাপার। এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের সঙ্গে আজকের এই ছ' নম্বর স্টারকিন স্ট্রীটের আদর্শগত এবং ঐতিহ্যগত মিল থাকলেও, ভৌগোলিক তারতম্যকে তো অস্বীকার করা যায় না।

তাই এই নতুন বাড়ির প্রবেশ-দ্বারে নতুন পরিবেশে দাঁড়িয়ে আজো মনে পড়ে যায় এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীটের সেই অনাড়ম্বর আবহাওয়ার কথা। মনে পড়ে যায় সেই শেষ দিনটার কথা। সেদিনও সেই বর্মণ স্ট্রীটের মোড়ে এমনি করেই এক-দিন দাঁড়িয়েছিলাম। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। একে একে সমস্তই চলে গেল নতুন বাড়িতে। আমিও সেদিন গিয়েছিলাম দেখতে। চেয়ার টেবিল আলমারি লরিতে ওঠানো হচ্ছে। ছাপাখানার সাজ-সরঞ্জামও উঠলো। যে-টেবিলে বসে আমরা মুড়ি তেলেভাজা চা খেয়েছি সেটাও কুলির মাথায় উঠলো। পাণ্ডুলিপি ভর্তি কাঠের বড়-বড় আলমারি দু'টোও উঠলো লরিতে। ফাঁকা হয়ে গেল ঘরখানা। দোয়াত-কলম-ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা পর্যন্ত বাদ গেল না। খানিক পরে সন্ধ্যে নেমে এল। অন্ধকার হয়ে গেল বর্মণ স্ট্রীট। রাস্তার দু'একটা গ্যাসের বাতি টিম্ টিম্ করে জলে উঠলো। কিন্তু তাতে অন্ধকার ঘুচলো না। যেন অন্ধকার আরো বেশি ক'রে ঘনিয়ে এল। বিস্মৃতির অন্ধকার, অবসন্নতার অন্ধকার, ক্লান্তি আর অশান্তির অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা জিনিসের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। সেই কদমগাছ। সেই কদমগাছটা। 'দেশ' অফিসের টিনের চালের মাথার ওপর যে-কদমগাছ কতদিন আমাদের ক্লান্তি জুড়িয়েছে, কতদিন আমাদের ছায়া জুগিয়েছে, সারা ভাদ্রমাসটা গাছভরা অসংখ্য ফুলের পসরা সাজিয়ে যে-কদমগাছ আমাদের মনকে উদাস করে দিয়েছে, সেটা তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। ওটাকে কেন কেউ নিয়ে গেল না নতুন অফিসে, ওটার কথা কেন সবাই ভুলে গেল ?

কিন্তু না, মনে হলো, ভালোই হয়েছে, ওটাকে নিয়ে যায়নি ভালোই হয়েছে। সত্যিই তো, সাহেব-পাড়ায় কি আর কদমগাছ মানায় ? ১৩৮১

আমি বিশ্বাস করি

মাননীয় সংযুক্ত সম্পাদক 'দেশ' সাপ্তাহিকসমীপেষু—
বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্র পেলাম। আমার লেখক-জীবনের সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে আপনি আমার একটি রচনা পত্রস্থ করতে চেয়েছেন। নিজের সম্বন্ধে নিজে লেখার মত এত কঠিন কাজ আর দুটি নেই। বহুদিন ধরে লেখার জগতের মধ্যে বাস করে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় অনেক রচনাই আমাকে লিখতে হয়েছে। যখন আংশিক ভাবে লেখক ছিলাম তখনও যেমন, আবার তারপর যখন পরিপূর্ণভাবে লেখাকে পেশা করে নিলাম তখনও তাই। ভালো-মন্দ পাঠ্য-অপাঠ্য এ-যাবৎ অনেক লিখেছি। অনেক গৌরবের পাশাপাশি আমার অনেক লজ্জাও ছাপা হয়ে গিয়েছে। গত বছরের (১৩৮১) সাহিত্য-সংখ্যায় 'এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট' রচনাটি লিখতে গিয়ে আমায় তেমন কোনও অসুবিধার মধ্যেই পড়তে হয়নি। কারণ তাতে আমার নিজের কথা বলার দায়-দায়িত্ব ছিল না। সেখানে আমি ছিলাম একজন দর্শক মাত্র। আমার চোখে আমার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধব এবং তৎকালীন সাহিত্য-আবহাওয়ার বর্ণনা দেওয়াই ছিল আমার রচনার বিষয়বস্তু। সেখানে আমার উপস্থিতি ছিল একান্তই গৌণ!

কিন্তু এবার যে-দায়িত্ব আপনি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন তা অত্যন্ত দুরূহ। দুরূহ, কারণ এ-রচনার নায়ক আমি নিজে। আমার ব্যক্তি-সত্তাই এই রচনার বিষয়বস্তু। নিজেকে আড়ালে রেখে নিজের কথা বলবো কী করে? অথচ নিজেকে নিজের রচনার আড়ালে রাখাই তো সবচেয়ে বড় শিল্প-কর্ম। নিজেকে অদৃশ্য রেখে সাহিত্য-রচনার কলা-কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টাই তো এতদিন করে এসেছি। তাতে যে সব সময়ে সার্থক হতে পেরেছি তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই যে আমি ব্যর্থ হয়েছি তা স্বীকার করতে আজ এ-বয়েসে আমার লজ্জা নেই। আব্রাহাম কাউলে সাহেবও বলেছেন যে, নিজের সম্বন্ধে নিজে লেখা সব চেয়ে শক্ত কাজ। লেখক যদি সে-লেখার মধ্যে নিজেকে প্রশংসা করেন তাহলে পাঠকদের কাছে তিনি বিরাগভাজন হবেন আর তিনি যদি তাঁর নিজের লেখার

নিন্দেও করেন তাহলে আবার লেখকের নিজের কাছেই তা অপ্রীতিকর ঠেকবে।

তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখকদের লেখা আত্মজীবনী রচনাবলী ব্যর্থতায় পরিণত হয়। হয় তা আত্মপ্রশংসা বা আত্মপ্রচারমুখর হয়ে ওঠে আর নয় তো তা কুৎসিত পরচর্চায় পর্যবসিত হয়।

যা হোক, আপনার নির্দেশ মাথা পেতে নিলাম। নিলাম এই কারণে যে 'দেশ' পত্রিকায় আমার অনেক ধারাবাহিক রচনা গত তিরিশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং সেই সূত্রে 'দেশ'-এর অসংখ্য পাঠকের সঙ্গেও আমার একটা পরোক্ষ যোগসূত্র চিহ্নিত হয়ে আছে। এবং তাঁদের পক্ষ থেকেও আমার ওপর একটি পরোক্ষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই ভাবলাম এ তো শুধু আপনার একলার প্রত্যক্ষ নির্দেশই নয়, পরোক্ষভাবে আমার পাঠকদের দাবিও এর সঙ্গে জড়িত।

সেই তাদের দাবি মেটাতেই আজ কলম ধরেছি।

কিন্তু নিজের কথা বলবার আগে আর একজন বিদেশী লেখকের কথা বলে নিই। সেই বিদেশী লেখকের কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে তাঁর লেখক-জীবনের পরিচিতি থেকে ভাবী লেখকদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তাঁর নাম স্যামুয়েল বাটলার।

১৯০২ সালে স্যামুয়েল বাটলারের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ আমাদের জন্মের অনেক আগে। আমরা যে-সমাজ দেখেছি সে-সমাজের বাইরের লোক তিনি। তার ওপর তিনি এমন এক দেশের সাহিত্যিক যে-দেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন, এবং যে-দেশে তখন দিনে রাতে সূর্য কখনও অস্ত যেত না। তিনি সেই দেশের সাহিত্যিক হয়েও যে নিদারুণ অবহেলা ও আঘাত পেয়েছেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় এবং পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও সাহস পাওয়া যায়।

তিনি এক-একটা করে বই লিখতেন আর তা অবহেলিত হয়ে প্রকাশকের দোকানেই পড়ে থাকতো, কেউ একখানা কপি কিনেও তাঁকে ধন্য করতো না। ১৮৮০ সালের মধ্যে তাঁর ছ'খানা বই প্রকাশিত হবার পরেও তিনি দেখতে পেলেন তাঁর বই কোনও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না।

চেনা লোকেরা তাঁকে উপদেশ দিতে এগিয়ে এল।

তারা বললে—কী হে, এতগুলো বই লিখেও তো তোমার কিছু হলো না—

বাটলার বললেন—তা না হলে না হবে, আমি তার জন্যে আর কী করতে পারি ?

তারা বললে—এ-রকম হাত গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকলে কি চলে ? একটু ঘোরা-ঘুরি করতে হয়, পাঁচজনের সঙ্গে দেখা-শোনা করতে হয়, তবে তো হবে।

তিনি বললেন—কোথায় ঘোরাঘুরি করবো ?

—কেন ? যাদের সঙ্গে মিশলে তোমার স্বার্থ-সিদ্ধি হবে তাদের সঙ্গে মিশবে। ধরো কোনও সম্পাদক, বা কোনও সমালোচক, তাদের কাছে গেলে। গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সব লেখকই তো তা করে থাকে। তাই করাই তো নিয়ম। আর তুমি কি এমন তালেবর লেখক যে তুমি পাথার তলায় বসে বসে বই লিখবে আর তারা তোমায় বাহবা দেবে ?

কথাটা শুনে বড় রাগ হয়ে গেল বাটলারের। তিনি বললেন—ওদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে যদি সমস্ত সময়টা নষ্টই করি তাহলে বই পড়বোই বা কখন আর বই লিখবোই বা কখন, বলুন ?

তারা বললে—সময় করে নিতে হবে। অন্য লেখকরা যেমন করে সময় করে নেয় তেমনি করেই সময় করে নেবে। তুমি কি বলতে চাও তুমি একলাই লেখক আর কেউ লেখক নয় ? আর তা যদি না পারো তো রাত্তির জেগে জেগে লেখো আর দিনের বেলা ওদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে বেড়াও—

কিন্তু স্যামুয়েল বাটলার ছিলেন অন্য ধাতুর লেখক। তিনি ওই ধরনের কাজ করে সার্থক লেখক হওয়াকে বলতেন 'guinea-pig success'। তাই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তিনি কারোর সঙ্গেই দেখা করতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে রেখে গেছেন "I am too fond of independence to get on with the leaders of literature and science. Independence is essential to permanent but fatal to immediate success."

এই কাহিনী অবশ্য আমি আমার লেখক-জীবনের শুরুতে জানতাম না। বড় হয়ে বই পড়ে জেনেছি। জেনেছি আর অবাক হয়ে ভেবেছি এ-রকম সাহস এ-রকম আত্মবিশ্বাস আমাদের এ-যুগে ক'জনের আছে ?

লেখকের জীবদ্দশায় যে-কোনও সম্মান সন্দেহজনক আর সে-সম্মান যে বেশির ভাগই guinea-pig success এ-কথা রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও পড়ে-

ছিলাম, কিন্তু সে-যুগের স্যামুয়েল বাটলার তা জানলেন কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন "বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড় সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে কিন্তু যশ জিনিসটিতে সে স্থবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনই বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মান লাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জো নাই।"

এ লেখাটাও ছোটবেলায় আমার নজরে পড়েনি! বাড়িতে আলমারিতে যেখানে চামড়ায় বাঁধাই বই থাকতো সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন, মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্রের রচনাবলীর ওপরে সোনার জলে লেখা তাঁদের নামগুলো কাচের বাইরে থেকে ঝক-মক করতো। কিন্তু সেগুলো পড়বার অনুমতি পেতাম না। উপন্যাস পড়লে কোমল-মতি ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটবে এইটেই ছিল তখনকার আমলের শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনদের ধারণা। তাই বই-গুলোর ভেতরের বিষয়বস্তু আমার নাগালের বাইরে রাখবার জন্যে আলমারির দরজা বরাবর চাবি-বন্ধ থাকতো!

মনে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগে ওর চাবিও আমার হস্তগত হয়নি। যেদিন তা হস্তগত হলো তখন প্রথমেই পড়লাম 'দুর্গেশনন্দিনী'। আমার জীবনের সেই প্রথম মহৎ উপন্যাস পড়বার অপূর্ব উপলব্ধির কথা আমার এখনও মনে আছে। ভাবলাম বই পড়তে পড়তে এই যে এক অপার অনুভূতি হওয়া একে তো কোনও ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না। এরই নাম কি তবে ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর?

মানুষের বয়েস যখন কম থাকে, তখন অতি অল্পতেই সে অভিভূত হয়ে পড়ে। সামান্য পেলেই সে খুশী হয়। তার বেশি সে পেতে চায় না। কিন্তু এমন এক-একজন বেয়াড়া ছেলে-মানুষও সংসারে থাকে যে অনেক কিছু খেলনা পেয়েও আরো বড় কিছু খেলনা পাওয়ার জন্যে ছটফট করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সেই পাওয়াতেই মানুষের চরম আনন্দ যার মধ্যে না-পাওয়া জড়িত'। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়বার পর আমি থেমে থাকলুম না। একে-একে বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলো রচনা শেষ করে ফেললাম। কিন্তু তাতেও আমার তৃপ্তি হলো না। মনে হলো আরো বই পড়ি। কিন্তু কোথায় পাবো আরো বই? আমার

বাড়িতে যে-সব বই ছিল সেগুলো তখন নিঃশেষ! আমার মনের ভেতরে উপন্যাস লেখার একটা ক্ষীণ তাগিদ এল। এর আগে সাহিত্য-রচনার কোনও ইচ্ছাই বা আগ্রহই আমার হয়নি। মনে আছে যখন সবে আমি কৈশোরে পা দিয়েছি, যখন আমার বয়েস বারো বছর কি বড জোর তেরো, তখন এমন একটা সুযোগ এল যা সেই সময়ে আর কখনও আসেনি। সুযোগটা হলো এই যে হাওড়া স্টেশন থেকে বেহারের এক সুদূর গ্রামে আমাকে একলা ট্রেনে করে যেতে হবে। উদ্দেশ্য, আমাদের বাড়ির এক বিবাহ অনুষ্ঠানে আমার এক আত্মীয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা। বরাবর বাবা-মা-আত্মীয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের তীর্থগুলোতে ভ্রমণ করে এসেছি। কিন্তু স্বাধীন হয়ে একলা ট্রেনে উঠবো, প্ল্যাটফরমের ভেণ্ডারদের কাছ থেকে যা-ইচ্ছে তাই কিনে খাবো, কেউ কিছু বলবে না, পয়সার জন্যেও কারো কাছে হাত পাততে হবে না, এ বড কম স্বাধীনতা নয়!

তা যথাসময়ে সুটকেশ-বিছানা নিয়ে ট্যাক্সি চডে হাওডা স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। নিজেই ট্রেনের কামরায় চডে বসলাম। ঠিক যেমন ভঙ্গি করে বড়রা ট্রেনে চড়ে তেমনি ভঙ্গিই অনুকরণ করলাম। গাডিতে বাকি তিনটে বার্থে আরো তিনজন প্যাসেঞ্জার। আমার কাছে সেকালের সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট। সুতরাং আমার ভাবখানাও রীতিমত খানদানি। কুলীর পাওনাও মিটিয়ে দিলুম। কিন্তু ট্রেন ছাডবার তখনও অনেক দেরি। রাত তখন প্রায় সাতটা কি সাড়ে সাতটা। সমস্ত রাত ট্রেনে চডে ভোরের দিকে মোকামা ঘাট জংশনে স্টীমারে গঙ্গা পার হতে হবে। তারপর স্টীমার থেকে ট্রেনে সিমারিয়া-ঘাটে আবার ট্রেন ধরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পরের দিন দুপুর প্রায় বারোটা বেজে যাবে। এতখানি সময় একলাই কাটাতে হবে আমাকে। সঙ্গে একজন কেউ থাকলে তবু তার সঙ্গে কথা বলে সময়টা কাটানো যায়। কিন্তু এ তো তা নয়। আমার সঙ্গী বলতে মাত্র আর তিনজন, যারা আবার আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এবং বয়েসেও অনেক বড। সুতরাং সময় কাটাই কী করে?

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ নজরে পডলো আমার কামরার সামনে প্ল্যাটফরমের ওপর একটা ঠেলা-গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। তাতে অসংখ্য রং-চঙে পত্রিকা। মনে হলো বড়দের মত আমিও যে-কোনো একটা পত্রিকা কিনি। তবুও তো তাই পড়ে সময়টা কাটবে!

সালটা বোধহয় ১৯২৪ কি ১৯২৫। আর কালটা বোধহয় কার্তিক মাস।

অর্থাৎ দুর্গাপুজো কেটে গিয়ে, কালীপুজোও কেটে গেছে। অগ্রহায়ণ তখন পড়বে-পড়বে। দেখলাম অনেক পত্রিকাবাহী সেই ঠেলা-গাড়িটা আমাকে কাছে যেতে দেখে থেমে গেল। আমি দেখলাম বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি সেকালের নামী দামী চালু পত্রিকা সাজানো। কিন্তু দাম বড় বেশি। আট আনা করে এক একটা। আমি অপেক্ষাকৃত সস্তার পত্রিকা খুঁজে একটা পত্রিকা হাতে তুলে নিলাম। সেখানার নাম 'বাঁশরী', সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। দাম বোধহয় মাত্র চার আনা। তা চার আনা পয়সার দাম সে যুগে অনেক। আমি দাম দিয়ে পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে আবার আমার কামরায় এসে বসলাম আর পত্রিকাটির পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেলাম। একটা ছোট কবিতা, পত্রিকাটির পাতার ডানদিকে পাদপূরণ হিসেবে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে। সে যুগের রীতি অনুযায়ী ছন্দ মিলিয়ে লেখা। কবিতাটির লেখকের নাম মনে নেই। এমন কি কবিতার একটি লাইনও মনে নেই এখন। তবে এইটুকু মনে আছে যে কবিতাটির আশে-পাশে অনেকখানি খালি জায়গা পড়ে ছিল। কবিতাটি পড়তে পড়তে আমার হঠাৎই মনে হলো আমি যেন নিজেও চেষ্টা করলে এ-রকম কবিতা লিখতে পারি। পকেটে তখন আমার কাগজও নেই, ফাউন্টেন পেনও নেই। আর এখনকার মত তখন ফাউন্টেন-পেনেরও এত প্রচলন ছিল না। তবে তখনকার রীতি অনুযায়ী ছিল মাত্র একটা পেনসিল। সেই পেনসিলটা দিয়েই সেই কবিতার ফাঁকা জায়গাটুকু একটা কবিতা লিখে ভর্তি করে ফেললাম। অক্ষম মিল, অক্ষম কাব্য, অক্ষম প্রচেষ্টা। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? সেই চলন্ত ট্রেনের সে-যুগের নিরিবিলি সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার মধ্যেই সে-রাত্রে আমার জীবনের প্রথম কবিতা সৃষ্টি হলো।

ভালো-খারাপের বোধ তখন হয়নি। ভালো হোক খারাপ হোক, আমির সঙ্গে স্বামী এবং খেলার সঙ্গে হেলা এবং যায়-এর সঙ্গে হায় তো মিলিয়েছি। বারো বছর বয়েসে ওর চেয়ে বেশি আশা আর কী করতে পারি। ছাপানোর প্রশ্ন অবশ্য তখন মাথায় উদয় হয়নি। কারণ তখন হাতে লেখা পত্রিকার যুগ। লেখা যদিও সম্ভব, ছাপানো তো আরো কঠিন সমস্যা। সুতরাং আমার সেই লেখা সেইখানেই শেষ। এ-ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করতে হলো এই কারণে যে আমার পাঠকদের অনেকের মনেই একটা জিজ্ঞাসা আছে যে কেমন করে কখন আমার মনে লেখার ইচ্ছে জাগ্রত হলো।

আপনিও লিখেছেন, 'আমরা জানতে চাই সাহিত্য-কর্মে প্রথম প্রবেশের প্রেরণা আপনার মধ্যে কী ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল।' আশা করি ওপরে বর্ণিত ঘটনায় আপনার এ-প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে। তবু সাহিত্য-কর্মে প্রবেশের প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে এইটেই আমার একমাত্র জবাব নয়, প্রধান প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে পরে আরো বিশদভাবে বলবো।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'আপনার রচনা প্রথমে কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল?'

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আবার কিছু গোড়ার কথায় যেতে হবে। স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করলে তবেই অত সুদূর গোড়ার কথায় পৌছোন যায়। কিন্তু সে কি আজকের কথা? আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একটা চমৎকার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তিনি কোথায় যেন লিখেছেন লেখকের জীবনে তিনটে স্তর থাকে। প্রথম স্তরে অর্থাৎ একেবারে বাল্যকালে বা লেখক-জীবনের সূত্রপাতে লেখক ভাবেন যে তিনি যা লিখছেন তা অপূর্ব, তা একেবারে তুলনাহীন। কিন্তু সম্পাদক বা পাঠক তাঁকে ঠিকমত বুঝতে পারছেন না। তখন তাঁর মনে হয় সম্পাদক বা পাঠক নির্বোধ বলেই তিনি যথাযোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না। এই প্রথম স্তরে লেখকের মনে সম্পাদক বা পাঠকদের ওপর ঘৃণা জন্মায়। যার ফলে লেখক মানসিক অশান্তিতে ভোগেন।

এর পরে দ্বিতীয় স্তর। এই দ্বিতীয় স্তরে পৌছে লেখক নিজের রচনার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল হন, আর সম্পাদক বা পাঠক সম্প্রদায়ও তখন আংশিকভাবে লেখককে গ্রহণ করতে শুরু করে। বলতে গেলে তখন থেকেই শুরু হয় লেখকের ভালো-মন্দের বিচার বিশ্লেষণ। তবে উল্লেখ করা ভালো যে এই দ্বিতীয় স্তরে পৌছোবার আগেই অনেকে কঠোর সংগ্রাম সহ্য করতে না পেরে বা অর্থলোভে লেখার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে কোনও সহজলভ্য সাফল্যের আশায় বিষয়ান্তরে আত্মনিয়োগ করেন, অর্থাৎ লেখার জগৎ থেকে তাঁর অন্তর্ধান ঘটে। তিনি তখন কোনও নিশ্চিন্ত চাকরি বা পেশা গ্রহণ করে অবসর মত সামান্য সামান্য সাহিত্যচর্চা করেন।

এবার তৃতীয় স্তর।

এই স্তরটিই লেখকের জীবনে মারাত্মক।

যাঁরা অক্লান্ত ধৈর্য আর অসীম মনোবলের অধিকারী, যাঁরা বিপক্ষের নিন্দা বা কুৎসায় বিভ্রান্ত বা বিক্ষুব্ধ হন না, তাঁরাই কেবল এই তৃতীয় স্তরে পৌছোবার

শক্তি রাখেন। কিন্তু তা বলে সংগ্রামের শেষ তাঁর তখনও হয় না। বরং সংগ্রামের তীব্রতা হাজার গুণ বাড়ে। তখন সেই লেখকের ওপর সম্পাদক বা পাঠকদের দাবি উত্তরোত্তর তীব্র হতে থাকে, এবং এই দাবি মেটাতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রমে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিঃশেষিত হওয়াই তাঁর একমাত্র বিধিলিপি।

হেমিংওয়ের এই মতের সঙ্গে অনেক লেখকের জীবনই হয়ত মিলে যাবে, আবার কোনও লেখকের মত হয়ত বা মিলবে না। তবে আমার নিজের মনে হয়েছে কথাটা অর্ধ-সত্য বা অর্ধ-মিথ্যে।

পূর্ণ সত্য তো একমাত্র ব্রহ্ম। অবশ্য ব্রহ্ম বলে যদি কিছু থাকে। এ ছাড়া পৃথিবীর আর সবই তো অর্ধ-সত্য। আপেক্ষিক। তাই সব সময়ে একজন লেখকের জীবনের সঙ্গে আর একজন লেখকের জীবনের ঘটনার মিল থাকে না। আমার জীবনে হেমিংওয়ের এই কথাগুলো কতটা সত্য তাই ভাবা যাক্।

যতদূর মনে পড়ে কালগতভাবে আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় এমন একটি পত্রিকায় যার নাম এবং যে-লেখার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নেই। কলকাতা শহরে যে-অঞ্চলে আমার বাস সেই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হতো একটি ছোট পত্রিকা। আজকালকার ভাষায় যাকে বলা যায় 'লিটল ম্যাগ্যাজিন'। কিন্তু ছাপা অক্ষরে যখন সেটি প্রকাশিত তখন তাকে প্রথম প্রকাশই বলা চলে। বা প্রথম প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ঘটনাটা আমাকে তত আনন্দিত করেনি। আনন্দিত না-করার কারণ এই যে সম্পাদক ছিলেন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দাদা। ছোট ভাই-এর বন্ধুর লেখা কবিতা বড় ভাই-এর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হবে এতে আমার গর্বিত হবার কী আছে? সুতরাং এটা আমার প্রকাশিত রচনা হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবি নামঞ্জুর হয়ে গেল।

'সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রেরণা'র সঙ্গে 'প্রথম রচনা' প্রকাশিত হবার যদি কোনও যোগসূত্র থাকে তাহলে বলবো আমার জীবনে ও দুটোই ছিল একার্থক। কারণ প্রেরণাই তো প্রকাশের উৎস। আর এই প্রেরণার উৎস ছিল আমার চারপাশের জগৎ। এই চারপাশের যে জগৎ তা আমার সৌভাগ্যবশত আমার প্রতি ছিল নিষ্ঠুরভাবে বিরূপ। এ ছাড়া আমার জীবনে আমাকে নিরুৎসাহ ও নীরব করে দেবার লোকের কখনও অভাব হয়নি—এ কথা প্রকাশ করতে আজ আমার গর্ববোধ করবার কারণ ঘটেছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে বাল্যকাল থেকে আমি ছিলাম একান্তভাবেই সঙ্গীতের ভক্ত। সঙ্গীত আমাকে যত

আকর্ষণ করতো, সাহিত্য তত নয়। আমার চারপাশের বিরূপ জগৎ যখন আমাকে নিঃসঙ্গ করে দিলে তখন সঙ্গীতই ছিল আমার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু সঙ্গীত আত্মপ্রকাশের এমনই এক মাধ্যম যা চর্চা করতে গেলে নিঃশব্দ হয়ে করা যায় না। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে করলেও যার শব্দভেদী বাণ পাড়া-পড়শির কান বিদ্ধ করে বিরক্তি উৎপাদন করবার কথা। বাড়ির ছাদ আর নির্জন নিরিবিলি প্রান্তরই যার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। আর সঙ্গীত বলতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বা গ্রাম্য লোক-সঙ্গীত তো নয়, সঙ্গীত বলতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কথাই বলছি ; সে আরো বিকট। যার শিক্ষানবিশি-কালে মধ্যবিত্ত পরিবারের নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনরাও পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে ওঠেন।

আর স্কুলের লেখাপড়া ?

আমি বরাবর খাই-দাই আর কাঁশি বাজাই গোছের লোক। সেই কাজ-গুলোই আমার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়। একদিকে গান আর একদিকে কবিতা লেখা—এই দুই রকম কাঁশি এক হাতে বাজানো বড কম কেরামতির কাজ নয়। তবু তাই নিয়েই থাকি। তখনকার যুগে সিনেমা বা বাড়িতে বাড়িতে রেডিও বাজাবার ধুম ছিল না। ভালো কালোয়াতি গান শুনতে গেলে কলকাতা শহরের কোন ধনী জমিদার বা বড়লোকের বাডির আসরে গিয়ে রাত জেগে সে-গান শুনতে হতো। কিন্তু কবিতা ? আমি নিজের ঘরের ভেতরে বসে কবিতা লিখছি না ভূগোল পড়ছি তা কেউ বুঝতে পারতো না। সুতরাং সাহিত্য করার মত নিরাপদ এবং নিরুপদ্রব কাজ আমার স্বভাবের পক্ষে ছিল বড অনুকূল।

একদিন আমাদের বাড়ির পাশের এক সহপাঠী আমাকে সংবাদ দিলে যে তার যিনি গৃহ-শিক্ষক তিনিও কবিতা লেখেন। সংবাদটা সুসংবাদ। বাড়ির এত কাছে এমন একজন কবি থাকতে কিনা আমি নিঃসঙ্গতা রোগে ভুগছি! তবে যে কুলোকে বলে ভগবান নেই ?

উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে আমার ইস্কুলের একজন সমবয়েসীকে কথাটা বললাম। উৎসাহ তারও খুব। কারণ সেও কবিতা লেখে। কবিস্য কবিয়ো গতি।

সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম। আমি আর সেই আমার সমবয়েসী বন্ধু অজিত পরদিনই কবিতার খাতা বগলে নিয়ে সহপাঠীর মাস্টার মশাই-এর কাছে গেলাম। আমি আর অজিত দুজনেই কবিতা লিখি। সুতরাং দুজনেই আমাদের কবিতা সম্বন্ধে একজন বয়স্ক কবির মতামত জানতে আগ্রহী।

মাস্টার মশাই তখন বি-এ পাস করেছেন। বেশ কবি-কবি চেহারা। লম্বা-লম্বা এলোমেলো চুল, গায়ে তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী ঢোল্লা পানজাবি।

আমাদের সঙ্গে কবিতা সম্বন্ধে তাঁর অনেক আলোচনা হলো। তিনি বললেন—কবিতা লেখা বড় শক্ত জিনিস, ওটা সকলের আসে না, এমনকি চেষ্টা করলেই যে কেউ কবি হতে পারবে এমন কোনও গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না—

বলে নিজেই তিনি একটা খাতা বার করলেন। তারপর বললেন—এই দেখ, আজকে ভোরবেলাই এই কবিতাটা মাথায় এসে গেল তাই সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলেছি, পড়ছি, শোন—

তিনি তাঁর কবিতা পড়তে লাগলেন আর আমরা মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে লাগলাম।

বাঁশ-বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?
পুকুর ধারে লেবুর তলে,
থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
মাগো আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই ?

মস্ত বড় কবিতা। পড়তে অনেকক্ষণ সময় লাগলো। কিন্তু মনে হলো আরো অনেকক্ষণ সময় লাগলেও যেন ভালো হতো। যেন অত্যন্ত কম সময়ে পড়া শেষ হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগলো ?

আমরা দুজনেই বললাম—অপূর্ব—

মাস্টার মশাই বললেন—তোমরাও তো কবিতা লেখ শুনেছি, কবিতা এনেছ ?

অজিত তৈরিই ছিল সঙ্গে সঙ্গে খাতাটা বার করে পড়তে লাগলো—

"ওগো কালো মেঘ বাতাসের বেগে
যেওনা যেওনা যেওনা ভেসে।
নয়ন জুড়ানো মূরতি তোমার
আরতি তোমার সকল দেশে"

মাস্টার মশাই খুব মন দিয়ে চোখ বুঁজে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। পড়া শেষ

হলে অজিতকে বললেন—খুব ভালো, তোমার হবে, তবে ছন্দ সম্বন্ধে যদি আর একটু কেয়ারফুল হও—তো বড় হলে তুমি খুব নাম করবে···

তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ?

আমি তখন লজ্জায় জড়-সড় হয়ে আছি। আমার কবিতাটা যদি মাস্টার মশাই-এর ভালো না লাগে ?

শেষ পর্যন্ত পড়তেই হলো, আর পালাবার পথও আমার ছিল না তখন। একটা লাইন পড়ি আর ওদের মুখের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখি। তাদের মুখে তাদের মনের কোনও রেখাপাত হলো কিনা তাই লক্ষ্য করতে চেষ্টা করি।

কোনও রকমে কবিতা শেষ করে মাস্টার মশাই-এর মুখের দিকে চাইতেই বুঝতে পারলাম তাঁর ভালো লাগেনি।

মাস্টার মশাই শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন।

বললেন—তোমারটা তো হয়নি হে—

আমি মুষড়ে পড়লাম। তেরো বছর বয়েসের একজন বালকের মুখের ওপরেই মাস্টার মশাই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন—না, তোমারটা তো হয়নি—

কেন হয়নি, কেন হবে না, কী করলে হবে, কোথায় দোষ ত্রুটি, তার কোনও হদিশ নেই, তার কোনও নির্দেশও নেই। শুধু হয়নি আর হবে না এই কথা শোনবার জন্যেই আমি যেন এতদিন বেঁচে আছি। তেরো বছর বয়েসই হোক আর তিপ্পান্ন কি তিয়াত্তর বছর বয়েসই হোক, আমার কোনও দিন কোনও কিছু হবার নয় যেন। সকলের কাছেই চিরকাল একটা কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে যে আমার কিছুই হয়নি—হবে না—

অথচ যাদের হবার কথা সেই সহপাঠীর মাস্টার মশাই পরবর্তী জীবনে হাজারিবাগে কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন, এবং আমার সেই সমবয়েসী বন্ধু পরবর্তী জীবনে ক্যালকাটা করপোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের বড়বাবুর পদাভিষিক্ত হয়ে সেই চেয়ারের শোভা বর্ধন করেছিলেন। ভালোই করেছিলেন। কারণ পরে জেনেছি প্রথমজন যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বিখ্যাত কবিতাটি হুবহু অনুকরণ করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়জন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত কবিতাটি অনুকরণ করে সেদিন প্রথম জনের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই সেদিন পরের কবিতা আত্মসাৎ করেও সুখ্যাতি কুড়িয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ত্যাগ করে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমিই মরেছি। আমি এ নেশা আর ছাড়তে

পারিনি। আর এতদিনে আমি জেনে গিয়েছি যে এ ব্যাধি একবার যখন আমাকে আক্রমণ করেছে তখন যতদিন না আমার মৃত্যু হয়, ততদিন এ আর আমাকে ছাড়বে না।

অবশ্য একে ব্যাধি বলছি বটে, কিন্তু সত্যিই কি এ ব্যাধি?

এ ছাড়া তো অন্য কোনও পথও ছিল না আমার। আমাদের ছোট বয়েসে সেই দেশব্যাপী বেকারত্বের যুগে যার কিছু হবার নয় সে হোমিওপ্যাথি পড়তো। আমি বোধহয় তার চেয়েও ছিলাম অধম। অর্থাৎ যাত্রার কথোপকথনের ভাষায় যাকে বলা যায় নরাধম। তখন না পারি কারো দিকে মুখ তুলে চেয়ে কথা বলতে আর না পারি নিজের ন্যায্য দাবি জোর করে আদায় করতে। এখনকার মত আঘাত পেলে চুপ করে থাকাই আমার বরাবরের স্বভাব। কলা-কৌশলে নিজের কার্যসিদ্ধি করার যে আর্টটা প্রায় প্রত্যেকেরই করতলগত সেটুকুও আমার কখনও আয়ত্ত হয়নি। আমি সে-যুগেও বিশ্বাস করেছি এবং এখনও বিশ্বাস করি যে কার্যসিদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করে কেবল "Guinea-pig success"ই হয়, কিন্তু স্থায়ী ফল পাওয়া যায় একমাত্র খাঁটি ঐকান্তিকতা ও স্বাধীনতার মূল্যে। তাই আমার এই সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসা ছাড়া আর কোনও গতিও ছিল না। অর্থাৎ নরাধমের যেটা একমাত্র শেষ আশ্রয়-স্থল।

এই সময়ে আমার এক বন্ধু এসে আমাকে খবর দিলে যে আমার একটা কবিতা 'মাসিক-বসুমতী'তে আগামী কোনও সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

আমি হতবাক। আমার অবস্থা দেখে সে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করলে। আসলে সে তখন বৌবাজারের একটি কলেজে ডাক্তারি পড়তে যেত। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে দেখেছে একটা বাড়ির দেয়ালে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র নাম লেখা একটা নির্দেশ জ্ঞাপক বোর্ড ঝুলছে। সে ছিল আমার কবিতার ভক্ত। তার ওপর তার কাছে আমার অনেক কবিতা গচ্ছিত থাকত। সে তারই মধ্যে একটা কবিতা সম্পাদককে গিয়ে দিয়ে এসেছে।

বললাম—তারপর?

বন্ধুর কথায় প্রতীত হলো লেখাটি সম্পাদক প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন এবং পরের কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি প্রকাশিত হবে।

বন্ধু বললে—কিন্তু তোকে একবার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

—কে সম্পাদক?

—সরোজনাথ ঘোষ, তোদের পাড়াতেই থাকেন। তিনি বলে দিয়েছেন—বিমলকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বোল।

সরোজনাথ ঘোষ আসলে তখন 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক নন, সহকারী সম্পাদক। বিখ্যাত লেখক, 'শত গল্প গ্রন্থাবলী' 'রূপের মোহ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি আমাদের পাড়াতে থাকেন, এ-কথা আমার কাছে ছিল একটা আবিষ্কারের মতন। মনে আছে দুরু-দুরু বুক নিয়ে একাধারে নিতান্ত আগ্রহ এবং অনিচ্ছার সঙ্গে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তিনি এক ঘণ্টা ধরে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। কবিতাটি ছাপার প্রসঙ্গে তিনি ফ্লবেয়ারের কাছে গিয়ে মোপাঁসার লেখা-শেখার কাহিনী বলেছিলেন সবিস্তারে। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেক স্থলে একমত হতে না পারলেও সেদিন তাঁর কাছে আমি অনেক মূল্যবান উপদেশ শুনতে পেয়েছিলাম যা পরবর্তী জীবনে আমার কাজে এসেছিল। তিনি আমাকে গল্প লিখতে বলেছিলেন 'মাসিক বসুমতী'র জন্যে। আমি একটা গল্প তাঁকে দিয়েও ছিলাম। কিন্তু তিনি সেটা ফেরত দিয়েছিলেন। ছাপেননি। বলেছিলেন—এ ম্লেচ্ছ ভাষায় লেখা, এ চলবে না—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ম্লেচ্ছ ভাষা মানে?

তিনি বললেন—মানে চলতি ভাষা। বাজারের ভাষা। বাজারের ভাষায় সাহিত্য হয় না। সাধুভাষায় লিখবে। যে ভাষায় বাঙলা দেশের সমস্ত মহাপুরুষরা লিখে গেছেন, সেইটেই আদর্শ ভাষা। এত ছোটবেলা থেকেই যদি তুমি ম্লেচ্ছ ভাষায় লিখতে শুরু করো তা হলে বড় হয়ে লেখায় আর হাত পাকবে না। যেমন আধুনিক গান। আধুনিক গান দিয়েই যদি কেউ সঙ্গীত-সাধনা শুরু করে তাহলে বড় হয়ে কখনও সে কি বড় গায়ক হতে পারে? বড় সঙ্গীতজ্ঞ হতে গেলে প্রথমে তাকে মার্গ-সঙ্গীত চর্চা করতে হবে। তারপরে আধুনিক গান—

বললাম—কিন্তু আপনাদের কাগজে যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন সে সবই তো চলতি ভাষায়!

সরোজনাথ ঘোষ রেগে গেলেন আমার কথা শুনে। বললেন—আগে ওঁদের মত বড় লেখক হও তখন ওই ভাষাতে লিখলে তোমার লেখাও ছাপবো।

তাঁর কথায় সেদিন সায় দিয়ে চলে এলাম। ঠিকই বলেছিলেন তিনি। আমার তখন সতেরো আঠারো বছর বয়েস। আমি কী-ই বা বুঝি, আর কী-ই

যা জানি তখন। তবু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে যখন কথাগুলো বললেন, তখন মেনে চলবো স্থির করলাম। 'মাসিক বসুমতী'র ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমার সেই কবিতাটিই আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

কিন্তু শুধু কবিতাতে আমার মন ভরছিল না। মন না ভরার কারণ হিসেবে বলা যায় সীমাহীন নিরাকার ব্যাপ্তির মধ্যে আমার মন একটা সাকার রূপকে ধ্যান করতে চাইছিল। সঙ্গীত থেকেও বোধহয় সেই কারণে আমি ধীরে ধীরে গল্প-উপন্যাসের জগতে চলে আসতে চাইছিলাম। কবিতার বা গানের অসীমতার মধ্যে আমি মাঝে-মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, কিন্তু গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে মনে হতো আমি যেন একটা সসীম ভূখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে অসীমের গভীরতা উপলব্ধি করছি। মনে হতো আবাঙমনসোগোচরের মধ্যে বাস করেও পা রাখবার মত বাস্তব একখণ্ড জমি পেয়েছি। আমার পৃথিবী, আমার সংসার, আমার ভালোবাসা, আমার দুঃখ, আমার লেখা, এই উপলব্ধিটা আমার নিজস্ব মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে যতটা স্পষ্ট হতো, কবিতায় বা গানে ততটা হতো না।

তাই কবিতা লেখা ত্যাগ করলেও একেবারে তা পরিত্যাগ করা গেল না। গান লিখে সেই অভ্যাসটা তখনও বজায় রইল বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বেশি পরিমাণেই চলতে লাগলো গল্প লেখা। সাধু ভাষায় গল্প লেখা। আর সেই গল্পগুলো ছাপাবার জন্যে উপযাচক হয়ে ডাকযোগে পাঠাতে লাগলাম তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রগুলোর দফতরে। কোনও লেখক, সাহিত্যিক বা সম্পাদকের সঙ্গে তখন আমার চাক্ষুষ অথবা পরোক্ষ কোনও পরিচয়ই নেই। প্রথম প্রথম তা ফেরত আসতে লাগলো, প্রথম প্রথম প্রায় কোনও জবাবই পেতাম না সম্পাদকীয় দফতর থেকে। ধৈর্য পরীক্ষার সেই মাসগুলোর সেই বছরগুলোর দৈর্ঘ্য আমাকে যে কী অমানুষিক পীড়ন করেছে, তা এখানে স্বীকার না করলে এখন এই বয়েসে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সাধারণত কোনও পত্রিকায় লেখা ছাপানোর ব্যাপারে সব লেখকদের সামনে দুটি পন্থা খোলা থাকে। একটি পন্থা হচ্ছে সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে তাঁর পত্রিকায় লেখা ছাপানো। আর দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে লেখা ডাকযোগে পাঠানো এবং সম্পাদকের নিরপেক্ষ বিচারে তা ছাপা হওয়া। প্রথম পন্থাটিই সহজ পন্থা। কিন্তু তাতে লেখকের

স্বাধীনতা ও বিচারকের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই আমি নিজে বরাবর দ্বিতীয় পন্থাই অনুসরণ করে এসেছি। একমাত্র ডাকঘরের সুপারিশ ছাড়া আর কারো সুপারিশের সাহায্য আমার ভাগ্যে জোটেনি। কিম্বা সে-সুপারিশ আমি চাইনি।

আর একটা তৃতীয় পন্থাও অবশ্য আছে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে দল বেঁধে চাঁদা তুলে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে নিজেদের লেখা ছাপানো। তার দ্বারাও বিখ্যাত লেখকদের এবং সম্পাদকদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসা সম্ভব। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার স্বভাবের মধ্যে দল বাঁধার প্রবণতা না থাকায় সে-পন্থার সুযোগ থেকেও আমি বরাবর বঞ্চিত হয়েছি।

আজ যে এত খুঁটিনাটি কথা বলছি তা আমার নিজের প্রয়োজনে নয়, বলছি তাঁদেরই জন্যে যাঁরা আমার পরবর্তীকালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হবেন। তাঁদের একটা কথা জেনে রাখা ভালো যে প্রত্যাখ্যান, অপযশ, অবহেলা, নিন্দা বা কুৎসা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে সংগ্রামেরই নামান্তর। সংসারের অন্যান্য ক্ষেত্রের নিয়ম এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে খাটে না। চাকরির ক্ষেত্রে একবার কোনও উপায়ে পাকা খুঁটি হয়ে বসতে পারলে তা অবসর নেবার দিনটি পর্যন্ত আর খোয়া যাবার ভয় থাকে না। কোর্টে-কাছারিতে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে খুনের আসামীকেও বেকসুর খালাস করিয়ে আনবার ঘটনা ঘটে থাকে। আবার হঠাৎ লটারিতে টাকা পেয়ে বড়লোক হওয়ার ঘটনাও আকছার ঘটছে। বিশেষ করে আজকাল। কিন্তু সাহিত্যের বাজারে প্রত্যাখান মানেই স্থায়িত্ব, অবহেলা মানেই সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, নিন্দা-কুৎসা মানেই খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির প্রসার। সাহিত্যের এই স্থায়িত্ব, এই সংগ্রাম-শক্তি, এই খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অনেক প্রত্যাখ্যান, অনেক অবহেলা,অনেক নিন্দা কুৎসার বিনিময়-মূল্যে কিনতে হয়। এখানে সহজে কিছু পেতে নেই, সহজে কিছু পেলেই তা সহজেই হারিয়ে যায়। আবার এখানে জীবদ্দশাতে কিছু পেলেও তা নিয়ে অহঙ্কার করবার কিছু নেই। সাধারণত সর্ব-শ্রেণীর কর্মচারীদের পেনশন শেষ হয় মৃত্যুর দিনটিতে, কিন্তু সাহিত্যিকের পেনশন শুরুই হয় মৃত্যুর পর দিন থেকে। আর মৃত্যুর আগে সাহিত্যিক যা পেয়ে থাকেন তা মাত্র খোরাকি। কর্মচারীদের খাজাঞ্চিখানার ভাষায় যার ইংরিজী নাম টি-এ ডি-এ। এই খোরাকিটুকুই সাহিত্যিকের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। এই কথাগুলি আমাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রই শুধু

নন, বিদেশী যে-কোনও মহৎ সাহিত্যিকদের বেলাতেও প্রযোজ্য। নিন্দা, অবহেলা, কুৎসা, প্রত্যাখ্যান তাঁদের সংগ্রামকে বরং তীব্রতর করেছে, তাঁদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিকে বরং করেছে দৃঢ়মূল।

একদিকে আমার এই সংগ্রাম যখন চলছে তখন আমার জন্যে আমার ভবিষ্যতের ভাবনায় আমার গুরুজনদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। অর্থের প্রয়োজন তখন আমার ছিল বটে, কিন্তু তা কখনও দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হয়নি। আমাদের পারিবারিক অবস্থা কোনদিনই অসচ্ছল ছিল না। কিন্তু তার ওপর আমারও ছিল অনির্দিষ্ট হলেও কিছু নিজস্ব উপার্জন। অর্থ আমার জীবনে কখনও সমস্যা হয়ে উদয় হয়নি। তখন সেই কুড়ি-একুশ বছর বয়েসে গান লিখে যে অর্থ উপার্জন করি তা নিজেকে অধঃপাতে পাঠাবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। সামান্য কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে, ওটা গল্প লিখেই উঠে আসে। 'প্রবাসী' বা 'ভারতবর্ষে' গল্প লিখে যা পাই তাতে সারা বছরের কলেজের মাইনেটা সহজেই কুলিয়ে যায়। বাকি থাকে বিলাসিতা। সেটা পুষিয়ে নিই গান লিখে। তাতে চপ-কাটলেট-চা আর ট্রাম-বাস ভাড়া বেশ অক্লেশেই উঠে আসে।

এমনি সময়ে নিজেকে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলাম। সাহিত্য-চর্চার মধ্যে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। মানুষের জীবনে নিজেকে আবিষ্কারের লগ্ন যখন আসে তখন বোধহয় এমনি করে হঠাৎই আসে। আমাকে নিয়ে আমার গুরুজনদের বরাবরই দুর্ভাবনা ছিল তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমি ছাত্র-জীবনেই নিজের জন্যে এমন একটা রাস্তা বেছে নিয়েছিলাম যার কোনও অর্থকরী কার্যকারিতা ছিল না। শুধু আই-এ, বি-এ আর এম-এ পড়লে তো অর্থকরী কোনও পারদর্শিতা হয় না। ডিগ্রীলাভ করে একমাত্র স্কুলের বা কলেজের মাস্টারি ছাড়া আর কোনও রাস্তা তাদের জন্যে তখন খোলা থাকতো না। সুতরাং তাঁদের চোখে আমার ভবিষ্যৎ তখন অন্ধকার। তার ওপর ছেলে কী করে, না সাহিত্য করে আর গান গায়। অর্থাৎ যে-দুটো কাজ একজন অপদার্থ যুবককে অপদার্থতর করতে যথেষ্ট। তাই আমাকে নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা থাকলেও আমার কাছে কিন্তু তখন আমার নিজের একটা ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছি সে স্বপ্ন তখন আরো বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অপরিচিত লোকেদের কাছ থেকে মৃদু বাহবা আসছে আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা বাড়িতে না

গিয়ে সোজা চলে যাই অক্রুর দত্ত লেনে। সেখানে চণ্ডীবাবুর রেকর্ডিং কোম্পানীর গানের আড্ডা। সেখানে গিয়ে বসি। সেখানে তখন সায়গল, রামকিষেণ মিশ্র, নিতাই মতিলাল, শচীন দেববর্মণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশারদ স্ফীতদেহ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বেহালা-বাদক ভোম্বলদা, অনিল বাগচী, প্রফুল্ল মিত্র, সজনী মতিলাল, অনিল বিশ্বাস, পান্না ঘোষ আর প্রশান্ত মহলানবিশের ভাই বুলা মহলানবিশের সঙ্গে মিশে সঙ্গীতের জগতের সঙ্গে একাকার হয়ে যাই। ওঁদের কারোরই তখন অত দেশ-জোড়া খ্যাতি হয়নি। সবাই তখন উদীয়মান। অনুপম ঘটক আমার বন্ধু। তার সুবাদেই আমি সেখানে একটা বাঁধা আসন পেয়েছি। তাদের মত গান গাওয়া তখন পেশা না হলেও, গান আমি লিখি। সেটাও গানের রেকর্ডের কারবারের একটা অঙ্গীভূত কাজ বিশেষ। সুতরাং সেখানে আমার পাকা আসন গায়কদের মধ্যে।

আমি সেখানে গান শুনি আর সেই গানের সুরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করি, আত্ম-অবগাহন করি। সুর যে সত্যিই ব্রহ্ম তা উপলব্ধি করি। আর সে তো ঠিক ঠিক টিকিট কেটে সঙ্গীত সম্মেলনের গান শোনা নয়, এমন কি লুঙ্গি পরে সিগারেট খেতে খেতে রেডিওর সামনে বসে রাগ-সঙ্গীত শোনাও নয়। সে একেবারে সঙ্গীতের কারবারের শরিক হওয়া! সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। রামকেলিতে কোন পর্দা লাগালে সুরের কী ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, ভৈঁরোর সঙ্গে ভৈরবীর মূলগত কী তফাৎ, দরবারি-কানাড়াতে উদারার কোমল নিখাদটাতে এসে কতখানি দাঁড়ালে সুরের কতটা মাধুর্য বাড়ে তারই নমুনা দেখে চমকে উঠি। তারপরে ছিল খেয়াল আর ঠুংরি। খেয়ালের তান-বিস্তার আর লয়কারি আর ঠুংরির তান-বিস্তারে আইন ভেঙে বে-পর্দায় পৌছে আবার বাঁধা রাস্তায় ফিরে আসার কসরৎ কায়দা দেখে মনের মধ্যে সাহিত্যের নতুন আঙ্গিকের আভাস পেতাম। মনে হতো ক্লাসিক উপন্যাস আর ঠুংরির গঠন-কৌশলের মধ্যে যেন আপাত কোন তফাৎ নেই। এ তো আমাদের সেই উপন্যাসেরই টেকনিক। দু-পা এগিয়ে গিয়ে এক-পা পেছোন। সুরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে কখনও ভেঙে পড়া, আবার তখনি উঠে দাঁড়ানো। উঠতে উঠতে আবার লুপ-লাইনে চলে গিয়ে তান-বিস্তার করে তাল-লয় ঠিক রেখে সহজ-সাবলীল গতিতে সমে এসে পড়া। ঠিক টলস্টয় যেমন আঙ্গিকে লিখেছেন তাঁর 'War And Peace,' বা রমাঁ রলাঁ লিখেছেন তাঁর "Jean christophe" অথবা ডিকেন্স লিখেছেন তাঁর "A Tale of Two Cities."

এই সময়ে দুজন বিখ্যাত ওস্তাদ এলেন কলকাতায়। একজন ঠুংরি বিশারদ ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর দ্বিতীয়জন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। আমরা সদলবলে ওস্তাদ আবদুল করিমের গান শুনতে গেলাম ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। গান গাইতে লাগলেন ওস্তাদজী। খুব মিষ্টি-মিহি গলা আবার তার আওয়াজটা 'ঝিম্'। আরম্ভের আগে একটু আলাপ করে নিলেন, তারপর গান। 'যমুনা কী তীর' (ভৈরবী) মন্দর বাজে (শুদ্ধ কল্যাণ) প্যারা নজর নেহি (বিলাবল) পিয়াকে মিলন কি আশ (যোগিয়া) এবং আরো কত কী! 'যমুনা কী তীর' গানটার কটাই বা কথা। গানটা হলো—

'যমুনা কে তীর
গোকুল ঢুঁড়ি বিনদাবন ঢুঁড়ি
কোন্ ক্যায়সে লাগে তীর'

এই হলো পুরো গানটার কথা। কিন্তু এই সামান্য তিন লাইনের গানটা নিয়ে তবলায় আট মাত্রা যৎ-এর ঠেকার সঙ্গে তাল রেখে তিনি কী অলৌকিক কাণ্ডটাই না করলেন সেদিন। তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর সে কী কসরৎ। একই কথা হাজার বার উচ্চারণ করা, একই পর্দায় বার-বার ঘুরে আসা, কথাগুলো দুমড়ে মুচড়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ভৈরবী রাগের সমস্ত রসটুকু নিঙড়ে নিঃশেষ করে আমাদের সকলকে এক শাশ্বত ধ্রুবের দিকে এক বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে গেলেন। আর আমরা সেই ধ্রুবের সেই বৈরাগ্যের স্পর্শ পেয়ে পরিশুদ্ধ হলাম পবিত্র হলাম। গান গাইতে লাগলেন ওস্তাদজী আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে লাগলাম। মনে হলো এ গান নয়, এ যেন কোনও এপিক উপন্যাস পড়ছি। পড়তে পড়তে মুহূর্ত, দিন, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে। হাজার, দু'হাজার, তিন হাজার পাতার বই। মনে হচ্ছে চলুক, আরো চলুক। এই ভালো লাগা যেন থেমে না যায়। মূল গল্পকে পাশ কাটিয়ে লেখক যেমন ছোট একটা চরিত্র নিয়ে অন্য প্রসঙ্গ শোনান, আবার কখন নিঃশব্দে ফিরে এসে মেশেন মূল কাহিনীর স্রোতে, খাঁ সাহেবও তেমনি একটা মূল সুরকে মুচড়ে বেঁকিয়ে পাশ কাটিয়ে তাকে কোথায় বিপথে নিয়ে চলে যান, আবার ঠিক সময় মত ফিরে আসেন মূল সুরে। একবার ভয় হয় এই বুঝি গেল গেল, এই বুঝি গোলমাল হয়ে গেল হিসেব, কিন্তু না, কী অবলীলায় সব বিপদের জাল কেটে নিরাপদে নির্বিঘ্নে এসে সমে থামেন, আর আমাদের শ্রোতাদের আসন থেকে তারিফের 'হায়' 'হায়' রব ওঠে। আমরা স্বস্তি পাই, আরাম পাই, আমরা

নিশ্চিন্তের হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আর আমাদের সবাই যখন এক মনে গান শুনছে, গান শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, আমি তখন শিখছি। গানের আঙ্গিক শিখছি না, শিখছি উপন্যাস লেখার টেকনিক। এতদিন পৃথিবীর বড বড এপিক উপন্যাস পড়েই এসেছি। রুদ্ধশ্বাস গতিতে হাজার-হাজার পাতার বই দিনের পর দিন রাতের পর রাত গল্পের জালে জড়িয়ে গিয়ে হাবুডুবু খেয়েছি। যখন সে-সব বই শেষ হয়েছে ভেবেছি যেন সে বই আবো বডো হলে ভালো হতো। কিন্তু তখন সেই সব বড বড লেখকদের গল্প বলার কৌশলের দিকে নজর পডেনি, পাঠককে মুগ্ধ করার জাদুটা কোথায় তা আবিষ্কারের চেষ্টা করার দিকে মন যায়নি। এবার মন গেল সেদিকে। এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিক্ষার্থীর মত করে গান শুনে বুঝতে পারলাম কোথায় সেই জাদু; কোথায় সেই রহস্য। বুঝতে পারলাম গ্রহণ আর বর্জনের সমন্বয়ই সব শিল্পের মূল কথা। তা সে গানই হোক আর সাহিত্যই হোক। মূল কথাটা হলো কোন্‌টা কত-খানি কখন বলতে হবে আর কোন্‌টা কতখানি কখন বলতে হবে না। এই বলা আর না-বলার ওজনটা যদি ঠিক থাকে তাহলে যে-কোনও কাহিনী যত লম্বা করেই বলি না কেন তা পাঠকদের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে। তাহলেই পাঠককে আমি তার কাজ ভোলাতে পারবো, তাকে ট্রেন ফেল করাবো, তার ক্ষিধে, ঘুম, রোগযন্ত্রণা সব কিছু দূব করবো। আর সেই ফাঁকে আমি তাকে ইন্দ্রিয়-জগতের উর্ধ্বে উঠিযে অতীন্দ্রিয়-লোকে পৌছে দিতে পারবো। আমি অন্যের লেখা উপন্যাস পডে যে অমৃত-অনুভূতি পেয়েছি তাকেও আমি সেই অনুভূতির অপার্থিব আস্বাদ দিতে পারবো!

কথাগুলো যত সহজ করে সংক্ষেপে বললাম, জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে তখন অত সহজ ছিল না। আর আজ এতদিনেও যে ঠিক-ঠিক জিনিসটা বুঝেছি তাও বলতে পারবো না। কারণ এ তো গাণিতিক সত্য নয়, রসের সত্য। রসের সত্যকে কখনও ছক-বাঁধা পথের দুই সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। রাখলে তা আর তখন রস থাকে না, তা তখন গণিতে পরিণত হয়।

তা ওস্তাদজীর গানের রেশ নিয়ে যখন সুরের সমুদ্রে পূর্ণ অবগাহন করছি ঠিক সেই একই সময়ে কলকাতায় এসে হাজির হলেন আর এক ওস্তাদজী। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে তাঁর গান রেকর্ড করা হলো। সেই সূত্রে সকলের অনুরোধে তিনি তাঁর গান শোনালেন একদিন "ঝন ঝন ঝন ঝন পায়েল বাজে" (নট বেহাগ)। এ আবার অন্যরকম। আবদুল

করিম খাঁ সাহেবের মত মিহি মিষ্টি 'ঝিম' গলা নয়, উদাত্ত, গম্ভীর, জোয়ারিদার কণ্ঠ। বাঙলা ভাষায় বাজখাঁই শব্দটা ব্যবহার করলে নিন্দেসূচক শোনালেও সেই বাজখাঁই গলার আওয়াজও কেন যে কর্কশ শোনালো না তাই আশ্চর্য। তার একমাত্র কারণ ওস্তাদজীর গলার অসাধারণ জোয়ারি। এই জোয়ারির জন্যেই অত মিষ্টি লাগলো তাঁর আলাপচারি। বিশেষ করে তাঁর বোল্‌-তানের ছন্দ-ভাগ। এরও একটা অন্য ধরনের সৌন্দর্য আছে। অনেকটা সুবোধ ঘোষের 'ভারত-প্রেম-কথা'র ভাষা-গাম্ভীর্য। কর্কশ হয়েও জোয়ারিদার। তবে বিশেষ করে মনে পড়তে লাগলো রাশিয়ার অ্যালেক্সি টলস্টয়ের 'ফ্রেড্‌রিক দ্য গ্রেট' উপন্যাসের ভাষার সাদৃশ্যের কথা। বিষয়বস্তুর সঙ্গে বহিরঙ্গের যে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার সেইটেই ফৈয়াজ খাঁ সাহেব যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আর আজকে এখানে অকপটভাবে স্বীকারোক্তি করতে গৌরব বোধ করছি যে সেদিন সেই দুই ওস্তাদজীর গান শুনতে শুনতে দুজনকেই আমি আমার সাহিত্য-জীবনের গুরু বলে মনে মনে বরণ করে নিলাম। তাঁদের কাছেই আমি সাহিত্যের নাড়া বাঁধলাম। আজ কিছু কিছু অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক আমার লেখার মধ্যে repetition বা পৌনঃপুনিকতা এবং পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গল্প বলার যে-অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করেন এ বিদ্যার কারুকার্য ও ব্যাকরণ অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি তাঁদের কাছ থেকেই আয়ত্ত করবার তালিম নিয়েছি। মানুষের জীবন যেমন সোজা পথে চলতে অস্বীকার করে, ভারতীয় রাগসঙ্গীত এবং এপিক উপন্যাসও ঠিক তাই। জীবন-ক্ষেত্র তো সমতল-ভূমি নয়, চড়াই-উৎরাইয়ে চলা-ফেরার নিয়মে সে বিচরণ করে বলেই তাকে পরিক্রমা করতে হয় ঘুর-পথে। অনেক সময় ঘুর-পথ ঘুরে এসে আবার শুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে তার ভুল ভাঙে। তখন আবার সামনে এগিয়ে গিয়ে পরের পর্দায় দাঁড়িয়ে সে খানিকটা জিরিয়ে নেয়। কিন্তু এই চলার পথে একটা কথা শিল্পীকে সব সময়ে মনে রাখতে হয় যে তার গন্তব্য-বিন্দুতে পৌঁছোবার দিকেই যেন তার লক্ষ্য স্থির থাকে। অবশ্য শিল্পীকে নিজেই অত্যন্ত জটিল বিপদ-জাল সৃষ্টি করতে হবে আবার তাকে নিজেকেই বিপদ-জাল কাটবার মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু এই বিপদের সৃষ্টি এবং সংহারের সমন্বয় যত সুষ্ঠু এবং ওজন যত নিখুঁত হবে ততই শিল্পীর কদর, ততই শিল্পীর সাফল্য। কিন্তু এই সব কিছুর ওপরেও হলো সম বা ক্লাইমেক্স। আর সে এমন এক ক্লাইমেক্স যার ইঙ্গিত থাকবে

ধ্রুবের সেই দিকে, বৈরাগ্যের দিকে, যা চিত্তকে বিশুদ্ধ করবে, প্রাণকে করবে পবিত্র।

প্রথম জীবনে এপিক উপন্যাস পড়েছিলাম, কিন্তু পড়লেই তো তার মানে বোঝা যায় না। মানে বোঝা গেল এই দুই ওস্তাদজীর গান শুনে। বলতে গেলে তাঁরাই প্রথম আমার চোখ খুলে দিলেন।

কিন্তু এ-সব জেনেও রাতারাতি আমার কিছু নগদ লাভ হলো না। এ তো শুধু টেকনিক বা আঙ্গিক। কলা-কৌশল। কিন্তু বিষয়-বস্তু কোথায় পাই? অর্থাৎ কী নিয়ে লিখবো?

নিঃসঙ্গতার অনেক পীড়ন আছে। একা-একা থাকবার যন্ত্রণা তারাই বোঝে যারা একা একা থাকে। অসংখ্য সঙ্গীর দ্বারা পরিবৃত থেকেও যে এক ধরনের একাকিত্ব বা এক ধরনের নিঃসঙ্গতা তা আমাকে মাঝে-মাঝে বিকল করে দিত। কিন্তু সব জিনিসেরই যেমন একটা উপকারিতা আছে, নিঃসঙ্গতারও তেমনি একটা ভালো দিক আছে। সেটা হচ্ছে এই যে নিঃসঙ্গতা মানুষকে ভাবায় বা ডিসটার্ব করে। চারপাশের পৃথিবী তাকে খুশী করে না। সে এর সংস্কার চায়, সে এর পরিবর্তন চায়। এই সংসারকে সে নতুন চেহারায় দেখতে চায়। যে মানুষগুলো তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে তাদের দোষ-ত্রুটি তার নজরে পড়ে। মনে হয় এরা যেন অন্য রকম হলে ভালো হতো। সে ভাবে কিসে মানুষ সুখী হয়, কিসে মানুষের সমাজ, মানুষের রাষ্ট্র, প্রত্যেকটি মানুষের চরিত্র আরো সুশৃঙ্খল হয়। যদি তার নিজের ইচ্ছেমত মানুষ বা সমাজ বা রাষ্ট্র না থাকে তখন সে বিদ্রোহ করে নয়তো সে আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

আমার কিন্তু তখন বিদ্রোহ করবার ক্ষমতা ছিল না। তাই আমার স্বভাব আমাকে আরো নিঃসঙ্গ করে তুললো। একটা মনোমত বিষয়বস্তুও পাইনে যে তাই নিয়ে একাগ্র চিন্তা করি। বিষয়বস্তুর সন্ধানে সারা কলকাতা তোলপাড় করে বেড়াই। বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ পড়বার সময় একদিন হঠাৎ নাটকীয়-ভাবে একজন ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। আমার চেয়ে এক ক্লাশ ওপরের ছাত্র সে। শঙ্কর ঘোষ লেনের মুখে বাস থেকে নেমেই মুখোমুখি হওয়া।

সামনে এসে ছাত্রটি বললে—আজকে একবার আমাদের বাড়ি আসবেন?

আমি তো অবাক। মুগার একটা পাট-ভাঙা সোনালী সার্ট, মিনে করা হীরের বোতাম। জরিপাড় চুনোট করা ধুতি। পায়ে হরিণের চামড়ার পাম্পসু। আর বেশ থলথলে মোটা শরীর, তার ওপর দুধে-আলতায় মেশানো

গায়ের রং। অর্থাৎ আমার পরিচিত জগতের মানুষগুলো থেকে একেবারে আলাদা।

বললাম—আপনাদের বাড়ি কোথায়?

সে বললে—এই পাশেই, তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। আমি ফোর্থ-ইয়ারে পড়ি। আমার নাম সতু। সতু লাহা—

আসলে সতুর পুরো নাম ছিল সতীন্দ্রনাথ। ঠিক বিদ্যাসাগর কলেজের পেছনের লাল বাড়িটায় থাকতো। আমাকে সেদিন তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার ইচ্ছের পেছনে একটা ঘটনা ছিল। সেই ঘটনাটা এখানে বলা দরকার। বলা দরকার এই জন্যে যে আমার ভাবী লেখক-জীবনের এবং আমার সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে এই বাড়িটার একটা অত্যন্ত নিবিড় যোগসূত্র আছে। আগের দিন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম কী একটা বিভাগে। তার সঙ্গে একটা সোনার মেডেলের প্রতিশ্রুতি ছিল। তা ব্যাপারটা ছিল অনেকটা 'বন-দেশে শেয়াল রাজা'র মত। কিছু সহপাঠী যারা আমার গানের নেশার কথা জানতো, তারা ধরে-বেঁধে আমার অজ্ঞাতেই আমার নামটা প্রতিযোগীদের তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর শেষকালে যা-হয়, নাচতে নেমে ঘোমটা টানার কী দরকার বলে আমিও ভগবানের নাম করে আসরে নেমে পড়েছিলাম। বিচারক ছিল আমার বন্ধু অনিল বাগচী আর ছিলেন ওস্তাদ রামকিষেণ মিশ্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচারক ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় হলে যেমন শুধু স্বদেশীয় পুরস্কার কেন বিদেশী নোবেল-পুরস্কারও পাওয়া যায়, এ-ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিল। কিন্তু সেটা যে এমন সুদূর ফলপ্রসূ হবে তা আমি সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি। সুদূর ফলপ্রসূ এই কারণে বলছি যে আমার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তে যাওয়া, সেখানে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া এবং ওই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িটায় যাওয়া—এ সমস্ত কিছুই আমার সাহিত্য-জীবনের সোপান বললে কিছু অতিশয়োক্তি করা হবে না।

সতু লাহা এমন এক পরিবারের বংশধর যে-বংশ ছিল ব্রিটিশ শাসনের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অন্যতম পুরনো শরিক। চারিদিকে ঘেরাটোপ-ঢাকা অন্দর-মহল, চক্‌মিলান বার-বাড়িতে পুজোর দালান। গেটে ঢুকতে দরোয়ান, ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলের সমারোহ, আর তার সঙ্গে অনুপার্জিত অর্থ-কৌলিন্যের অলস কার্পণ্য মিশ্রিত বিলাস-ব্যসন। শুধু ওদের বাড়িটাই নয়।

উত্তর কলকাতার লাল-রংয়ের সমস্ত পুরোন অভিজাত বাড়িগুলোরই ওই এক ইতিহাস।

মনে আছে প্রথম দিনের আমার সেই বাড়ির ভেতর প্রবেশ শুধু যে ওদের বাড়ির ভেতরে পদক্ষেপ তাই-ই নয়, প্রাচীন ইতিহাসের রক্ষণশীল অন্দর-মহলে পদক্ষেপের মতই রোমাঞ্চকর। পুরনো ইঁটের মোটা-মোটা দেওয়াল, কাঠের সিঁড়ি। সেই কর্তাবাবুদের শুচিবায়ুগ্রস্ত-স্বভাবের চিহ্ন-সম্বলিত মার্বেল-পাথরের মেঝের পরিচ্ছন্নতা আর দোতলায় উঠে তাকিয়া ছড়ানো ফরাস সজ্জিত নাচঘর। সমস্তই যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ আমলের মুৎসুদ্দি-বেনিয়ানদের লুপ্তাবশেষ। ইতিহাসে পড়া ঐশ্বর্যের কল্প-প্রতিমা। আর আমি তখন বিদ্যাসাগর কলেজের থার্ড-ইয়ারের একজন অখ্যাত মধ্যবিত্ত ছাত্রই কেবল নয়, বিংশ-শতাব্দীর অনুসন্ধানী গবেষকও বটে। সেখানে ঢুকে আমার প্রথম যে প্রশ্নটা মাথায় উদয় হলো সেটা হচ্ছে—এরা কারা? ইতিহাসের কোন্ শতাব্দীর গহ্বরে এদের মূল? আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর সঙ্গে এদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর এত তফাৎ কেন?

ঘরে ঢুকে দেখি কলেজের বাঙলার অধ্যাপক ৺পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ফরাসের ওপর বসে আছেন। আমাকে দেখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—তোমার গান শুনে কালকে আমার খুব ভালো লেগেছিল তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সতুকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। যে বিমল মিত্রের লেখাটেখা পড়ি, তুমিই কি সেই?

তারপর বললেন—তুমি আর একটা গান গাও, আবার শুনি—

আমি সবিনয়ে বললাম—আমার গান হবে না স্যার—

—কেন? পূর্ণবাবু আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। বললেন—নিশ্চয়ই হবে। অন্য সকলের গান শুনতে শুনতে কাল আমার ঘুম আসছিল, এমন সময় তোমার গান শুরু হতেই আমি জেগে উঠলুম—

সতু বললে—ওর স্যার রেকর্ডে একটা গান আছে—

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—সে কিছু না স্যার, সে রেকর্ড মোটে বিক্রিই হয়নি।

পূর্ণবাবু বললেন—তাতে কী হয়েছে, এখন তোমার বয়েস কম, এখনই এত হতাশ হচ্ছো কেন?

বয়েসের স্বল্পতার সঙ্গে যে যোগ্যতার কোনও সম্পর্ক নেই এ-কথা এখনও

যেমন কেউ বুঝতে চায় না, তখনও তেমনি কেউ বুঝতে চাইত না। মনে আছে 'প্রবাসী' পত্রিকার অফিসে যখন গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে দাঁড়াতাম তখন তিনিও বিশ্বাস করতেন না। প্রত্যেকবারই ভুল করতেন। জিজ্ঞেস করতেন—কার লেখা? তোমার দাদার?

তারপর যখন শুনতেন আমি নিজেই প্রকাশিত লেখার লেখক তখন গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করতেন, একটা প্যাড্ টেনে নিয়ে তাতে গল্পের নাম, পাতার সংখ্যা লিখে নিজের নাম সই করে দিতেন। আমি সেইটে নিয়ে একতলায় কেদার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যেতাম। তিনি সেটা দেখেই আমাকে টাকা দিয়ে দিতেন। দক্ষিণার রেট ছিল পৃষ্ঠা-প্রতি তিন টাকা। প্রকাশিত প্রত্যেক রচনার জন্যে দক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম বোধহয় প্রথম সূত্রপাত করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আর গল্প মনোনীত করতেন তাঁর দুই কন্যা সীতা দেবী এবং শান্তা দেবী। সেই কারণেই মনোনয়নের ব্যাপারে 'প্রবাসী'তে কোনও রাজনীতি বা দলনীতি বা কোনও রকম দুর্নীতিই প্রশ্রয় পাবার অবকাশ ঘটতো না।

একদিকে এই লেখা আর অন্য দিকে অক্রুর দত্ত লেনের সঙ্গীতের আড্ডা, আর কলেজের বি-এ ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে সতু লাহাদের বাড়ির গল্প শোনা। সে ঠিক গল্প নয়তো, যেন ইতিহাস-পরিক্রমা। মোগল আমল অতিক্রম করে পশ্চিম থেকে যন্ত্রযুগের বাণিজ্য-বিধাতা তখন ভারতবর্ষের মসনদে বসে শাসন কার্য শুরু করেছে। এখান থেকে তাদের কাঁচা মাল চাই। সেই কাঁচা মাল কিনে পাঠাতে হবে ম্যানচেস্টারে, বার্মিংহামে বা ডানকার্কে। পাঠাতে হবে নীল, সোরা, পাট, তিসি, তামাক, তুলো আর আরো অনেক কিছু। সেই সব কাঁচা মাল দিয়ে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস তৈরি হবে। তারপর তা আবার আফ্রিকা-এশিয়ার বাজারে ভোগ্য-পণ্য হিসেবে চড়া দামে বিক্রি করে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্যে এজেন্ট চাই, দালাল চাই। কিন্তু দালালি করবে কে? তখন এল এই শীল, শেঠ, মল্লিক, লাহা বংশের পূর্ব-পুরুষরা। রাতারাতি দালালির মোটা কমিশনে তারা ফুলে-ফেঁপে স্ফীতকায় হয়ে উঠলো। অর্থ কৌলিন্যের মুকুট পরে সমাজের মাথায় উঠে বসলো। আর ওই যে দেখছো আমাদের এই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ির উল্টোদিকে গোল-গোল থামওয়ালা বাড়িটা, ওইটে হলো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির। সতুর কথা শুনে মনে হতো দুদিকের দুটো বাড়ি যেন একই সঙ্গে গজিয়ে উঠেছে—

একটা ব্রিটিশ-সামন্ত যুগের শোষণ-শাসনের পাকা-পোক্ত ভিত্‌, আর একটা ঠিক বিপরীত, সামন্ততন্ত্রের মূলের ওপর প্রথম বিদ্রোহ, প্রথম বজ্রাঘাত রামমোহন রায়ের প্রতীক। যিশুখ্রীষ্ট নিজে যেমন খ্রীষ্টান ছিলেন না কিন্তু ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের উৎস, রামমোহন রায়ও তেমনি নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। সংস্কার-মুক্তির প্রথম উপাসক।

এই একই কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের রাস্তার মুখোমুখি দুটো বিপরীত-ধর্মী বাড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের একজন তুচ্ছ মধ্যবিত্ত ছাত্রের মনে অন্য এক যুগের প্রতিধ্বনি তুলতো। সে ছাত্রটি আর কেউ নয়—সে আমি। যে-আমি উনিশ বছর পরে "ভূতনাথ" হয়ে জন্ম নিয়েছিল।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

শিল্পীর জীবনে একটা সময় আসে যখন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে যন্ত্রণাটা আর তখন যন্ত্রণা থাকে না। যন্ত্রণার প্রলেপ পড়ে পড়ে তার অনুভূতি-শক্তিটা ভোঁতা হয়ে যায়। কিম্বা যন্ত্রণার উর্ধ্বে উঠে সেটা অন্য আর এক রূপ গ্রহণ করে। তার নাম আনন্দ। অনুভূতির জগতেও একটা স্তর থাকে যেখানে পৌঁছলে চরম যন্ত্রণা এবং চরম আনন্দ একই রূপ পরিগ্রহ করে। তখন আর দু'টোর মধ্যে কোনও তফাৎ থাকে না। যন্ত্রণা থেকে যন্ত্রণার উর্ধ্বে ওঠবার এই যে প্রক্রিয়া, উনিশ বছর সময়ের পরিধি এই প্রক্রিয়ার পক্ষে এমন কিছুই দীর্ঘ নয়। কিন্তু আমার পক্ষে তা যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। যন্ত্রণার নয়, সে আনন্দের অসহনীয়তা। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছ থেকে আঙ্গিকের মোটামুটি একটা কাঠামো আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তারপর বিষয়বস্তুরও একটা পটভূমিকা পাওয়া গিয়েছিল তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের আবহাওয়া থেকে। কিন্তু লিখতে গিয়ে ভয় করতে লাগলো। মনে হলো যেন আরো কিছু মালমশলার অভাব হচ্ছে, আরো কিছু কাঠ-খড়। সেই ব্রিটিশ-আমলে রাস্তায়-বাড়িতে কী আলো জ্বলতো, ট্রাম-বাসের বদলে যান-বাহন কী-রকম ছিল। এই সব। 'আনন্দবাজারে'র মন্মথ সান্যাল মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন—রাসসুন্দরী দাসীর লেখা 'আমার জীবন', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পড়ুন। কিম্বা প্রমথনাথ মল্লিকের 'কলিকাতার কথা' পড়ুন—তিনি আরো অনেক বইএর নাম বললেন।

যখন এইরকম ছটফট করে মরি তখন সন্ধ্যেবেলা অক্রুর দত্ত লেনের আড্ডায়

এসে বসি। অনুপম ঘটক আর প্রফুল্ল মিত্রকে নিয়ে রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত কার্জন পার্কের ঘাসের ওপর আজে-বাজে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিই। প্রফুল্ল মিত্র খুব রসিক মানুষ। হিন্দুস্থানের সমস্ত স্টুডিওটা প্রফুল্ল বলতে অজ্ঞান। এদিকে নিজে ভালো মুভি-ক্যামেরাম্যান, আবার চণ্ডীবাবুর রেফ্রিজারেটার খারাপ হয়ে গেলে তাও সারিয়ে দেয়। আবার কখনও পিয়ানো নিয়ে বসে পড়ে, আবার 'নূপুর বেজে যায় রিনি ঝিনি' গান রেকর্ড করে। রেকর্ড করে 'বন্ধু হে চলো চলো—'

একদিন আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছি। তখন শেষ রাত, আড্ডা দিতে দিতে কখন রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ভোর পাঁচটা। আমিও বাড়ি ঢুকছি, আর ওদিকে বাবাও প্রাতঃভ্রমণের পোশাক পরে বেড়াতে বেরোচ্ছেন। মুখোমুখি আমাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এখন ফিরছো নাকি?

শুধু বললাম—হ্যাঁ—

বলে মাথা নিচু করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। পেছনে বাবার বলা দ্বিতীয় প্রশ্নটাও কানে এল—এত রাত্তির পর্যন্ত কোথায় থাকো?

এ-প্রশ্নের আর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেলাম। কিন্তু ঘুম আসে না। আমি জানতুম আমার জন্যে বারান্দার টেবিলে একটা থালায় খানকয়েক রুটি, একটু তরকারি আর মাছ, আর তার সঙ্গে এক বাটি দুধ বেড়ালে খাওয়ার ভয়ে ভারি ঢাকনা দিয়ে ঢাকা আছে। আস্তে আস্তে সেগুলো পাশের প্রতিবেশীর বাড়ির একতলার খোলা ছাদে ছুঁড়ে ফেলে দিই। তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে খাটের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিই। আমি জানি ওই খাবারগুলো মানুষের নিদ্রাভঙ্গের আগে অন্ধকার একটু পাতলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাক এসে সব নিশ্চিহ্ন করে দেবে, আর সংসারের মানুষ ভাববে আমি পেট ভরে সব খেয়েছি। খেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছি।

এই রকম প্রায় প্রতিদিন। আজ যদি আমায় কেউ জিজ্ঞেস করে—একরকম আচরণ কেন করতে তুমি? স্বাভাবিক হতে পারতে না কেন? আর পাঁচজন মানুষ যেমন করে সংসারে আচার-আচরণ করে তেমনি সহজ-সাবলীল হতে পারতে না কেন? তাহলে এর জবাবে সেদিন কী বলতাম জানি না, আজ বলতে পারি এর একমাত্র কারণ ওই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িটা

আর তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা ওই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটা। ওই সংস্কার আর সংস্কার-মুক্তির প্রতীকটা। ওই দুটোই আমাকে কেবল বিকল করে দিত। ওই বাড়ি দুটো আজ এতদিন পরে হয়ত আর সে-রকম নেই। হয়ত তাদের বাস্তব রূপটা আমূল বদলে গিয়েছে। কিন্তু চল্লিশ বছর আগেকার সেই দেখাটা আজও আমার মনে সত্য হয়ে রয়েছে। সেই সত্য চেহারাটা সেই অল্প বয়েসের দৃষ্টিতে যেমনভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিল আজও তা মোছেনি।

যখন ধরা-বাঁধা পাঠ্য-কেতাবের মধ্যে আমার মনটাকে আকৃষ্ট করে রাখা অত্যাবশ্যক অনিবার্য তখন আমি সে-সব দূরে সরিয়ে রেখে কলকাতার অগ্রজ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জিজ্ঞেস করতাম—আপনারা উপন্যাস কেমন করে লেখেন? সমস্তটুকুই কি আগে থেকে ভেবে নিয়ে লিখতে শুরু করেন?

এই ধরনের অনেক প্রশ্ন তখন আমাকে বিব্রত করতো। ছোট গল্প তো অনেক লিখেছি। অনেক বড় বড় কাগজের পৃষ্ঠায় তা ছাপাও হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস না লিখলে তো লেখক পদ-বাচ্য হওয়া যাবে না।

কিন্তু কারোর কাছেই কোনও সদুত্তর পেতাম না। কিম্বা যে-উত্তর পেতাম তা আমার মনঃপূত হতো না। অথবা পৃথিবীর কোনও মানুষের সঙ্গেই যেমন কোনও মানুষের স্বভাব-চরিত্রের মিল নেই, তেমনি একজন লেখকের লেখন-পদ্ধতির সঙ্গে আর একজন লেখকের লেখন-পদ্ধতি যে মিলবে তারও হয়ত কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই।

উদ্বেগে-চিন্তায় আমার উচ্ছৃঙ্খলতা আরো বেড়ে গেল। নিয়ম করে তখন আর কিছুই করা হয় না। বাড়িতে কিম্বা বাইরে সর্বত্র প্রতিকূল পরিবেশ। আসলে আমার নিজের অক্ষমতাই যে বাইরের জগৎকে আমার প্রতিকূল করে তুলেছিল এটা তখন আমার হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

আমার জীবনের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী তখন যিনি তিনি একদিন আমাকে ধরে কাছে বসালেন। বললেন—তুমি এবার কী করবে ভেবেছে? কোন্ লাইনে যাবে?

ছেলের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা প্রত্যেক স্নেহশীল পিতারই কাম্য। এর মধ্যে কিছু নতুনত্ব নেই। আর তখন আবার প্রাক্-যুদ্ধের আমল। পৃথিবীময় মানুষের মাথায় বেকারত্বের অভিশাপ। কিন্তু আমার পিতৃদেবের ক্ষমতা অসীম। সেই বেকারত্বের যুগেও তিনি ইচ্ছে করলেই তাঁর ছেলেকে একটা সরকারী-চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন। কারণ তিনি নিজে তখন একজন অবসর-

প্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারী। আর সরকারী চাকরির তখন এমনই এক গুণ যে সারা-জীবনের মত অমন নিশ্চিন্ত স্থায়িত্ব আর কোথাও পাবার ভরসা নেই।

বললাম—আমি এম-এ পড়বো—

বাবা বললেন—এম-এ পড়ে কী হবে? স্কুল-কলেজে মাস্টারি করবে?

আমার জবাব না পেয়ে তিনি আবার বললেন—তোমার এক দাদা ডাক্তার, আর এক দাদা ইঞ্জিনিয়ার, আমার ইচ্ছে তুমি চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট হও, ওতে অনেক টাকা—

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম—আমি অনেক টাকা চাই না—টাকা তো সবাই চায়, তার মধ্যে একজন টাকা না-ই বা চাইলো?

—টাকা চাও না? টাকা না হলে চলবে কী করে? একদিন তো বিয়ে করবে, সংসার করবে, চিরকাল তো আমিও বাঁচবো না। আমারও তো বয়েস হচ্ছে। তোমার একটা কিছু হিল্লে করতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারতাম—

হার রে মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা! যেন মানুষের সব শুভাকাঙ্ক্ষাই সফল হয়, যেন মানুষের সব ইচ্ছেই পূরণ হয়!

আমার বন্ধু সতু লাহা যখন আমার বাড়িতে আসতো তখন পিতৃদেব তাকে আড়ালে ডাকতেন। বলতেন—ও কী করবে বল তো সতু? বি-এ তো পাস করেছে, এবার তো একটা লাইনে ঢোকা উচিত। চাকরিতে আমি ওকে এখুনি ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে তো অল্প মাইনে। ও তোমাদের কিছু বলে? আমার সঙ্গে তো কথাই বলে না—

সতু বলতো—এখন তো ও পড়ছে, পড়ুক না—

বাবা বলতেন—দেখ, আমি চাই ও বিলেত যাক, সেখানে গিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সিটা পড়ে আসুক, শেষকালে ও আমাকেই দোষ দেবে, বলবে ওর দাদাদের লেখা-পড়ার জন্যে কত টাকা খরচ করেছি, ওর জন্যে কিছুই করিনি—

সতু বাবার কথাগুলো আমাকে এসে বলতো। দুজনেই হাসাহাসি করতাম। বৃদ্ধদের কথা শুনে অল্প বয়েসের আমাদের হাসাহাসি করাই তো নিয়ম। এখন হলে অবশ্য আলাদা। এখন যদি তেমনি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পেতাম, যে আমার জন্যে ভাববে, যে আমার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করবে, এমন একজন মানুষ যে আমার দুর্ভাবনার শরিক হবে! আমার যাত্রা-পথের সমস্ত বাধা দূর করে

তা নিষ্কণ্টক করবে। কিন্তু এখন আমার এ ইচ্ছা-পূরণের আর কোনও উপায় নেই, ইচ্ছাপূরণের যিনি মালিক আমার বেলায় তাঁর ভাঁড়ারের সমস্ত উপহার এখন বাড়ন্ত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এখন আমি একেবারেই নিঃস্ব, নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল।

তাই মনে আছে পিতৃদেবের ইচ্ছে পূরণ করবার জন্যে শেষ পর্যন্ত নিজের *ইচ্ছের বিরুদ্ধে একদিন ভর্তি হলাম গিয়ে অ্যাকাউনটেন্সির ক্লাশে। বাংলা* করলে বিদ্যেটার নাম দাঁড়ায় হিসেব-নিকেশি বিদ্যে। কীসের হিসেব? না, টাকা-আনা-পয়সার হিসেব। পাপ-পুণ্যের হিসেব নয়, ভালো-মন্দের হিসেব নয়, সত্যি-মিথ্যের হিসেব নয়, কেবল টাকা-আনা-পয়সার হিসেব। সাহিত্যের রসেরও একটা হিসেব আছে অবশ্য। তেমনি সঙ্গীতের রসেরও হিসেব আছে। সঙ্গীতে সুরের যেমন একটা হিসেব আছে, তালের হিসেব তার চেয়ে কিছু কম শক্ত নয়। তিন তাল এক ফাঁক ছাড়া গান গাইতে গাইতে তালের মাত্রার দিকেও গায়ককে নজর রাখতে হয়। 'সম্' যদি দ্বিতীয় তালে না পড়ে অন্য কোনও জায়গায় পড়ে তাহলে গায়কের বেতালা বলে বদনাম হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সামান্য ধারাবাহিক উপন্যাস সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়ও শিল্পীকে একটা অসাধারণ হিসেব কষতে হয়; এমন একটা জায়গায় এসে 'ক্রমশঃ' বসাতে হয় যাতে পাঠকের কৌতূহলের থার্মোমিটারে পারদের দাগটা উঁচু ডিগ্রীতে গিয়ে ঠেকে, আর এমন ডিগ্রীতে গিয়ে ঠেকে যে পরের সংখ্যা হাতে পাবার জন্যে পাঠক যেন ছট্-ফট করে মরে। দক্ষিণ-কলকাতায় এমন দু একটি দক্ষিণ-ভারতীয় পরিবার জানি যারা কেরলের পত্রিকার গ্রাহক। যেদিন ডাকের গোলযোগে পত্রিকা হাতে এসে পৌছতে দেরি হয় সেদিন তাঁদের বাড়িতে প্রস্তুত খাদ্য তাঁদের জিভে বিস্বাদ লাগে। কাজে মন বসে না। এও হিসেব। রসের হিসেব। এ-হিসেব শিখতেও শিল্পীর পক্ষে বহু সাধনার প্রয়োজন অনিবার্য হয়। কিন্তু টাকা-আনা-পয়সার হিসেবটা বড় গোলমেলে। ওটা আমার পরিপাক-শক্তির প্রতিকূল। রসের হিসেবের খানিকটা তালিম নিয়েছিলাম আমার গুরু দুই ওস্তাদজীর কাছ থেকে। কিন্তু এ-হিসেবের বিদ্যে আমার মাথায় ঢুকলো না। প্রতিদিন ক্লাশে যাই। প্রথমেই যে-হিসেব নিয়ে তালিম শুরু হলো তার নাম 'ব্যালান্স-শীট' বা 'ডেবিট অ্যাণ্ড ক্রেডিট'। ইংরেজী কথাটা বহুশ্রুত। অনেকেই সারা দিনের কাজ-কারবারের পর ডেবিট-ক্রেডিট করে ব্যালেন্স-শীট তৈরি না-করা পর্যন্ত শুতে যাবার সুযোগ পান না। তা ছাড়াও

আছে জীবনের ডেবিট-ক্রেডিট। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন 'কী পাইনি তার হিসেব মেলাতে মন মোর নহে রাজী।' যাঁরা হিসেব করে বাঁচেন এবং হিসেব করে আচার-আচরণ করেন তাঁরাই সংসারে বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে প্রশংসিত হন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত জীবনে একমাত্র সাহিত্য ছাড়া কখনও হিসেব করে কিছু করেছি বলে মনে পড়ে না। কার সঙ্গে মিশবো, কার সামনে কী কথা বলবো আর কতটুকু বলবো, কোন্ সমাজে কী পোশাক-পরিচ্ছদ পরবো বা কী-রকম আচরণ করলে আমার কার্যসিদ্ধি হবে সে-সব হিসেব করাকে আমি স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করে এসেছি। অথচ পিতৃদেবের ইচ্ছে-পূরণের জন্যে সেই হিসেব-নিকেশি বিদ্যেই আমাকে করায়ত্ত করতে হবে। সে যে কী আত্মগ্লানি, কী আত্ম-অনুশোচনা তা আমাকে যারা চেনে তারাই বুঝতে পারবে। রামপ্রসাদ প্রথম-জীবনে ছিলেন জমিদারী-সেরেস্তার একজন সামান্য হিসেব-নবীস মাত্র। কিন্তু তিনি মহাপুরুষ ছিলেন বলেই হিসেবের খাতার মধ্যেই মায়ের নাম লিখে মুক্তি পেয়েছিলেন। আর আমি? আমি রামপ্রসাদ তো নই-ই, এমনকি মায়ের নামও আবার আমার পোড়া-মুখে তেমন করে আসে না। কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। অথচ ছ মাসের আগাম মাইনে দেওয়া হয়ে গেছে। আমার সহপাঠীরা যখন হিসেব-নিকেশের গণিতের কূট-তর্কে বিভোর আমি তখন হঠাৎ একদিন ক্লাশে যাওয়া বন্ধ রেখে সকলের অজ্ঞাতে সোজা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে নিন্দিত এবং সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় 'বাঙলা'-বিভাগের দফতরে গিয়ে হাজির হলাম।

বিভাগের করণিক বললেন—এখন তো আর ভর্তি করা হবে না, তারিখ পেরিয়ে গেছে—

অনেক অনুনয়-বিনয় আর অনেক পীড়াপীড়ির পরে বললেন—আপনি যদি সেক্রেটারির বিশেষ অনুমতি আনতে পারেন তবে ভর্তি করা যেতে পারে—

তখন যতদূর মনে পড়ে সেক্রেটারি ছিলেন শৈলেন মিত্র মহাশয়। বিশেষ অনুমতি আনতে বেগ পেতে হলো না। আজকালকার মত সে-যুগে এত ভিড়ও ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুতরাং পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীর হাজরে খাতায় আমার নাম উঠলো। নাম উঠলো সকলের শেষে। এবং আমারটাই হলো সকলের শেষ রোল-নম্বর।

স্কুলের একেবারে প্রথম শ্রেণীতে যা হয়েছিল, আশুতোষ কলেজে আই-এ

পড়বার সময় যা হয়েছিল, বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ ক্লাশে যা হয়েছিল, এমন কি জীবনের এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এখন যা হয়েছে, সেই এম-এ ক্লাশে গিয়েও তাই-ই ঘটলো। আমার ঠাঁই হলো একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে।

বাড়িতে এই দুর্ঘটনায় প্রায় কান্নার রোল ওঠবার মত অবস্থা হলো। আমাদের বংশে এত বড় সর্বনাশ আর কখনও ঘটেছে বলে কেউ মনে করতে পারলে না। পরবর্তীকালে যাকে একদিন সমস্ত মানুষের কাছ থেকে বৃহত্তর আকারের কুৎসা-কলঙ্ক-অবহেলা-প্রত্যাখ্যান-অপ্রশংসার পসরা মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে সেই তখন থেকেই বুঝি তার সহ্য-শক্তির হাতেখড়ি শুরু হলো। সংসারে সহ্যশক্তিই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন শক্তি। ওই শক্তি যে আয়ত্ত করতে পারবে না সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হবার কোনও অধিকার তার নেই। আমি তখন থেকেই ধরে নিয়েছিলাম যে আমার জন্যে আরাম বলে কোনও বস্তু আমার সৃষ্টিকর্তা তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখেন নি। আর শুধু আরামই নয়। শান্তি, স্নেহ, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি প্রভৃতি অভিধানের শব্দগুলো আমার মত অপদার্থের জন্যে সৃষ্টিও হয়নি। বলতে গেলে আমার জন্যে কোনও দল নেই, আমি নিঃসঙ্গ পদাতিক, আমার সুখ-দুঃখের দোসর হবার কেউ কোনওদিন থাকবে না—কেবল এই শর্তেই একটা নির্ধারিত অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে জীবন-ধারণ এবং জীবন-ধারণের জন্যে কঠোর সংগ্রাম করে যেতে হবে। ধরেই নিয়েছিলাম এই নিঃসঙ্গ যাত্রাই আমার বিধিলিপি।

কিন্তু ভবিষ্যৎ যেমন কারোর পক্ষেই দৃষ্টিগোচর হবার নয়, তেমনি আমারও ভবিষ্যৎ আমার দৃষ্টিগোচর ছিল না। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দেখে যদি ভবিষ্যতের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভবপর হয় তো তা ছিল আমার মুক্তির পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। শুধু নিয়ম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগুলোতে কোনও রকমে উপস্থিতি বজায় রাখি। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই হাজরে খাতায় আমার উপস্থিতি নথিবদ্ধ হয় না। কারণ রোল-কল্ হবার অনেক পরে আমি ক্লাশে গিয়ে হাজির হই। তখন নাম-ডাকা শেষ হয়ে গেছে। ক্লাশ রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি যথারীতি প্রতিদিন বাইরে থেকে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিই। কোনও ছাত্র বা ছাত্রী হয়ত দয়া-পরবশ বা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেয়। মনোযোগী ছাত্ররা আমার ওপর বিরক্ত হয়। দেরিতে এসে তাদের পড়াশুনোয় আমি ব্যাঘাত ঘটিয়েছি—আমার এ অপরাধ তাদের কাছে ক্ষমার

অযোগ্য। তারা সবাই আমার দিকে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে চায়। আমি কুণ্ঠিত-চিত্তে সকলের শেষের বেঞ্চিতে বসে আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ পরিপাক করবার ব্যর্থ প্রয়াস করি।

দু'বছর এমনি চলার পর যখন পরীক্ষা দেবার সময় আসে তখন পরীক্ষার ফিস্ বাবদ টাকা জমা দিতে গিয়ে শুনি আমার পরীক্ষা দেবার অধিকার নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি তো রেগুলার ক্লাশে আসেন নি, আমাদের নিয়ম সেভেন্টি পারসেণ্ট অন্তত ক্লাশে হাজির থাকা চাই, আপনার মাত্র ফর্টি ওয়ান পার্সেণ্ট অ্যাটেনডেন্স, এটা ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির রেকর্ড, এর আগে এত কম অ্যাটেনডেন্স আর কারো হয়নি আমাদের ইউনিভারসিটিতে—

জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কী হবে? আমি কী এগজামিন দিতে পারবো না?

ভদ্রলোক বললেন—পারবেন, যদি ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি আনতে পারেন—

সহজভাবে কিছুই যখন আমার জীবনে হয় না তখন সহজভাবে পরীক্ষা দিয়ে সহজে পাস করাটাই বা আমার জীবনে সহজ হবে কেন? আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় বোধ হয় কপালে রক্তাক্ষরে এ-কথাটা লিখে দিয়েছিলেন যে এ-মানুষটা রক্তপাত করে জন্মের সব ঋণ শোধ করতে চাইলেও এর সব রক্তপাত ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হবে—Francis Bacon বলে গেছেন: "If a man will begin with certainties he shall end in doubts. But if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties." আমার বেলায় কিন্তু এই কথাগুলোও সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে গেছে। নিরর্থক এই অর্থে যে আমি তো আমার আরম্ভও দেখেছি, এখন আবার শেষও দেখছি। শুরুতে আমার যে সংগ্রাম ছিল, জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে এসেও সেই একই সংগ্রাম আমার অব্যাহত রয়েছে। অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম, অশুভ-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম। আবার আশ্চর্য সেই অন্যায় আমার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে, সেই অশুভশক্তি আমার প্রতিদিনের আচার-আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। আমার মধ্যেকার সেই অলস-প্রকৃতি কেবল আপোস করতে বলে, সে কেবল সংগ্রামকে এড়িয়ে চলতে বলে, সে কেবল সমস্ত তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বলে। সে বড় গোপন, বড় গুহায়িত,

তাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে সে কেবল আমার আমির শত্রুতাচরণ করে। তাই আমার সংগ্রাম এত তীব্র হয়, এত কষ্টদায়ক হয়। শত্রু যদি বাইরের কেউ হতো তাহলে তার সঙ্গে হয় সমঝোতা করতাম আর নয় তো তার মোকাবেলা করতাম। কিন্তু আমার আমির সঙ্গে সংগ্রাম কি অত সহজ?

তা সেই ভদ্রলোকের নির্দেশমত একদিন গেলাম ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

জগৎ-সংসারে নানা-কারণে যারা সুবিখ্যাত এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত সাধারণত আমি তাঁদের এড়িয়ে চলি। স্বগোত্রীয় সাধারণ লোকের সঙ্গে আমি বেশ সহজ বেশ সাবলীল। রাস্তার লোক আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। তাঁদের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার মধ্যে আমি আমার নিজেকে আবিষ্কার করে আত্মীয়তা অনুভব করি। কিন্তু সেদিন সেই আর্জি নিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমার যত আপত্তি।

বিখ্যাত লোকের বৈঠকখানায় সেই-ই আমার প্রথম এবং শেষ যাওয়া। কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। শুনলাম সকাল থেকে কিছু লোকের সেখানে উপস্থিতি একটা প্রাত্যহিক নিয়ম। তাদের কী কাজ? জবাবে শুনলাম তাদের কাজ শ্যামাপ্রসাদকে প্রাতঃপ্রণাম জানানো। তিনি কেমন আছেন সেই বিনীত প্রশ্নটি তাঁকে করা। একটা নির্দিষ্ট সময়ে তেতলা থেকে দোতলার বৈঠকখানায় নামবেন শ্যামাপ্রসাদ এবং সেই সময়ে তাঁকে প্রাতঃপ্রণাম জানাবার জন্যে জন পঞ্চাশেক লোক ঘুম থেকে উঠেই সেখানে সেই সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাতঃকালীন দাঁত মাজার পবিত্র কার্যটি সমাধা করবে। তাতে রথ দেখা এবং কলা বেচা দুই কাজই একত্রে হবে।

তবু জিনিসটা বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—ওরা কারা? ওদের উদ্দেশ্য কী?

জবাবে শুনলাম—ওরা প্রবেশিকা পরীক্ষার খাতা দেখেন—পেপার-এগজামিনার—

—ম্যাট্রিকের খাতা দেখেন তো এখানে কেন? হেড্-এগ্জামিনারের বাড়ি গেলেই হয়?

—সে তো যানই, তার ওপর এখানে রোজ একবার শ্যামাপ্রসাদবাবুকে মুখটা দেখিয়ে যান, যাতে পরীক্ষকদের তালিকা থেকে পরের বছরে নামটা কাটা না যায়, বছরে পাঁচ ছ'শো টাকা আমদানি কি সোজা ব্যাপার?

পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ভেতরের ব্যাপার সম্বন্ধে সেই-ই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে সেই যে আমার ভক্তি দূর হলো তা পরবর্তী আরো অনেক অভিজ্ঞতায় একেবারে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে-সব প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তবে আমার কাজটির জন্যে সেদিন এক সেকেণ্ডও সময় লাগলো না। সামনে যেতেই একটা কাগজে তিনি সই করে দিলেন। তারপর পরীক্ষা দিলাম এবং সে-পরীক্ষায় পাস করলাম।

কিন্তু কী হবে পরীক্ষা দিয়ে এবং পাস করে? পরীক্ষকদের স্বরূপ সেদিন যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলাম এতদিন পরে সে-দৃষ্টি আরো তীর্যক হয়েছে। শুধু পরীক্ষা কেন, বিখ্যাত ব্যক্তিদের বৈঠকখানার যে-রূপ সেদিন দেখেছি, যে-তোষামোদ এবং যে নীচতা হীনতা এবং সঙ্কীর্ণতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সেদিন আমার হয়েছে, তার চেয়ে লক্ষগুণ নীচতা, হীনতা এবং সঙ্কীর্ণতা আজ দেশের সমাজের পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আজ সারা দেশটাই শ্যামাপ্রসাদের বৈঠকখানায় রূপান্তরিত হযেছে, কিন্তু কই, আমি তো তার সহস্রাংশের একাংশও আমার লেখার মধ্যে প্রকাশ করতে পারিনি! শিক্ষক সমাজের ওপর আমার যে শ্রদ্ধা তা পরবর্তীকালে আমি আমার নানা রচনার মধ্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। তার চরম প্রকাশ হয়েছে আমার 'রাজাবদল' উপন্যাসের পাতায়। এ-সবই সম্ভব হয়েছে এমন কয়েকজন শিক্ষকের জন্যে যাঁরা চেয়েছিলেন আমি এই নীচতা হীনতা আর সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারি। তাঁদের একজন হচ্ছেন আমাদের স্কুলের দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি আমার কবিতার খাতাটা নিয়ে অন্যান্য ক্লাশে অবৃত্তি করে শোনাতেন। আর একজন ছিলেন আমার বাল্যকালের গৃহশিক্ষক কালিপদ চক্রবর্তী—যিনি আমার কবিতা পড়ে আমাকে নিরুৎসাহ করার বদলে নিজের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে একখণ্ড 'গীতাঞ্জলি' কিনে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। অথচ তখন আমার বয়েস কতই বা, মাত্র বারো কি তেরো। আর একজন শিক্ষক হলেন আশুতোষ কলেজের অমলকুমার রায়চৌধুরী। তিনি মনে করতেন আমাকে উৎসাহ দিলে আমি ভবিষ্যৎ জীবনে একজন সুলেখক হতে পারবো। আর একজন ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের বাঙলার অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি প্রথম দিনেই আমাকে নিজের করে নিয়েছিলেন আপন চিত্তের উদারতা দিয়ে। একথা আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর একজনের কথা আমি আমার এক প্রবন্ধে আগেই লিখেছি—তিনি আমাদের স্কুলের হেড-মাস্টার

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সেই অল্প-বয়েসে আমার চারদিকের নিষ্ঠুর বিরূপ জগতের মধ্যে এঁরাই ছিলেন আমার একমাত্র স্নেহচ্ছায়া। এঁরা একজন ছাড়া আর সকলেই এখন বিগত। আর যিনি এখনও জীবিত এবং কর্মক্ষম, তিনি হচ্ছেন বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের বিভাগীয়-প্রধান শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

আর সকলের শেষে যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি তিনি হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন উপাচার্য এবং ৺প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী। কিন্তু এঁর কথা এখন থাক। পরে যথা-সময়ে এঁর কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবার আশঙ্কা থাকবে বলেই তাঁর কথা আমাকে যথাস্থানে বলতেই হবে।

তা এম-এ পাস করার পর ভাবলাম এবার মুক্তি। পরীক্ষা পাসের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি, নিয়মিত ক্লাশে হাজিরা দেওয়া থেকে মুক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পর যে-চিন্তা সাধারণত সব ছাত্রকে দুর্বহ করে তা হলো অর্থ-উপার্জনের দুশ্চিন্তা। তা আমার সেই বয়েসেও ছিল না। কিন্তু ছিল আত্মপ্রকাশের দুশ্চিন্তা। পরমার্থ লাভের দুশ্চিন্তা। লেখকদের জীবনে সমস্ত বাধা দূর করে আত্মপ্রকাশের বা পরমার্থ লাভের সমস্যা বোধ হয় সবচেয়ে ভয়াবহ। সে-চিন্তা অর্থ-উপার্জনের চেয়েও দুর্বহ। তখন দুর্বহ তার জীবনযাত্রা, অসহ্য তার অস্তিত্ব। অস্তিত্বের এই অসহনীয়তা আমাকে সমস্ত দিন-রাত চারদিকে ছুটিয়ে বেড়াতো তখন। সেই ছোটার তাগিদে কখনও যেতাম তের নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, কখনও অক্রূর দত্ত লেনের স্টুডিওতে আবার কখনও বা কোনও বই নিয়ে নিমগ্ন থাকতুম। সেও এক রকমের ছোটাছুটি বৈকি! ডিকেন্সের "A Tale of Two Cities" এমনি একটা বই যা পড়লে শতাব্দীর তেপান্তরে ছুটে বেড়ানো যায়। এক সহপাঠী বন্ধুর কাছ থেকে বইটা পড়তে চেয়ে নিয়ে এসে তা আর তাকে ফেরত দিইনি। মনে আছে বইটা সাত বার পর-পর পড়েছি, তারপরেও বিচ্ছিন্নভাবে যে কতবার পড়েছি তার সীমা-সংখ্যা নেই। পড়তে পড়তে ভেবেছি ফরাসী বিপ্লব নিয়ে যদি একজনের পক্ষে উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীর যুদ্ধ নিয়েই বা উপন্যাস লেখা যাবে না কেন? কার্লাইল যেমন আগেই ডিকেন্সের জন্যে ফরাসীর-বিপ্লব সম্বন্ধে বই লিখে রেখে গিয়েছিলেন পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে তেমন বই কি আছে? আর থাকলেও সে-বই পাই কোথায়? কে

আমাকে তার হদিস দেবে? বিদ্যাসাগর কলেজের ফেরতা পথে ফুটপাথের পুরোন বই-এর দোকানে ঘুরে-ঘুরে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে বই খুঁজি। ময়লা ধুলো-পড়া পোকায় কাটা বই সব। আমার দরকারের অতিরিক্তও কিছু পেয়ে যাই। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলার ইতিহাস' (নবাবী আমল), 'সহজ হেকিমী চিকিৎসা', 'জমিদারি দর্পণ', 'মজার হেঁয়ালি', 'পত্র লিখন প্রণালী', 'উর্দু-বাঙলা অভিধান', 'কলিকাতার কথা' (প্রমথনাথ মল্লিক), 'কলিকাতায় চলাফেরা' আরো কত রকম বই সব। যুদ্ধের আগে এ-সব বইএর চাহিদা তেমন ছিল না। পাঁচ টাকার বইটা চার আনায় কিনে নিতাম। যদুনাথ সরকারের 'History of Bengal' বইটা পুরোন বইএর কারবারি ইউসুফ্‌কে জোগাড় করতে বলেছিলাম, কিন্তু তা সে দিতে পারেনি। ইউসুফ্‌ পুরোন বইএর ব্যাপারে অসাধ্য-সাধনকারী। সে আমাকে কত যে দুষ্প্রাপ্য বই দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তারও তো সাধ্যের একটা সীমা আছে। পরে অবশ্য সে-বই ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

একটা এপিক উপন্যাস লিখতে গেলে যে কত কী উপকরণের দরকার হয়, এবং কেন তার দরকার হয় এখানে একটা ছোট গল্প দিয়ে তা বোঝাতে চেষ্টা করি। গল্পটা মোপাঁসার জীবনের। এই গল্পটা আমার লেখক-জীবনে বড় কাজে এসেছিল।

মোপাঁসার মায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তৎকালীন ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক 'ম্যাডাম বোভারি'র লেখক ফ্লবেয়ার। ছেলে মায়ের কাছে খুব বায়না ধরতো সে লেখক হবে। চাকরি তখন একটা করছে ছেলে, কিন্তু সামান্য চাকরি। তাতে পেট ভরলেও তার মন ভরে না।

অনেক পীড়াপীড়িব পর মা ফ্লবেয়ারের কাছে ছেলেকে নিয়ে গেলেন। বললেন—আমার ছেলের বড় লেখক হওয়ার শখ, আপনি ওকে একটু লেখা শিখিয়ে-টিখিয়ে দিন—

ফ্লবেয়ার শুনলেন আর্জি। মোপাঁসাকে দেখে বললেন—ঠিক আছে, তুমি আর একদিন সময় করে আমার কাছে এসো, আমি তোমায় গল্প লেখা শিখিয়ে দেব—

কিছুদিন পরে মোপাঁসা ফ্লবেয়ারের কথামত গেলেন তাঁর বাড়ি। ফ্লবেয়ার চিনতে পারলেন না তাঁকে। মায়ের পরিচয় দেওয়াতে সব কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তখন তাঁর কথা বলবার বেশি সময় ছিল না। সামনের টেবিলের

ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে বললেন—এইটে নাও, নিয়ে বাড়িতে গিয়ে এখানা পোড়, এইটে ভালো করে পড়ে মুখস্থ করলে তুমি ভালো গল্প লিখতে শিখবে—

মোপাঁসা আর দ্বিরুক্তি না করে বইটি নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। মাস দুই তিন পরে ফ্লবেয়ার একদিন তাঁর নিজের ঘরে বসে আছেন এমন সময় অচেনা একটি ছেলে এসে হাজির।

ফ্লবেয়ার তাকে চিনতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? কী চাও?

মোপাঁসা বললেন—আমার নাম মোপাঁসা—আমার মা'র সঙ্গে একদিন আপনার কাছে এসেছিলুম, আপনি আমাকে এই বইখানা দিয়ে বলেছিলেন এইটে মুখস্থ করলে আমি ভালো গল্প লিখতে শিখবো—

—দেখি, কী বই দিয়েছিলুম—

বলে হাত বাড়িয়ে বইখানা নিয়ে দেখলেন সেটা একটা ডিক্সনারি, অভিধান। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোনও রকমে বিদায় করতে হবে ভেবে হয়ত একটা যা-কিছু অজুহাতে ছেলেটির অনুরোধ ওইভাবে রক্ষে করেছিলেন। ছেলেটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এই বই মুখস্থ করেছ?

মোপাঁসা বললেন—হ্যাঁ, আপনি যে বলেছিলেন মুখস্থ করলে আমি ভালো গল্প লিখতে পারবো—

কথাটা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন ফ্লবেয়ার। বললেন—তুমি বোস এখানে—

মোপাঁসা বসলেন। ফ্লবেয়ার মোপাঁসাকে লক্ষ্য করে জানালার বাইরে দূরে একটা জায়গা নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন—বলো তো ওটা কী দেখছো?

মোপাঁসা ফ্লবেয়ারের নির্দিষ্ট জায়গাটা লক্ষ্য করে বললেন—ওটা একটা পাইন গাছ—

ফ্লবেয়ার বললেন—না, হলো না, আর একবার ভালো করে দেখে বলো—

মোপাঁসা বললেন—কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওটা পাইন গাছ—

ফ্লবেয়ার বললেন—না, ওটা শুধু পাইন গাছ নয়, ওর পেছনে যে একটা চিলে-কোঠা রয়েছে, তার খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরের মানুষ দেখা যাচ্ছে, চিলেকোঠার পেছনে আকাশ, আকাশের গায়ে একটুকরো শাদা মেঘ, মেঘের ওপর দিয়ে একটা চিল উড়ছে, ওই সব কিছু নিয়েই ওই পাইন গাছটা। ওগুলো বাদ দিয়ে পাইন গাছটার কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই, ও-গাছটা ওই সব কিছুর একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ—

মোপাঁসার গল্প লেখা শেখার পেছনে এই-ই হলো প্রথম হাতেখড়ি। 'মাসিক বসুমতী'র সহ-সম্পাদক সরোজনাথ ঘোষ মহাশয় আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ১৩৩৬ সালে আমাকে প্রথম এই গল্পটা বলেছিলেন। সত্যি-মিথ্যে জানি না, হয়ত এটা কিংবদন্তী, কিন্তু কথাটা সাহিত্যিক অর্থে অসত্য নয়। সঙ্গীতের পক্ষেও এটা অসত্য নয়। এ যেন সেই রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের অর্গ্যান বাজানোর মতন। দেখতাম যখন তিনি তাঁর দুই হাতের দশটা আঙুল দিয়ে অর্গ্যান বাজাতেন তার আঙুলগুলো কখনও উঁচুতে উঠতো না, রীডগুলো স্পর্শ করে করে চলতো সব সময়ে। যখন তিনি 'সা' পর্দা টিপতেন তখন অন্য আঙুলগুলো ছুঁয়ে থাকতো ওপর-নিচের গান্ধার আর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমকেও। কারণ তারাও ছিল ওই 'সা'-এর অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে কল্পনা করতে গেলেই মনে পড়ে যাবে আলিবর্দী খাঁ, ঘসেটি বেগম, চেহেল-সুতুন, ক্লাইভ, মীরজাফর সকলকে। খয়ের চুন সুপুরি ছাড়া কি পানের আলাদা কিছু অস্তিত্ব আছে? গোলাপের সঙ্গে যেমন কাঁটা। প্রতিমার সঙ্গে যেমন তার চালচিত্র। উপন্যাসের গল্পকে সত্য হতে হলে তাই চাই একটা চালচিত্র। তার পারিপার্শ্বিক উপকরণ। ওই 'পত্র লিখন প্রণালী', 'কলিকাতায় চলাফেরা, 'জমিদারি-দর্পণ', 'মজার হেঁয়ালী', 'সহজ হেকিমী চিকিৎসা' বইগুলো সেইরকম আমার উপন্যাসের অচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। তাই তখন ওই সব উপকরণ সংগ্রহ করে বাড়িতে ,নোংরা-জঞ্জালের স্তূপ সৃষ্টি করতাম। আর অবসর পেলেই ছুটে যেতাম অক্রূর দত্ত লেনের স্টুডিওতে। এক-একদিন এমন হয়েছে সন্ধ্যেবেলার দিকে পান্না ঘোষকে নিয়ে চলে গিয়েছি বালিগঞ্জের লেকে। তখনকার দিনে লেকে এত ভিড থাকতো না। অনুপম সিদ্ধির বরফ খাইয়ে দিতে সকলকে। আর তারপর শুরু হতো পান্না ঘোষের আড়বাঁশি। পান্না ঘোষের আড়বাঁশি যে না শুনেছ সে জানে না সুরের জাদু কাকে বলে। সুর যে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে পান্না ঘোষই ছিল তার প্রমাণ। সন্ধ্যেবেলা থেকে তার বাশি শুনতে শুনতে কখন যে রাত দশটা বারোটা বেজে যেত তার খেয়াল থাকতো না আমাদের। বাড়িতে ফিরতে আবার যথারীতি সেই মাঝ-রাত। তখন মনে হতো জীবনটা বুঝি ওই রকম করেই কাটবে। তখন আরো মনে হতো সাহিত্যকেই আমি জীবিকা করে নেব। ডাক্তারদের যেমন ডাক্তারিটাই জীবিকা, ইঞ্জিনীয়ারদের যেমন ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যেটাই তার জীবিকা.

তেমনি লেখকের পক্ষে লেখাটাই হওয়া উচিত তার জীবিকা। তা না হয়ে কেন তাকে জীবিকার জন্যে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে দাসত্ব করতে হবে?

না, আমি যা ভয় করেছিলাম একদিন তা-ই হলো। একদিন যথারীতি আমি প্রাতঃকালীন আড্ডা দিয়ে দুপুর দেড়টার সময় বাড়ি ফিরেছি, দেখি আমার জন্যে আমার পিতৃদেব উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। কী ব্যাপার? না আমাকে নিয়ে তিনি তখনই তাঁর অফিসে যাবেন, আমার চাকরি হবে। খাওয়া পরে হবে। আর একদিন খাওয়া না হলে তেমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধও হয়ে যায় না। জীবনে তুমি পরে অনেক খাবে। প্রতি মাসের প্রথম তারিখে তোমার হাতে মাইনে পাওয়ার নিশ্চিন্ত আশ্বাস দেবার কর্তব্য আমি পালন করে গেলাম। তারপর তোমার ভাগ্য। ভাগ্যে থাকলে তুমি এই প্রতিষ্ঠানের একেবারে মাথায় না হোক মাঝামাঝি কাঁধ পর্যন্তও উঠতে পারো। তারপর যদি তুমি মন দিয়ে কাজ করে তোমার ওপরওয়ালাদের খুশী করতে পারো তো তাহলে আর কোনও কথাই নেই। তখন তুমিই বা কে আর আলমগীর বাদশাই বা কে! তুমি যেদিন চাকরি থেকে অবসর নেবে সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার পেনসনের পাকা বন্দোবস্ত করে দেবে অফিস। তখন কত আড্ডা দেবে দিও না, প্রাণ ভরে আড্ডা দিও তখন! আর সাহিত্য? সমস্ত দিন চাকরি করে কি আর সাহিত্য করা যায় না? আমি কি তোমাকে সাহিত্য করতে বারণ করেছি? অফিস তো দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত, পাঁচটার পর বাইরে আড্ডা না দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে সাহিত্য কোর। বঙ্কিম চাটুজ্জে, শরৎ চাটুজ্জে তো তাই-ই করে গেছেন—

আসলে বাইরে পিতৃদেব আমাকে নিরুৎসাহ করলেও ভেতরে ভেতরে তিনিও ছিলেন একজন আর্টিস্ট। পিতৃদেব ছিলেন গায়ক। শখের থিয়েটারে অভিনয় করা ছিল তাঁর নেশা। বিশেষ করে যে-ভূমিকায় গান গাইতে হতো সেই ভূমিকাগুলো দেওয়া হতো তাঁকে। তাঁর শেষ জীবনে বাড়িতে যখন একলা থাকতেন তাঁকে আমি গান গাইতে শুনেছি। কিন্তু সংসারের সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে তাঁর ও-সব কিছুই হয়নি। সংসারের চাকা ঘুরিয়েই তিনি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন গান বা সাহিত্যের নেশা একবার পেয়ে বসলে সে-ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পাছে আমারও ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার হয়ে যায় তাই তিনি আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন।

তা গাড়িটা যখন অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তখন অফিসের সামনে ফুলের বাগান আর বাড়িটার স্থাপত্য-শিল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাইরেটা যার এত সুন্দর তেমন তার ভেতরে না জানি আরো কত সৌন্দর্য!

পিতৃদেব তখনও কানের কাছে বলে চলেছেন—চাকরি পাওয়াটাই শক্ত, সেইটে আমি তোমাকে জোগাড় করে দিয়ে গেলাম, এখন এ-চাকরি ছাড়া কি না-ছাড়া তোমার হাতে। ছাড়তে এক মিনিটও লাগে না। পাওয়াটাই শক্ত। ইচ্ছে হলে তুমি ছেড়ে দিও—

আমার এই চিঠির পাঠকদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বছরগুলো বন্দী-নিবাসের চারটে দেওয়ালের মধ্যে কাটিয়েছেন, বছরের পর বছর আলোবাতাসহীন ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় যাঁর জীবন কেটেছে, তাহলে তিনিই বুঝতে পারবেন আমার সেই চাকরির বছরগুলোর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাটা। আমার কলমে এমন ভাষা নেই যে তার বিশদ বর্ণনা দিই। যাঁরা Charles Lamb-এর লেখা 'The Superannuated Man' প্রবন্ধটা পড়েছেন তাঁরাই কেবল আমার সেই সময়কার অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। তাঁরই ভাষাই শুনুন—

"I had perpetually a dread of some crisis, to which I should be found unequal. Besides my daylight servitude, I served over again all night in my sleep, and would awake with terrors of imaginary false entries, errors in my accounts, and the like. I was fifty years of age and no prospect of emancipation presented itself. I had grown to my desk as it were; and the wood had entered into my soul."

তবে ল্যামের সঙ্গে আমার একটা মস্ত তফাৎ ছিল। তফাৎ ছিল এই যে এই চাকরিতে আমাকে বেশিদিন ধরে কখনও একটা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়নি। চাকরি-জীবনে বোধহয় আমাকে সাত-আটবার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন কর্মে বদলি হতে হয়েছে। কখনও উড়িষ্যা কখনও বেহার, কখনও মধ্যপ্রদেশ আবার কখনও বা কলকাতায় আমার বদলি হয়েছে। আবার বছর তিন-চার তো মাসের মধ্যে সাতাশ দিন ট্রেনে চড়েই কাটিয়েছি। চাকরি করতে করতে আমার মনে হয়েছে আমাদের এই বাস্তব পৃথিবীর মত প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতরেই পাশাপাশি আর একটা

ইচ্ছার পৃথিবীও থাকে। সেই ইচ্ছার পৃথিবীতেও ঋতু পরিবর্তন হয়, সূর্য ওঠে সূর্যাস্ত হয়। সেখানেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, আছে প্রত্যাশার আলো আর হতাশ্বাসের অমাবস্যা। সেই ইচ্ছার পৃথিবী কারো কাছে বড় আকার ধারণ করে আবার কারো কাছে ছোট। কারো কারো জীবনে সেই ইচ্ছার পৃথিবীর সঙ্গে তার বাস্তব পৃথিবীর সংঘর্ষও বাধে। বেশির ভাগ মানুষ সেই সংঘর্ষে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে আপোস করে নেয়। আপোস করে ইচ্ছার পৃথিবীকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। আরো পাঁচজন শান্ত-শিষ্ট ভদ্র-লোকের মত সেও সেই তথাকথিত শান্তিকেই পরমার্থ মনে করে দুধের সাধ ঘোলে মেটায়। কিন্তু সংসারে এমন লোকও জন্মায় যারা হাজার অভাবের মধ্যে দুধই খেতে চাইবে, দুধের অভাবে ঘোলকে কখনও দুধ বলে ভ্রম করবে না। সংসারে সেই তারাই হয়ে ওঠে স্বাধীন, তারাই হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। তাই দেখা যায় কেউ তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিত্রাণ লাভ করে, আবার কেউ বা কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের তাড়নায় আত্মবিসর্জন করে মুক্তি পায়।

কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল আমার তখন আর তা খেয়াল রইল না। লেখার জগৎ থেকে আমি একদিন কলকাতা ছেড়ে সুদূর প্রবাসে চলে গেলাম। কর্ম থেকে কর্মান্তরে পাঠিয়ে দিয়ে আমার ভাগ্যদেবতা বোধ হয় আমার মনকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মানুষের কর্ম একাধারে তার বন্ধনও বটে আবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তিও। কর্ম তখনই বন্ধন যখন তা প্রয়োজন দ্বারা শাসিত হয়। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যে কর্ম করে সেই কর্মই তার শৃঙ্খল। কিন্তু প্রীতির প্রেরণায় যে কর্ম করি তাকেই বলা হয় মুক্তি। আমার দুর্ভাগ্য যে প্রীতি নয় প্রয়োজন-সাধনই সেদিন আমার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কাজের মধ্যেও আমার কান্না আসতো। ভাবতাম তবে কি দাসত্ব-বৃত্তির জন্যেই আমি একদিন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

মানুষের মন যে কী অদ্ভুত বস্তু তা এখনও আমার মনে পড়ছে। আমাদের এই পৃথিবীর মত মানুষের মনও বোধ হয় সর্বংসহা। আশ্চর্য! প্রতি মাসের পয়লা তারিখে হাত পেতে বেতন নিতে শেষকালে আমার আর কুণ্ঠা হতো না। আস্তে আস্তে আমার মন যেন অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। প্রথম-প্রথম ছিল লজ্জা, প্রথম-প্রথম ছিল অপমান-বোধ। চাকরি পেলে অন্য সকলের যেমন আনন্দ হতে দেখেছি আমার বেলায় ছিল ঠিক তার বিপরীত। ছোটবেলা থেকে অফিস-যাত্রীদের চেহারা দেখলেই আমি চিনতে পারতাম। আমাদের বাড়ির

সামনে দিয়ে সকাল ন'টার সময় দলে-দলে তাঁদের আমি কর্মস্থলে যেতে দেখতাম। যাবার সময় তাঁদের পোশাক, তাঁদের চলার ভঙ্গি, তাঁদের পান খাওয়া, তাঁদের ব্যস্ত-ত্রস্ত ভাব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আর তারপর ঠিক সাড়ে পাঁচটার পর থেকে তাঁদের ক্লান্ত-দেহে ঘামতে ঘামতে ফেরার দৃশ্য দেখবার জন্যে আমি জানালায় এসে দাঁড়াতাম। আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মেস-বাড়িতে তাঁরা থাকতেন, আর আমাদের বাড়ির সামনের গলিটা দিয়ে তাদের কর্মস্থল 'বেঙ্গল গভর্মেণ্ট প্রেস'এর দিকে যেতেন। তাঁদের দেখতে দেখতে আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠতো। ভাবতাম আমাকে যেন কখনও ওঁদের দলে নাম লেখাতে না হয়। অথচ তাই-ই শেষ পর্যন্ত হলো। শেষ পর্যন্ত ওঁদের দলেই তো আমি নাম লেখালাম।

কিন্তু কয়েক মাস কাজ করার পরই পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহা-বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বেহারে বদলি হয়ে গিয়ে যেন পরিত্রাণ পেলাম। অর্থাৎ কয়েক মাসের মধ্যেই আমার আশাতীত পদোন্নতি। যা ছিল একদিন আমার ঘৃণার বস্তু আস্তে আস্তে তা আমার গা-সওয়া হয়ে উঠলো। টাকা এমনই জিনিস। আমি জানতাম চাকরি করা কালীন যদি চাকরিতে পদোন্নতি হয় তাহলে আমার লেখক-জীবনের পক্ষে তা হবে মৃত্যুর সামিল। যুদ্ধের গতি যত তীব্র আকার ধারণ করলো ততই আমারও ক্রমে-ক্রমে পদোন্নতি ঘটতে লাগলো। যে আমি সাহিত্যকেই অঙ্কলক্ষ্মী করে জীবন কাটাবো বলে সঙ্কল্প করেছিলাম সেই আমিই নিয়মিত কর্মস্থলে হাজিরা দিতে লাগলাম এবং একে একে চারটে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে আরো বড় পদ অধিকার করে বসলাম। ভাগ্য-বিধাতার এও এক পরিহাস বইকি। যতই বাঁধন কাটতে চাই ততই সে-বাঁধন নাগপাশের মত আরো নিবিড়ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কিন্তু জীবিকা। যে-আমি একদিন অক্রূর দত্ত সেনের স্টুডিওতে দিন কাটিয়েছি ভবিষ্যতের ভাবনা-রহিত হয়ে, যে-আমি এক দিন বাঙলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রগুলোতে নিয়ম করে গল্প লিখেছি, সেই আমিই কিনা একদিন কর্মস্থলের বন্দী-নিবাসে কয়েকটি রজত মুদ্রার বিনিময়ে ভাড়া খাটছি এ-কথা মনে পড়লেও নিজের ওপর ঘৃণায় আমি বিব্রত হয়ে পড়ি।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। কর্মস্থলে যিনি আমার সবচেয়ে বড়কর্তা তিনি কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ালেও এর চেয়ে সুখ পেতাম বিমলবাবু, এ ঘেন্নার চাকরি আর ভালো লাগে না—

হয়ত এ তাঁর সাময়িক বৈরাগ্য। হয়ত এ তাঁর নিছক মানসিক অভিমানের সাময়িক স্পষ্টোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কথাগুলো আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় করে রাখলো। সকলের শীর্ষে উঠে যাঁর এখনও এই বৈরাগ্য, তাহলে আমার অবস্থাটা কী? আমি যদি কখনও তাঁর পদে উন্নীত হই তাহলে কি আমারও ওই অবস্থা হবে? তাহলে কেন আমি এই দাসত্ব করছি? তাহলে কি চাকরির ক্ষেত্রে উঁচু-নিচুতে কোন প্রভেদ নেই? হুকুম-তামিলের যন্ত্রণার খেসারত কি রজত-মুদ্রায় হয় না? বেতন আর পদ যা-ই হোক, দাসত্ব কি তাহলে দাসত্বই? তার কি অন্য ব্যাখ্যা নেই? দাসত্বের স্টীম-রোলারের চাপে কি বেতন, মর্যাদা, মনুষ্যত্ব, পদ সব কিছুই গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যায়?

এর পরে আবার আর একটা ঘটনা ঘটলো।

ডিউটিতে খড়্গপুর থেকে ট্রেনে চক্রধরপুর আসছি।

আমার কামরায় আমি একলা। ঘাটশীলায় ট্রেন থামতেই এক ভদ্রলোক আমার কামরায় উঠলেন। পরনে শার্ট প্যাণ্ট। হাতে স্টেথিসকোপ। বুঝলাম ভদ্রলোক ডাক্তার। তিনি যেচেই আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। কোথায় বাড়ি, কী নাম তাই নিয়ে প্রশ্নোত্তর আদান-প্রদান হলো। তিনি বললেন তিনি ঘাটশীলাতে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন। যাচ্ছেন গিড্‌নীতে একটা জরুরী কল-এ। সেখানে তাঁর এক রোগী আছে।

আমি তাঁর প্রশ্নে আমার নাম বলাতে তিনি বললেন তাঁর নাম নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপর নিজে থেকেই বললেন—আমার দাদার নাম বললে আপনি হয়ত চিনতে পারবেন, তিনি একজন লেখক—

—লেখক? আমি চম্‌কে উঠলাম। কী নাম বলুন তো?

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার মনে হলো আমি যেন আমার চোখের সামনে ভূত দেখছি—। কিংবা আমারই প্রেতাত্মা বুঝি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই বয়েসেই আমি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম। একবার একসঙ্গে এক ট্রেনের একই কামরায় তাঁর সঙ্গে ৺শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসভায় দেবানন্দপুরে গিয়েছি। তাঁর লেখা তো মিষ্টি ছিলই কিন্তু মানুষটি যে তাঁর লেখার চেয়েও মিষ্টি ছিলেন তা আমার জানা ছিল। কিন্তু কথা তা নয়।

কথাটা হলো এই যে তাঁর ভাইএর কথা শুনতে শুনতে যেন আমার মনের ভেতরে অশান্তির যে বারুদটা লুকোন ছিল তা হঠাৎ জ্বলে উঠলো। আর সেই হুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই যেন তাতে অগ্নি-সংযোগ করে দিলেন। আমার সমস্ত সত্তা সেই আগুনে দাউ দাউ করে পুড়তে লাগলো। আমার চোখের সামনে যেন আমার আমিটার সৎকার হতে লাগলো।

যতদূর মনে পড়ে তখন ১৯৪১ সালের শেষ দিক। যুদ্ধের দামামা তখন পৃথিবী জুড়ে কানে তালা লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। তখনকার চক্রধর-পুরে তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একচ্ছত্র রাজত্ব। ব্রিটিশ-গভর্মেণ্টের প্রতাপের তখন পূর্ণমাত্রা। ইংরেজদের যত তেজ ইঙ্গ-ভারতীয়দের তেজ তার শতগুণ। তাদের পাশাপাশি একসঙ্গে আমরা কাজ করি। তাদের মনোভাব এই যে যেন তারা আমাদের প্রভুর জাত, আর আমরা তাদের ভৃত্যগোত্রীয়, তা সে আমরা যে-পদই অধিকার করে থাকি না কেন, আর যত বেতনই পাই না কেন। তারা সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের ওপর কড়া নজর রাখে। লুকিয়ে লুকিয়ে খবর নেয় আমরা হিটলারের জার্মানীর রেডিওর খবর শুনি কিনা, সুভাষচন্দ্র বোসের বক্তৃতা শুনি কিনা।

একে এই পরিবেশ, তার ওপর নিজের দাসত্বের লজ্জা, আর তার ওপর আমার অতীত, সব কিছুর উর্ধ্বে শেষ মারাত্মক আঘাত পেলাম সেই ট্রেনের চলন্ত কামরায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই হুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি যেন আমাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। বললেন—ছি ছি, তুই কিনা সাহিত্যিক হয়ে দাসত্ব করছিস?

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলে যে অন্নগত-প্রাণ এ সত্য তো ইতিহাস বিদিত। বঙ্কিমচন্দ্র তো দূরের কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তো কিছুকাল চাকরি করেছিলেন। আর তুমি এমন কি তালেবর ব্যক্তি যে চাকরির ওপর তোমার এত ঘৃণা! কিন্তু স্যামুয়েল বাটলারকে তখন কোথায় পাই যিনি আমার দুঃখের কথাটা বুঝবেন। তিনি তো ১৯০২ সালে দেহত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ আমার জন্মেরও কতকাল আগে। তাহলে কী করি?

তখন যুদ্ধের জন্যে লোক নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে চারিদিকে। আরো সৈন্য চাই, আরো মানুষ। এমন মানুষ চাই যারা জাপানীদের উড়ো জাহাজের বোমার আঘাতে মরতে তৈরি। যারা প্রাণ দিতে পারবে জাপানীদের কামানের গোলার সামনে। তেমনি বশংবদ ইণ্ডিয়ান কে কোথায় আছো, এগিয়ে এসো।

আমি আর দেরি করলাম না। বাড়িতে ফিরে এসে ভাবলাম আর নয়। যে-জীবন দাসত্বের উর্ধ্বে উঠতে পারল না সে-জীবনের অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন নেই। সে-জীবনের সমাধান একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুর মধ্যেই সম্ভব। চক্রধরপুরের স্টেশন মাস্টার ছিল তখন মিস্টার স্মলে। ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের মধ্যে বেশ কেষ্ট-বিষ্টু। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর। তিনি যুদ্ধের কিংস্-কমিশন পেয়ে তখন মেজর স্মলে হয়ে আর্মি হেড-কোয়ার্টারের চার্জ নিয়ে চলে গেছেন। যুদ্ধে নতুন অফিসার নেওয়ার ভার তাঁর ওপরে। বাড়িতে সেই রাত্রেই এসে তাঁকেই একটা চিঠি লিখে দিলাম।

এতদিন পরে এই কাহিনী লিখতে গিয়ে ভাবছি কত অলৌকিক ঘটনাই না আমার জীবনে ঘটে গেছে। নইলে এত দিনে আমার সেই কর্মস্থলে সংযুক্ত থাকলে কত নিশ্চিন্তভাবেই না জীবন কাটাতে পারতাম। মোটা পেনশন পেতাম, সারা জীবন বিনা-পয়সায় সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের আরাম। এ-ছাড়া ছিল উইডো পেনশনের পাকা ব্যবস্থা। আমার কর্মস্থলে নিজের নাবালক ছেলেকেও একটা চাকরি করে দিয়ে শেষ জীবনটায় সুখে-স্বচ্ছন্দে না হোক এই লেখার যন্ত্রণা থেকে তো মুক্তি পেতাম নিশ্চয়ই। কর্মস্থলে চারটে পরীক্ষা দিয়েই আমি আমার আসন পাকা করে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন এই যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি সে-চাকরিতে থাকলে এর থেকে তো অন্তত অব্যাহতি পেতাম।

কিন্তু তা হয়ত হবার নয়। চিরকালই 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে'র ইচ্ছা আমাকে প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে তাড়না করে এসেছে বলেই একদিন চক্রধরপুরও আমাকে ত্যাগ করতে হলো। সকালবেলা চিঠিটা ডাকে দিতে যাচ্ছি, রাস্তায় খবর পেলাম কলকাতা থেকে আমার নাকি ডাক এসেছে। আমাকে ওদের সেখানে জরুরী প্রয়োজন। প্রথমে বিশ্বাস না হবারই মতো কিন্তু নিজের চোখে সে চিঠি দেখে বিশ্বাসই হলো। আমি তলপি-তলপা গুটিয়ে আবার একদিন কলকাতায় চলে এলাম। আগস্ট ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটেছে। তা আমি দেখতে পাইনি। শুধু দেখলাম আমার অজ্ঞাতসারে কলকাতার সমস্ত পটভূমিকা আমূল বদলে গিয়ে অন্যরূপ নিয়েছে। পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। কলকাতায় ফিরে এসে কর্মসূত্রে নানা অঞ্চলে আমাকে যেতে হতো। বিশেষ করে একটা ছাপাখানায় যাওয়া আমার প্রায় নিত্যকর্ম ছিল। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে

সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় ছিলেন এতদিন ? লেখা-টেখা সব বন্ধ করে দিলেন নাকি ?

অনেক বছর পরে সাহিত্য-জগতের একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। যেন আত্মীয়-মিলন ঘটলো।

বললাম—সাহিত্য রচনা চলেছে এখনও ?

—খুব চলেছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে একটু ঝিমিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু আবার তা পুরোদমে চলেছে, সবাই লিখছে, আপনিই শুধু বাইরে চলে গিয়েছিলেন—এখন কলকাতায় ফিরে এলেন, এখন আপনিও লিখুন না—

বন্ধু আবার লেখবার উৎসাহ দিলেন। হাঁটতে হাঁটতে আবার একদিন চলে গেলাম সেই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িটার সামনে। চেয়ে দেখলাম উল্টোদিকের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটার দিকে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি মন্দিরটার সংস্কার শুরু হয়েছে। রাজমিস্ত্রী খাটছে, চুনকাম হচ্ছে, রং লাগানো হচ্ছে। যেন সংস্কার-মুক্তির সংগ্রাম আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। বড় ভালো লাগলো দেখে। এত সংস্কার-মুক্তির আয়োজন চারদিকে আর আমি কিনা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি। আমারও তো এই সংগ্রামে ভূমিকা গ্রহণ করবার অধিকার আছে একটা। আমি এই সংগ্রামে সেনাপতি না হতে পারি, মন্ত্রী না হতে পারি, পদাতিকের ভূমিকা তো এতে নিতে পারি। অনায়াসেই বাড়ি এসে আবার সমস্ত পুরোন জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে অবগাহন করলাম। সেই বাংলাদেশের পুরোন ইতিহাসের নথি-পত্র। কিন্তু পুরো মন দিতে পারি না। কর্মস্থল আমার সমস্ত সময় মন সব কিছু কেড়ে নেয়। প্রয়োজন আমার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রীতির জন্যে এতটুকু ঠাঁই ছেড়ে দিতেও সে রাজি নয়। প্রয়োজন তার গরজ নিয়ে আমার পশ্চাদ্ধাবন করে। প্রয়োজনের গরজে যা কিছু লিখি না কেন তা দরখাস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে উদর পূর্তি হয়, তাতে সমাজে বেকার নাম ঘোচে। কিন্তু যার মনের বালাই বড় বালাই, যার মন বুভুক্ষু, যার মন বেকার হয়ে সমাজের উপেক্ষিত, সেই মনটাকে কী খেতে দিই ? কী খাওয়ালে সেই মনের জঠর ভরে ?

এই সময়ে আমার মনের সঙ্গে দেহের বিরোধ দেখা দিল। মনের সঙ্গে দেহের লড়াই বাধলো। প্রয়োজনের সঙ্গে প্রীতির। আগে যা বলেছি সেই সংস্কারের সঙ্গে সংস্কার-মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

আবার একদিন কালি-কলম নিয়ে বসলাম।

ঠিক এই সময়ে আপনার সঙ্গে আমার ঘটনাচক্রে আলাপ হলো। বোধহয় আপনার সে-কথা মনে আছে। আপনি তখন নতুন, আর আমি পুরোন হলেও নতুন করে তখন পুরোন জগতে ফিরে এসেছি। সে-গল্প গত বছরের সাহিত্য সংখ্যায় (১৯৭৪) 'এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট' নাম দিয়ে লিখেছি। আমার সেই 'আমীর ও উর্বশী' গল্পটা আমি ছাপাতে রাজি ছিলাম না কিন্তু আপনি জোর করে তা ছাপলেন। সে-কাহিনী নতুন করে আর এখানে বলার দরকার নেই। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে 'দেশ' পত্রিকায় সেই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর শুধু 'দেশ' সাপ্তাহিক নয়, সেই বছরে একসঙ্গে সব কটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাতেই আমার একটা করে রচনা প্রকাশিত হলো। সবগুলোই সংস্কার-মুক্তির গল্প। অনেক-দিন অব্যবহারে মানুষের মনেও বোধহয় মরচে পড়ে। শুধু অব্যবহারে নয়, অপব্যবহারেও মনে মরচে ধরার আশঙ্কা থাকে। এতদিন মনের সেই অপ-ব্যবহারই করে এসেছিলাম আমি। সেদিন সেখানেই যে থেমে যাইনি তার কারণ আপনি। আপনি আবার তাগিদ দিতে লাগলেন। আপনিই তাগিদ দিয়ে দিয়ে আরো রচনা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে লাগলেন। শেষকালে একদিন বললেন—এবার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখুন—

উপন্যাস ! আর ধারাবাহিক উপন্যাস ! সে তো হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের মতন বড় শক্ত জিনিস। তার তাল লয় মূর্ছনা আছে, তার আলাপ তান সাপট-তান আছে, সে কি অত সহজ ? সে কি আমি পারবো ? সে তো ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের দ্বারাই কেবল সম্ভব। সত্যিই সে কি আমি পারবো ? যদি বেসুরো হয়, যদি তাল কাটে, যদি তান দিতে দিতে গলা বুজে আসে। তার ওপর আছে 'থার্ড ডাইমেনশন', অর্থাৎ যাকে বলা যায়, কাহিনী অতিক্রম করে কাহিনীর উর্ধ্বে উঠে একটা তৃতীয় বস্তুর ইঙ্গিত দেওয়া সে তো টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, বালজাক, ডিকেন্স, রোঁমা রোঁলা পেরেছেন, কিন্তু সে কি আমার কলমে আসবে ? যে-উপন্যাস শেষ হয়েও মনে হবে শেষ হলো না, যে-উপন্যাস পড়া শেষ করলে মনে হবে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর জগতের উর্ধ্বে আর এক ধ্রুবলোকে পৌঁছিয়ে গিয়েছি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর উর্ধ্বে যেখানে পাঠকের সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর সমস্ত বিচ্ছেদ ঘুচে গিয়ে এক অনাবিল আত্মোপলব্ধির সৃষ্টি হয়, সেই আনন্দ-স্রোতে আমি ভাসছি, যে-উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হবে আমি এতদিনে নিজেকে চিনলাম, লেখক আমার কথাই বেনামীতে লিখেছে, সে কোন্

লেখকের দ্বারা লেখা সম্ভব? সেই জাতীয় লেখক হতে গেলে যে যন্ত্রণা ভোগ করা অনিবার্য সেই যন্ত্রণায় কি আমি ভুগেছি? আমি তো কেন্দ্রীয় সরকারের মাসের পয়লা তারিখের নিশ্চিন্ত বেতনখোর অন্যতম একজন কর্মচারী। আমি তো স্লেভ্, আমি তো দাস। প্রয়োজনের গরজের অব্যর্থ শিকার আমি। আর গরজ তো সংসারে সব চেয়ে বড় বালাই। সেই বালাই এড়িয়ে যেটুকু সময় পাই, তা আমার উপন্যাস লেখার পক্ষে কি যথেষ্ট?

মনে আছে তবু আমি চেষ্টা করলাম! দিনের বেলা দাসত্ব করি আর প্রায় সমস্ত রাতই জাগি। সে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। যুদ্ধ থেমে গেছে এক বছর আগে। কিন্তু যুদ্ধের আনুষঙ্গিক উৎপাত শুরু হয়েছে আমাদের জীবনে। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার ভেঙে চুরে তচনচ হয়ে গেছে। বাবা যদি থাকে বরানগরে, মা হয়ত থাকে খিদিরপুরে, বড় ছেলে কসবায়, আর ছোট ছেলে যাদবপুরে, কিংবা টালিগঞ্জে। একই সংসারে একই ছাদের তলায় জন্মে হঠাৎ সবাই তখন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের এই সামাজিক পট-ভূমিকায় আমার উপন্যাস আরম্ভ হলো আপনার পত্রিকায়। তখনও আমি জানি না ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার আর্ট। জানি না কী কৌশলে পাঠককে সপ্তাহের পর সপ্তাহ রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলের নেশায় আকৃষ্ট করা যায়। আমি শুধু এইটুকুই জানতুম বর্তমান কালের পাঠক আর বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের আমলের পাঠকের মধ্যে আজ আসমান-জমিন তফাৎ। তাঁদের আমলে তখন অবসর ছিল পাঠকের প্রচুর, অপেক্ষাকৃত সরল ছিল তার পারিপার্শ্বিক। আর তখন নব-সাক্ষর পাঠকদের এত দৌরাত্ম্যও ছিল না এখনকার মত। তবু তো স্বীকার করতেই হবে যে পাঠকের জন্যে সাহিত্য নয়, বরং সাহিত্যের জন্যেই পাঠক। সুতরাং আজকালকার কোনও সৎ লেখকের পক্ষে পাঠকের সম-স্তরে নেমে আসবার কোনও প্রশ্নই আসে না। একমাত্র সম্ভব যেটা তা হলো আঙ্গিকের কলাগত পরিবর্তন সাধন। সে-আঙ্গিকের পরিবর্তন-সাধনের প্রয়োজন এই জন্যে অনিবার্য যে যাতে তার দ্বারা স্বল্প-অবসর পাঠকের কাছে লেখকের বার্তা অনায়াসেই পৌঁছে দিতে পারা যায়। আর সে এমন এক আঙ্গিক হওয়া চাই যা অতিব্যস্ত পাঠকেরও ঘুম কেড়ে নেবে, অত্যন্ত বিব্রত পাঠকেরও অশান্তি ঘোচাবে, তার সমস্যার ব্যাখ্যা করবে, তার সমস্যার কারণ বলে দেবে, তাকে পুনর্জন্ম দেবে।

এই সমস্ত কিছুই আমার জানা ছিল। কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ এসে আমার সমস্ত জানা নিষ্ফল করে দিলে। সবে মাত্র আমার সেই প্রথমতম উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, ঠিক তার তিন সপ্তাহ পরেই হঠাৎ সারা দেশ জুড়ে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা সেদিন সঠিক-ভাবে বুঝতে পারলাম। লেখায় মনঃসংযোগ করা ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগলো। উপন্যাসের কিস্তি ঠিক মত সম্পাদকীয় দফতরে পৌঁছে দিতে পারি না। রাত্রের নৈঃশব্দ্য চৌচির হয়ে যায় 'আল্লা-হো-আকবর' আর 'বন্দে-মাতরম' চিৎকারে। শহরে মৃতদেহের স্তূপ পড়ে থাকে দিনের পর দিন, মানুষ হত্যার উল্লাসে নৃশংস হয়ে পশুর মত আচরণ করে।

কিন্তু এতেও আমি দমিনি। সমসাময়িক ঘটনাস্রোতে জড়িয়ে পড়া সাংবাদিকদের কাজ, লেখকের পক্ষে তা ত্রুটি। লেখককে সব কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকেও মুক্ত থাকবার সাধনা করতে হয়। প্রাণপণে আমি সেই চেষ্টাই তখন করছিলাম। কিন্তু উপন্যাস যখন মাঝপথে তখন এল আর এক বিপর্যয়। বোধহয় আমার জীবনের চরমতম বিপর্যয় সেটা। উপন্যাস যখন মাঝপথে পৌঁছেছে সেই সময়ে আমি রোগাক্রান্ত হলাম। 'কোথা হা-হন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি'। সত্যিই কোথায় রইল সেই উপন্যাস, আর কোথায় রইলাম আমি। সাহিত্যের জন্যে যখন নিরলস প্রয়াস করবার কথা তখনই আমার জীবনে হতাশ্বাসের দুর্যোগ নেমে এল। তখন আর আমার আত্মপ্রকাশের সমস্যা নয়, তখন বাঁচার প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠলো আমার কাছে। আর কী দীর্ঘ সেই সব যন্ত্রণা-কাতর দিনগুলো আর রাতগুলো। মাসের পর মাস যন্ত্রণা-বিদ্ধ অবস্থায় বিনিদ্র থাকার সে কী অভিশাপ তা প্রথম সেই-ই আমার উপলব্ধি হওয়ার সুযোগ হলো। জানতে পারলাম অর্থ এক-এক সময়ে মানুষের জীবনে শুধু প্রয়োজনই নয়, আশীর্বাদও বটে, বুঝতে পারলাম মন নিয়ে সাহিত্যে যত বাড়াবাড়িই হোক দেহও অবহেলার বস্তু নয়। এই দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্যেই মানুষে-মানুষে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে যুগে যুগে এত বিরোধ। এই দেহকে অস্বীকার করে আমি আমার মনকে এত প্রাধান্য দিয়েছিলাম বলেই হয়ত আমার কাছে এই চরম শিক্ষার প্রয়োজন অনিবার্য হলো। তখন বুঝলাম মানুষের এই দেহ তার মনেরই আধার। এই দেহকে বাদ দিয়ে মনের পরিত্রাণ খোঁজা ব্যর্থ প্রয়াস।

তাই তন্ত্র-সাধনায় দেহ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি। সেই রোগ-যন্ত্রণাই যেন আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার'।

সাত মাস যে দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা যে-কোনও মানুষকে উন্মাদ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। চোখের অসুখ অনেকেরই হয়, কিন্তু চোখের ভেতরে বসন্তের গুটি হওয়া যে কী যন্ত্রণাদায়ক তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো এমন ভরসা আমার নেই। আমি ততদিনে মাঝপথেই ধারাবাহিক উপন্যাসের সমাপ্তি টেনে দিয়েছি, কিন্তু তবু যন্ত্রণা সমাপ্তির কোনও লক্ষণ নেই। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নীহার মুন্সী আমার যে-উপকার করেছিলেন এখানে তার উল্লেখ না করলে অন্যায় করবার অপরাধে অপরাধী হবো।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণার একদিন উপশম হলো। যন্ত্রণা দূর হলো বটে কিন্তু আমার একটা চোখের দৃষ্টি চিরকালের মতো অকেজো করে দিয়ে তবে দূর হলো। জীবনে কিছু পেতে গেলে কিছু-না-কিছু মূল্য তার জন্যে দিতেই হয়। নতুন যে জ্ঞান পেলাম আমার একটা দৃষ্টিই হয়তো তার সেই মূল্য। একটা চোখের দৃষ্টি দিয়েই আমি দেখতে পেলাম আর এক নতুন পৃথিবীকে। সেই নতুন পৃথিবীতে আবার নতুন করে যখন জন্মগ্রহণ করলাম তখন দেশে পালা বদলের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে। ইংরেজ গেছে, কিন্তু তাদের ফেলে যাওয়া জঞ্জাল-স্তূপ জড়ো করে আমরা তাই-ই পুজো করতে শুরু করেছি। সেখানে পাপ-পুণ্যের অর্থ বদলে গেছে, সৎ-অসতের ব্যাখ্যার হের-ফের হয়েছে। দেশ তখন স্বাধীন।

চিকিৎসক আমার চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করে রায় দিলেন যে, সূর্যাস্তের পর লেখা-পড়ার কাজ আমার জন্যে চিরকালের মত নিষিদ্ধ রইল। এ নির্দেশ অমান্য করলে আমার অন্য চোখটাও যাবে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তবে আমার জীবিকার কী হবে? এমন কোনও জীবিকা কি আছে যাতে চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন অনিবার্য হবে না?

অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, হ্যাঁ তাও আছে। সেই সময়ে ভারত-সরকারের অধীনে একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। বিভাগটির কাজ সমাজের দুর্নীতি নিরোধ। সরকারী-কর্মচারীরা যে-দুর্নীতির সঙ্গে সাধারণত জড়িত থাকে তার মোকাবিলা করে তা উচ্ছেদ করাই তাদের প্রধান কাজ। বিভাগটির নাম সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন। বাঙলায় তর্জমা করলে

দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। তখন নাম ছিল স্পেশ্যাল পুলিশ এসট্যাবলিশমেণ্ট। তাঁদের প্রধান কাজ গুপ্তচর-বৃত্তি। কে কোথায় উৎকোচ গ্রহণ করছে তার সন্ধান নাও। তার পরে যথা সময়ে ফাঁদ পেতে তাকে গ্রেফতার করো। আর তার পরে মামলা করো তার নামে, কোর্টে চালান দাও আসামীকে।

এর কেন্দ্রীয় দফতর ছিল দিল্লীতে। এখনও তাই-ই আছে। সেখানে থাকেন বিভাগের বড়কর্তা। কিন্তু কলকাতা দফতরের যিনি ছিলেন তখন সর্বেসর্বা তাঁর নাম রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ খবর দিলেন আমার এক ভাবী প্রকাশক। প্রকাশক মশাই নিজেই একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। আমার চোখের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে এক চিঠি। সেই একখানা চিঠিতেই কাজ হয়ে গেল। আমি সেই দিন থেকেই বদলি হলাম নতুন বিভাগে। দুর্নীতি-নিবারক অফিসার। লেখা-পড়ার কাজ কিছু নেই। শুধু আকাশ-পাতাল ঘুরে বেড়ানো আর সপ্তাহান্তে আমার কর্তাকে লিখিত খবর দেওয়া সাত দিনে আমি কী করেছি, কোথায় গিয়েছি আর দুর্নীতি নিবারণের জন্যে কতটুকু কী চেষ্টা করেছি। এ জীবিকা কিছুদিন কলকাতায় করার পর আমার পুরোন জায়গা মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে বদলি হলাম।

আমার রচনায় যদি সৎ-অসৎ পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ প্রাধান্য পেয়ে থাকে তাহলে নতুন এই বিভাগের কর্মই তার জন্যে যা-কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। বিলাসপুরে গিয়ে আমার প্রথমেই নজরে পড়লো মানুষের একটা অংশের কাছে আমি খুব জনপ্রিয়, কিন্তু আর একটা অংশের কাছে আমি অত্যন্ত অপ্রীতিভাজন।

রাস্তায় দেখা হলেই একদল আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। নানা মিষ্টি কথায় আপ্যায়ন করে। আমার শুভাশুভ সংবাদ নেয়। আবার আর একদল আমাকে দূর থেকে দেখেই অলক্ষে অদৃশ্য হয়। যেন আমি তাদের অস্পৃশ্য।

এই কর্মোপলক্ষে কত রকম মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যে আমাকে আসতে হয় তা বললে বিচিত্র শোনাবে। চোর, গুণ্ডা, জুয়াড়ী, নেশাখোর, মাতাল, লম্পট, ঘুষখোর, বেশ্যা,—কে নয়? আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল যারা বেশি বেতনের কর্মচারী তাদের গ্রেফতার করা। আমার ওই ক' বছরের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যাদের বেশি আছে তাদেরই বেশি লোভ। তখন সবে স্বাধীন হয়েছে দেশ। আমাকে ট্রেনে ঘুরে ঘুরে প্রায় সারা ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে যেতে

হতো। আমার হেড-কোয়ার্টার বিলাসপুর আর আমার ঠিক ওপরেই যিনি কর্তা, তাঁর দফতর জব্বলপুর। দুই কি তিন মাস অন্তর যদি কখনও প্রয়োজন বোধ করি তো দফতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি। তাঁর কাছে উপদেশ নিই। নেপিয়ার টাউনে একটা নিরিবিলি ডাক্-বাংলোয় আমার আস্তানা গাড়ি। সঙ্গে থাকে একজন আর্দালি। সে এক অদ্ভুত জীবন-যাত্রা তখন আমার। তখন আমিই বা কে আর শাহেন্ শা আলমগীর বাদ্শাই বা কে? আমার যখন যেখানে যত দূর ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবার অধিকার। চারটে দেয়ালের ভেতরে বাঁধা সময়ের বন্দী আর নই আমি। আমি ইচ্ছে করলে চার দিন চার রাত বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারি। আমার কাছে এমন একটা ছাড়পত্র আছে যা দেখালে আমি যে-কোনও ট্রেনের যে-কোনও কামরায় উঠতে পারি। কেউ ঠেকাবার নেই। আমার গতিবিধি অবারিত।

বহুদিন পরে একদিন বাড়িতে পৌছে দেখি কে একখানা আন্কোরা নতুন সাইকেল রেখে দিয়ে গেছে। কার সাইকেল, কেন সে তা আমাকে দিয়ে গেল, কীসের প্রয়োজনে, তা বোঝা গেল না। বাইরে শহরের অনেককেই জিজ্ঞেস করলাম, কেউই তার সদুত্তর দিতে পারলে না। স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার মিস্টার বোস বললেন—আপনি ব্যবহার করুন, আপনার ব্যবহারের জন্যেই ওটা দিয়েছে আপনাকে।

কিন্তু আমি জানতুম ওটা যে-ই দিক, ওটা দেওয়ার অর্থ আমাকে খুশী করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সামান্য একখানা সাইকেল নিয়ে আমি খুশী হবো এমন ধারণা যার সে-মানুষটা যে চোর বা ঘুষখোর তা অনুমান করে নিতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

ফুড্ অফিসার মিঃ আনসারি বললেন—লে লিজিয়ে মিত্র সাব, ও আপ্‌কা হ্যায়—

একজন ঠিকাদারের উনিশ হাজার টাকার সরষের তেল বাজেয়াপ্ত করে-ছিলাম ভেজাল বলে। সেই ঠিকাদারের লোক আমার বাড়ির সামনে রোজ ঘুর-ঘুর করতো। তার ইচ্ছে আমি তাকে ডাকি, তার সঙ্গে কথা বলি। এক দিন তাকে ডেকে ধমকে দিলাম।

বললাম—তুমি কী চাও? আমার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করো কেন?

লোকটা বড় শয়তান। হি-হি করে হাসতে লাগলো। বললে—হুজুর

আপনার ঘরে ফার্নিচার নেই, আপনি শনিচরি-বাজারে অর্ডার দিয়ে ফার্নিচার বানিয়ে নেন, আমি দাম মিটিয়ে দেব—

বিচিত্র সব ঘটনা ঘটতে লাগলো আমার জীবনে। শেষকালে একদিন একজন সোনার একটা ইঁট নিয়ে এল আমার বাড়িতে। তখন অনেক রাত। আমি তো দেখে অবাক। আমার হাতেই কি শেষকালে হাত-কড়া পড়বে নাকি?

অনেকদিন পরে একদিন বাড়িতে এসে শুনি কে এসে সাইকেলটা নিয়ে চলে গিয়েছে। হয়ত বুঝেছে আমাকে দিয়ে তার কোন লাভ হলো না। কারণ তার দুদিন আগেই সরকারি গ্রেন-শপের পনেরোজন কর্মচারী চুরির অপরাধে আমার হাতে ধরা পড়েছে। 'নইলা' গ্রামের একজন ভকিল সাহেবকে একদিন ধরলাম। সে জোর করে সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ নিতে বাধ্য করতো আর গভর্মেন্টকে ঠকাতো। মনে আছে এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে একটা প্রশংসা-সূচক অভিজ্ঞান-পত্রও দেওয়া হয়েছিল আমাকে।

পেণ্ড্রা রোড স্টেশনের একজন পি-ডবলু-আই-কে (পার্মানেণ্ট-ওয়ে ইন্‌সপেকটার) যখন হাতে-হাতে গ্রেফতার করা হলো সে ভদ্রলোক কেঁদে পড়লো আমার পায়ের ওপর। বললে—আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরলেন, আমি এখন কী করে সমাজে মুখ দেখাবো?

এই রকম অসংখ্য ঘটনা। আপনাকে এ সব তালিকা বলতে গেলে আজকে আর শেষ হবে না। বললে রাত কাবার হয়ে যাবে। কোথা দিয়ে যে দিন আর রাতগুলো কাটতে লাগলো তার আর হিসেব থাকতো না তখন। তখন গানের আর সাহিত্যের জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। চোখে আমার একটা সান্-গ্লাস আর পরনে কোট-প্যাণ্ট, মাথায় টুপি। মধ্যপ্রদেশের জলবায়ু লেগে আমার চেহারার অনুরূপ হয়ে গেছে। আমি পুলিশ, আমি প্রহরী। মানুষের দুর্নীতি-রোধ করবার ব্রত নিয়ে চোখের অসুখের যন্ত্রণা ভুলছি।

এমন সময় রাস্তায় একজন বাঙালী ভদ্রলোক একদিন আমাকে হঠাৎ বললে—'দেশ' সাপ্তাহিকে আপনার একটা কবিতা পড়লুম বিমলবাবু, খুব ভালো হয়েছে—

আমি তো অবাক! আমি কবিতা লিখেছি 'দেশ' পত্রিকায়। গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়, উপন্যাস নয়, কবিতা! আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কবে আমি কবিতা পাঠিয়েছি আপনার কাছে! তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফরমের ওপর হুইলার-এর দোকানে গিয়ে দেখি যা শুনেছি সত্যি! কবিতাই বটে।

আমার মনটা যন্ত্রণায় টন্‌টন্ করে উঠলো। সেই রাত্রেই জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনের ডাক-বাংলোয় বসে একটা চিঠি লিখলাম আপনাকে। লিখলাম আপনি আমার এ কী করলেন? আমার নামের কবিতা কেন ছাপলেন? এককালে আমি একজন লেখক ছিলাম। লোকে জানতো সে লেখকের মৃত্যু হয়েছে। সেই-ই তো ভালো ছিল। সত্যিই আপনি আমার এ কী করলেন? আমার প্রেতাত্মাকে দিয়ে এ প্রহসন কেন করালেন?

বড় অদ্ভুত জবাব এল আপনার কাছ থেকে। আপনি জবাবে আমাকে জানালেন যে আমি যদি লেখা না পাঠাই তো আপনি ওই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করবেন। সুতরাং আমাকে লিখতেই হলো। কবিতার উত্তরে কবিতাই লিখলাম। নেপিয়ার টাউনের সেই ডাক-বাংলোতে বসে বহুদিন পরে আবার সেই কবিতাই লিখলাম। এবং কবিতাটা ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে জানালাম যে গল্পও পাঠাচ্ছি পরের ডাকে।

ততদিনে দুর্নীতি নিবারণের কাজে আমি কতটুকু কী করতে পেরেছি তা এখনে বলা ভালো। মনে আছে বোধহয় তেত্রিশজনেরও বেশি ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত আমার কৌশলের ফলে গ্রেফতার বরণ করলো। সে-সব সেই স্বাধীনতার প্রথম যুগের ঘটনা। আমার অভিজ্ঞতায় দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে তা দূর করা আমার সাধ্যের বাইরে। এমন কি আমার নিজের দফতরের মধ্যেই ছিল দুর্নীতি। অর্থাৎ সরষের মধ্যেই ভূতের লীলা চলছে। স্বাধীনতার আগের যুগও দেখেছি, তার পরের যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতাও আমার তখন হলো। দেখলাম সততা বজায় রেখে ওই চাকরিতে আর টিঁকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যেই যেন দুর্নীতির প্রাবল্য বেশি। অর্থ-উপার্জনের নানা পন্থা আবিষ্কার করে পদস্থ অফিসারদের গৃহিণীরা পর্যন্ত যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার খেলায় মেতে উঠেছে। কোনও অধস্তন কর্মচারী যদি সরকারী কোনও কাজে কলকাতায় যায় তো ফিরে আসবার সময়ে বড় সাহেবের গৃহিণীর জন্যে তাকে কপি, কড়াইশুঁটি, গল্দা চিংড়ি বা নলেন গুড়ের পাটালি সঙ্গে করে আনতে হবে। তার দাম? দাম তুমি তোমার নিজের পকেট থেকে এখন দাও, তাতে ভবিষ্যতে চাকরিতে তোমার উন্নতি হবে! একটা মালগাড়ির ওয়াগনের জন্যে ঘুষের বাজারদর তখন ছিল আটশো টাকা। তুমি সে ওয়াগন শালিমারে পাঠিয়ে চড়া দরে মাল বেচো।

তাতে যদি পাবলিক মরে তো মরুক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার ন্যায্য ঘুষ চাই। আর সে ঘুষ নেওয়ার পদ্ধতিও ছিল বড় অদ্ভুত। কোন্ দালালের হাত দিয়ে কত কৌশলে যে তা বড় সাহেবের হাতে গিয়ে পৌঁছতো তার খবর আমার কাছে ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্নীতি-নিরোধ আইন তখন এত দুর্বল ছিল যে, তাদের ধরা-ছোঁওয়া ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। আর আজ বলতে বাধা নেই সেদিন সেই বড় কর্তারাই ছিল দুর্নীতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী। তাঁরা আমার সহযোগিতা তো করতেনই না, বরং আমার মুখের সামনেই বলতেন—এ চাকরি কেন করছেন, পরের সর্বনাশ করে আপনার কী লাভ হচ্ছে?

যাঁরা এ-সব উপদেশ আমাকে দিতেন পরবর্তীকালে দেখেছি তাঁদেরই আরো পদোন্নতি হয়েছে। কেউ কেউ পদ্মশ্রী উপাধিও পেয়েছেন। মনে আছে যুদ্ধের আমলে দফতরের মধ্যেই আমাদের কানের কাছে নেতাজীকে গালাগালি দিয়ে যাঁরা আমাদের মনঃপীড়ার কারণ হয়েছেন, সেই বড় কর্তারাই আবার নেতাজী-জন্মোৎসবের দিনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি ও টুপি পরে সভায় দাঁড়িয়ে সকল শ্রোতাকে নেতাজীর আদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে লেকচার-বাজি করেছেন।

যাক, হয়ত এই সব অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছিল আমার। পরবর্তীকালে যখন আমাকে পলাশীর যুদ্ধের আমল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত দু'তিনশো বছরের ইতিহাস নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখবার কাজ করতে হয়েছে, তখন এই চোখে দেখা ঘটনাগুলো আমাকে প্রচুর উপকরণ যুগিয়েছে। এর জন্যে সেদিনকার সেই কর্মজীবনের কাছে আমি অনেকাংশেই ঋণী।

জব্বলপুরের সদর দফতর থেকে আমার কাছে প্রায়ই চিঠি আসতো আমি যেন প্রত্যেক নতুন শহরে প্রত্যেক গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সেখানকার মণ্ডল কংগ্রেস বা জেলা-কংগ্রেসের সভাপতিদের সঙ্গে দেখা করে সেখানকার সন্দেহজনক লোকদের সন্ধান নিই। কিন্তু আজ এতদিন পরে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করছি যে, তখন তাঁদের কাছ থেকেও আমি কোনও সহযোগিতা পাইনি। কিন্তু তা বলে ভালো লোক কি তখন ছিল না? ছিল বৈকি! নিশ্চয়ই ছিল। সেই সৎ মানুষদের কথাও আমি লিখেছি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। কালের ইতিহাস তো সেই মুষ্টিমেয়দের জন্যেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

চোখের যন্ত্রণা তখন আর নেই, তার ওপর চিঠির পর চিঠি। আপনি লিখলেন—বিলাসপুরে গিয়ে কি বিলাসী হয়ে গেলেন?

আসলে বোধহয় উপন্যাস লেখবার একটা উপযুক্ত বয়েস আছে। চল্লিশের আগে সাধারণত উচ্ছ্বাসেরই প্রাবল্য থাকে মানুষের কলমে। উচ্ছ্বাস ভালো কিন্তু তার প্রাবল্য উপন্যাস লেখকের পক্ষে মারাত্মক। পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস সেই উচ্ছ্বাস-হীনতার ইতিহাস। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ চল্লিশের পর সেই উচ্ছ্বাসকে স্তিমিত করতে সাহায্য করে বলেই পণ্ডিতেরা মত ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে আমার বেলায় সেই দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগের পাত্র ততদিনে এত কানায়-কানায় পূর্ণ হয়েছিল যে ছোটবেলায় যা ছিল নৈরাশ্য তা তখন বীতরাগে পরিণত হয়েছে। জীবনের ওপর বীতরাগ, কর্মজীবনের ওপর বীতরাগ, কর্তব্যের ওপর বীতরাগ, এমন কি আমার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীত বা সাহিত্যের ওপরেও বীতরাগ এসে গিয়েছিল। জীবনে আমি কী করতে চেয়েছিলাম আর কী করছি তা চিন্তা করেই দিন কাটতো।

কিন্তু আপনার ওই রকম চিঠিগুলো পেয়ে পেয়েই আবার যেন আশার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আপনার চিঠিগুলো আমার জীবনে সঞ্জীবনী-মন্ত্রের মত ক্রিয়া করলো।

আমি আবার সাহিত্য-রচনা শুরু করবো বলে চেষ্টা-চরিত্র করে একদিন কলকাতায় বদলি হয়ে এলাম। চাকরির জীবনে বলতে গেলে এও এক-রকম অসাধ্য-সাধনের মত। তবু বলবো আমার ধৈর্য-কর্মক্ষমতা-সহনশীলতা হয়ত আমার ভাগ্যদেবতাকে খুশীই করেছিল। কিংবা হয়ত অনেক যন্ত্রণা দিয়েও যখন তিনি দেখলেন যে এ-মানুষটাকে কিছুতেই জব্দ করা গেল না, রোগে-ভোগেও যখন এ ম্রিয়মাণ হলো না, এত লোভ দেখিয়েও যখন একে শায়েস্তা করা গেল না, তখন অনন্যোপায় হয়ে বোধহয় তিনি নিজেই পরাভব স্বীকার করলেন। কিংবা হয়ত আমাকে কঠিনতর অন্য এক পরীক্ষায় নামাবার জন্যে অন্য এক নতুন ফন্দি আঁটলেন।

হ্যাঁ, আমি ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। আগেই তো আপনাকে বলেছি ছোটবেলা থেকে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ঘুরতে-ঘুরতে আমার পায়ে পাখা গজিয়ে গিয়েছিল। হিন্দি-ভাষায় একটা প্রবাদ আছে—চরণমে নারদ হ্যায়। নারদ-ঋষি বোধহয় আমারও পায়ে

ভর করেছিল। নইলে কে আমায় অত ঘোরালে? এবার মনে করলাম—না, কলিকাতা পরিত্যজ্যং পাদমেকং ন গচ্ছামি। তাতে অর্থ হয়ত পাবো না, কিন্তু পরমার্থ পেয়ে হয়ত বাঁচবো।

কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কী জানি কেন গাদা-গাদা গল্পের কাঁচা মাল আমার মাথার মধ্যে গজ্-গজ্ করতে আরম্ভ করলো। আপনাকে জানাতেই আপনি বললেন ওগুলো সমস্ত 'দেশ' সাপ্তাহিকের জন্যে সংরক্ষিত থাক। এক-এক করে ছাড়বেন—

তাই-ই করতে লাগলাম। ঘটনাচক্রে কলকাতায় এসে দেখলাম সাবেক-আমলের ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীটা নতুন নাম নিয়ে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী হয়ে আমার বাড়ির পাশেই বড়লাট সাহেবের বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে। এ যেন সেই মহম্মদের কাছে পর্বতের আসা। অন্ধকার প্রাসাদ, তার ভেতরে যে অত আলো তা আগে জানতাম না। ঢালাও ব্যবস্থা সেখানে। তখন না আছে সেখানে কোনও সময়ের বাঁধা নিয়ম, না আছে কোনও রকমের কড়াকড়ি। তুমি সেখানে গিয়ে বই পড়লেই কর্তৃপক্ষ খুশী। কর্তৃপক্ষও চান যে সবাই সেখানে আসুক। তাতে তাঁদেরও চাকরি বাঁচে। তখন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী সকাল ছটা সাতটা থেকে শুরু করে রাত এগারোটা পর্যন্তও খোলা থাকতো। পরে অবশ্য সে-নিয়ম বদলালো।

'আনন্দমঠে'র গোড়াতেই একটি উপক্রমণিকা আছে। গভীর অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার মধ্যরাত্রে একজন মানুষের কণ্ঠের শব্দ উচ্চারিত হলো—আমার কি মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না?

প্রশ্ন এল—তোমার পণ কী?

—জীবনসর্বস্ব।

—জীবন তো তুচ্ছ। আর কী দিতে পারো?

উত্তর এল—ভক্তি!

বঙ্কিমচন্দ্রের উপক্রমণিকা এইখানেই শেষ।

কিন্তু আমারও মনে হলো এতদিন সাহিত্যের জন্যে সমস্তই দিয়েছি বটে, কিন্তু তবু কিছুই যেন দিইনি। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো শুধু দাসত্বেই ব্যয় করেছি। কাজ করছি এমন একটা প্রতিষ্ঠানে যার হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমার অনুপস্থিতিতে সেখানে কিছুই অচল হবার নয়। আমার উপস্থিতিও সেখানে অনিবার্য নয়। আমার উপস্থিতি ব্যতিরেকেও কর্মস্থলের

চাকা নিয়ম করে গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে। সরকারী দফতর সহস্রপদী। তাই-ই যদি সত্যি হয় তাহলে কেন সেখানে নিয়ম করে যাই? কথাটা ভাবতে গিয়ে আমিও যেন কেমন একটা মানসিক নিষ্কৃতির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। কেবল মনে হয় আমি যেখানে অনিবার্য নই সেখানে আমার অনুপস্থিতিও নিশ্চয়ই মার্জনীয়।

এই অবস্থায় আপনি একদিন বললেন—আপনি আর একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করুন—

এবার এটাই 'দেশ' সাপ্তাহিকে আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মায়ের মনে যত আতঙ্ক বা বেদনা থাকে, দ্বিতীয় সন্তানের সময় অতটা থাকে না। কিন্তু আমার বেলায় সে-নিয়ম কখনও খাটেনি। আতঙ্ক বেদনা অস্বাচ্ছন্দ্য আমার জন্মসঙ্গী। সেই বাল্যকালে যেদিন প্রথম লিখতে শুরু করেছি সেদিন থেকেই ওগুলো আছে। এতদিনে বয়েস বেড়েছে, অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞানও বেড়েছে, নিন্দায় প্রত্যাখ্যানে অবহেলায় কুৎসা পেয়ে পেয়ে মন কঠোরতর হয়েছে, কিন্তু যন্ত্রণা বেদনা যায়নি। কেন যে এত বেদনা কেন যে এত যন্ত্রণা তা আমার সৃষ্টিকর্তাই কেবল জানেন। উপন্যাস লেখার সময় আমি আগে যেমন যন্ত্রণায় কাতর হতাম, আমার এই দ্বিতীয় উপন্যাস লেখার সময় তা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, সহস্রগুণ হয়ে আমাকে চারপাশ থেকে আক্রমণ করলো। এবারে যেন আর চোখের যন্ত্রণায় আমাকে মাঝপথে উপন্যাসের সমাপ্তি না ঘটাতে হয়। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ত্রিফলার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতাম। মাত্র একটা চোখের দৃষ্টি দিয়ে কাজ, তার ওপরেই নির্ভর। 'অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়'। সুতরাং সরকারী দফতরে আমাকে কাজে ফাঁকি দিতে হয়। সংসার পরিবার সমাজ আত্মীয়-স্বজন সকলের সমস্ত দাবিকে উপেক্ষা করে আমার যাত্রা আরম্ভ করতে হয়। চারিদিকের বৃহৎ পৃথিবীর আর নিরবধি কালের দাবিটাই সামনে রেখে এগিয়ে চলি। সংসার পরে দেখবো, আত্মীয়স্বজনের কাছে অপ্রিয় হবো তাতেও পরোয়া নেই, কিন্তু নিজের ইচ্ছের পৃথিবীর দাবিটাকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবো?

তখনই 'আনন্দমঠের'র ওই 'ভক্তি'র কথাটা মনে পড়লো। জীবনসর্বস্ব পণ করলেই যথেষ্ট পণ করা হবে না। জীবনসর্বস্বের চেয়েও বড় হলো ভক্তি। সেই ভক্তি দিতে হবে। সেই ভক্তি দিতে গেলে চাই বিশ্বাস। আর শুধু বিশ্বাস নয় অটুট অকপট বিশ্বাস চাই।

দফ্তরে যাবার জন্যে সোজা বাড়ি থেকে বেরোই, কিন্তু মাঝপথে গিয়ে গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে চলে যাই লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে মনে হয় লেখক ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় সত্তা নেই আমার। সেখানে আমি স্বামী নই, পিতা নই, একজন সামাজিক মানুষও নই আমি, এমন কি তুচ্ছ সরকারী কর্মচারীও আমি নই। আমি স্বাধীন। সেখানে আমি শুধুই স্বাধীন লেখক একজন। লেখক-সত্তাই সেখানে আমার একমাত্র সত্তা। লিখতে লিখতে আমি কল্পনায় চলে যাই সেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের তের নম্বর বাড়িটার সামনে। উল্টোদিকে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটা। সেখানে দাঁড়িয়ে সংস্কার আর সংস্কার-মুক্তির সংগ্রামের শরিক হই। চোখের সামনে দেখতে পাই কলকাতা জুড়ে মানুষের ভিড় জমেছে। সে-কলকাতা আমাদের এ-কলকাতা নয়। আর এক কলকাতার আর এক রূপ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ১৬৯০ সালের জোব-চার্নকের কলকাতা তখন চেহারা বদলাতে বদলাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে পৌঁছেছে। ইংরেজরা এসে ভগীরথের সেই গঙ্গার নাম দিলে হুগলী নদী যাকে আমরা বলতাম ভাগীরথী। প্লিনির আমল থেকেই সপ্তগ্রামের পাশের নদীকেই বলতো দেবী সুরেশ্বরা গঙ্গে। তারপর উত্থান আর পতনের অমোঘ নিয়মে যেদিন সাতগাঁর পতন হলো, মাথা উঁচু করে উঠলো হুগলী, সেদিন পর্তুগীজদের কল্যাণে ভাগীরথীর নাম বদলে গিয়ে হলো হুগলী নদী। সেই কলকাতার ঊনবিংশ শতাব্দীর বুকে একদিন শেয়ালদা স্টেশনে এসে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন থামলো আর তা থেকে নামলো এক গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী। যে সন্ন্যাসীটি এই কলকাতারই ছেলে। যে সন্ন্যাসীটি আমেরিকায় যাবার সময়ে বলেছিল "I go forth to preach a religion of which Budhism is but a rebel child and Christianity is but a distant echo" লিখতে লিখতে মশগুল হয়ে যাই আর কখন যে রাত দশটা বেজে যায় খেয়াল থাকে না। লাইব্রেরীর দরোয়ান সতর্ক করিয়ে দেয়—"বাবুজী, রাত দশ বাজ গয়া—"

তখন সময়ের কড়াকড়ি ছিল না লাইব্রেরীতে। যে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে লেখাপড়া করতে পারতো। কড়াকড়ি হলো ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে। তখন রাত আটটার মধ্যেই সদর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সকলকে তখন ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা আমার সমাপ্ত হয়ে গেছে। ততদিনে আমার সেই দ্বিতীয় ধারাবাহিক উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ লিখে শেষ করে ফেলেছি।

পাণ্ডুলিপির শেষ কিস্তিটা নিয়ে আমি বাড়ি থেকে একদিন দুপুরবেলা আপনার দফতরের উদ্দেশে রওনা দিলাম। কিন্তু ক্লান্তিতে অবসাদে আমি তখন অবসন্ন। আমার পা আর চলতে চায় না তখন। সুরসপ্তকের শেষ পর্দায় এসে পৌছতেই তবলচি তেহাই দিয়ে তখন গানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে, আর গায়কও সমে এসে পৌছে তার ক্ষীণ স্বর ক্ষীণতর করে গানের শেষ রেশটুকু টেনে চারদিকের আবহাওয়ায় সুরের তরঙ্গ মিলিয়ে দিচ্ছে।

আপনি আর আপনার সহকারী জ্যোতিষ দাশগুপ্ত আপনার পাশেই বসেছিলেন। আপনারা দুজনেই আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন।

—কী হলো? চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?

মনে আছে কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোয়নি। আমি তখন নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বরহিত। কিছুক্ষণের জন্যে যেন আমিও বোবা হয়ে গিয়েছি। আমার বোধশক্তি বাকশক্তি সব কিছু যেন তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। তখন যেন চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে গেছে আমার। প্রকৃতপক্ষে তখন আমার কাঁদাই উচিত ছিল, কিন্তু তখন আমার চোখের জলও বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল এতদিন যার সঙ্গে আমি ঘর-সংসার করেছি, যে-ছিল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী, যে-ছিল একান্তই আমার নিজস্ব সম্পদ সেই 'পটেশ্বরী'কে যেন আমি হাটের সকলের নির্লজ্জ লোভাতুর দৃষ্টির সামনে নিয়ে গিয়ে নিরাভরণ করে ছেড়ে দিলাম।

আর এই দ্বিতীয় উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলাম'ই বলতে গেলে আমার কাল হলো। কাল হলো এই জন্যে বলছি যে এই উপন্যাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম যার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মনে হলো আমার ভাগ্যবিধাতার বিচারে যেন আমার ওপর অমোঘ মৃত্যুদণ্ড নেমে এল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কাগজে কাগজে ছাপিয়ে আমার কাছে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া শুরু হতে লাগলো। তাদের কারো অভিযোগ আমি শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে আত্মসাৎ করেছি, কেউ বা অভিযোগ করলেন অন্য কোনও অখ্যাত লেখক তাঁর পাণ্ডুলিপি আমাকে পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন আর আমি তা নিজের রচনা বলে চালিয়েছি। আবার কেউ বা ডাকযোগে জানিয়ে দিলেন যে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে শীঘ্রই আদালতে মামলা নথিভুক্ত হচ্ছে। একটি পত্রিকা তো সম্পাদকীয় আলোচনায় এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেল যে আয়কর বিভাগকে পর্যন্ত তারা

অনুরোধ করলে যেন অবিলম্বে আমার আয়ের হিসেব নিয়ে আমাকে দণ্ডিত করা হয়। এমন কি নিউ-থিয়েটার্স কোম্পানীর মিস্টার বি এন সরকার পর্যন্ত এই ভীতি-প্রদর্শন থেকে অব্যাহতি পেলেন না। আর প্রকাশকের দোকানেও হামলা চললো আমি কেন কোনও অভিযোগের লিখিত জবাব দিচ্ছি না। আমি যখন এইভাবে চিঠি-পত্র-পত্রিকার বন্যার স্রোতে ভাসমান, তখন আপনাদের দফতরেও অনুরূপ অভিযোগ-পত্রের স্রোত বয়ে চলেছে আর আপনি সে-সব চিঠি-পত্র দৈনিক আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ করছেন—আমি যেন সে-সব পত্রের একটারও জবাব না দিই।

জবাব অবশ্যই আমার একটা ছিল। জবাব দিতে পারতাম যে হ্যাঁ আমি আত্মসাৎ করেছি। তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে আমি আত্মসাৎ করিনি, আত্মসাৎ করেছি ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের রাগসঙ্গীত থেকে। কিন্তু এ-জবাবের মর্মার্থ কি তাঁরা তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন?

অন্যদিকে যাঁরা আমার বন্ধুস্থানীয় তারা তখন শত্রুতে রূপান্তরিত হলেন, আবার এমন অসংখ্য নতুন বন্ধুও পেলাম যারা সেই সময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কুৎসা যে এমন অশালীন হতে পারে, নিন্দা যে এত অপ্রতিহত হতে পারে, শত্রুতা যে এত অবুণ্ঠিত হতে পারে, ঈর্ষা যে এত অনাবৃত হতে পারে, আর অসম্মাননা যে এত অকরুণ হতে পারে এর আগে তা আমার এত সত্য করে আর জানা ছিল না। কিন্তু তবু বলবো সেদিন তাঁরা তাদের কুৎসা, নিন্দা, শত্রুতা, ঈর্ষা, অসম্মাননা দ্বারা আমার যে উপকার সাধন করেছিলেন তাতে আমার মঙ্গল হয়েছিল। তার জন্যে আমি তাঁদের ওপর চিরকৃতজ্ঞ। বেদনা আমি সেদিন পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু তাঁদের সেই বিযোদ্গারই যে আমাকে আবার প্রজ্ঞা দিয়েছিল তাও তো কম সত্যি নয়। সংস্কৃত 'বিদ্' শব্দ থেকেই 'বেদনা' শব্দটির উৎপত্তি। 'বিদ্' অর্থ জ্ঞান। সংস্কৃত অভিধানে দেখেছি 'বিদ্' ধাতুর সঙ্গে অন্+আ প্রত্যয় করে 'বেদনা' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা অনুগ্রহ করে অত জ্ঞান আমাকে দিলেন তার জন্যে তো তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। অথচ আশ্চর্য, তাঁরা জানতেও পারলেন না যে তাঁরা সেদিন আমাকে বেদনা দিয়ে সারাজীবন আমাকে কতখানি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রাখলেন।

তা ছাড়া নিন্দা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা আমার জানা ছিল। দীনবন্ধু

মিত্রের মৃত্যুর পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে নিন্দা ও যশ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ছিল। সেটি পাঠকদের জানা দরকার। তিনি তাতে লিখেছিলেন—"যেখানে যশ সেখানেই নিন্দা, সংসারের ইহাই নিয়ম। পৃথিবীতে যিনিই যশস্বী হইয়াছেন তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম—দোষশূন্য মানুষ জন্মে না, যিনি বহুগুণ বিশিষ্ট তাঁহার দোষগুলি গুণ সান্নিধ্য হেতু কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়—গুণের সঙ্গে দোষের চির বিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়—কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়। শত্রুগণ অন্যপ্রকারে শত্রুতাসাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ—অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম—ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম। অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।"

এ জানার পর আমার আর কী-ই বা দুঃখ থাকতে পারে?

সেদিন একজন নিরপেক্ষ পাঠক আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ এসেছে আমি তার কোনও জবাব দিচ্ছি না কেন? আমি তাকে ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। স্যামুয়েল জনসন একবার বলেছিলেন—"Every man has a right to say what he thinks truth···and every other man has a right to knock him down for it···"

কিন্তু প্রশংসা? প্রশংসাও কি পাইনি? হ্যাঁ, পেয়েছিলাম বৈকি। প্রচুর ভাবে প্রভূতভাবেই পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রশংসা স্তুতির কথা এখানে অবান্তর। কারণ প্রশংসা-স্তুতি ওগুলো আত্মসন্তোষ আনে, ওগুলো লেখকের পক্ষে মৃত্যু। ওগুলো তার চলার পথের বাধা। মনুই তো বলেছেন "সম্মানকে বিষ জ্ঞান করিবে, অপমানই অমৃত"। সুতরাং ও-প্রসঙ্গ থাক, শুধু এখানে এই প্রসঙ্গে একটা ছোট ঘটনার উল্লেখ করি।

মনে আছে এর কিছুকাল পরে একদিন আপনার দফ্‌তরে একটা জরুরী কাজে আপনি আমাকে তলব দিলেন। আমি তখনও জানি না

সে কী এমন জরুরী কাজ যে আমাকে সশরীরে আপনার দফ্‌তরে হাজির হতে হবে।

আমি যেতেই আপনি একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলপি আমাকে দেখালেন। প্রায় বারো পৃষ্ঠার অধিক সেই পাণ্ডুলিপিটি। প্রবন্ধ-লেখিকা আর কেউ নন, স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

আপনি বললেন—প্রবন্ধটি আপনার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে প্রেরিত হয়েছে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর চুরাশি বছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে 'শান্তিনিকেতনে' যে সংবর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হয় সেই সভায় প্রবন্ধটি বহু বিখ্যাত গুণীজনের উপস্থিতিতে পঠিত হয়। প্রবন্ধটির বিষয়-বস্তু নাকি আর কিছু নয়, আমার এই দ্বিতীয় উপন্যাসটিই।

আমি তো শুনে অবাক।

আপনি বললেন—প্রবন্ধটির সবটা পড়ার দরকার নেই, আপনি শুধু এর শেষ লাইনটি পড়ুন—

বলে পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাটি শুধু আপনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখলাম সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির শেষ লাইনে লেখা রয়েছে—"আমার মনে হয় লেখককে এই গ্রন্থের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।"

মনে আছে সেদিন কিছুক্ষণ আমার মুখে কোনও বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি। আমার হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি লেখিকাকে চিনি না। কোনও দিন তাঁকে দেখিওনি, এমন কি তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপও নেই। আমি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রওনই যে আমার ওপর তাঁর অনুকম্পামিশ্রিত এক ধরনের সহানুভূতির উদ্রেক হবে। আমি ভালো লিখেছি কি খারাপ লিখেছি সে-প্রশ্ন নয়। একজন নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিতা মহিলা এবং শান্তিনিকেতনের উপাচার্যের কাছ থেকে অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত এ-প্রশংসা আমার মতন সাধারণ লেখকের পক্ষে অকল্পনীয়। কিন্তু যত অকল্পনীয়ই হোক সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকরও তো বটে। জীবনে আমার সামনে আরো অনেক পথ বাকি পড়ে রয়েছে। এই যাত্রার শুরুতেই যদি এত প্রশংসা লাভ ঘটে তাহলে যে আমার সংগ্রামের পক্ষে তা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তাতে যে আমি থেমে যাব। এতে যে আমার অহঙ্কার হবে। অহংটাই তো সংসারে সব চেয়ে বড় চোর, সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রী নিজের বলে দাবি করতে কুণ্ঠাবোধ করে না—এ কথা তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন!

বললাম—আমার একটা কথা রাখবেন, আপনি দয়া করে এটা ছাপবেন না। এখন যেমন নিন্দা-কুৎসা-অপবাদ চলছে ওটা ছাপালে তা থেমে যাবে—

সেদিন আপনি আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। ওই প্রবন্ধটি আপনি আপনার পত্রিকায় ছাপেন নি। ছাপলে যে-সমস্ত উপন্যাস পরবর্তীকালে লিখেছি তা হয়ত আর লেখা হতো না। আমার কলম সেই দিনই বন্ধ হয়ে যেত। লেখক হিসেবেও হয়ত আমার মৃত্যু হতো তাতে সেই দিনই।

কৌতূহলী পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাই, এ-ঘটনার অনেক দিন পরে প্রায় দু'দশক অতীত হবার পর আপনারই অনুরোধে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সেই শেষ অপ্রকাশিত রচনাটি 'সাহেব বিবি গোলামে'র সাম্প্রতিক সংস্করণের প্রথম ফর্মায় ভূমিকা হিসেবে সন্নিবেশিত করে দিয়েছি।

কিন্তু যা হোক এর পরে আমার বইএর বিক্রি যত বাড়তে লাগলো নিন্দা-কুৎসা-অপবাদের মাত্রাও যেন ততোধিক বাড়তে লাগলো। অনুরূপ অবস্থায় ইংরেজ লেখক টমাস হার্ডি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শহর ছেড়ে সুদূর গ্রামে গিয়ে নির্বাসিত জীবনযাপন করেছিলেন। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তিরিশ বছর ধরে কবিতা ছাড়া আর কিছুই তিনি লেখেন নি। মনস্থ করলাম আমিও তাই করবো। আমি স্বেচ্ছা-নির্বাসন দণ্ড মাথায় তুলে নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে জীবন অতিবাহিত করবো। রাশিয়াতে তখন কয়েকজন বাঙালী লেখক অনুবাদকের চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার বন্ধু ননী ভৌমিক, ফল্গু কর প্রভৃতির কাছে খবর পেয়ে ভাবলাম আমিও তাদের সঙ্গী হবো। আত্মগোপনের এমন সুবর্ণ সুযোগ বোধহয় আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না। একদিন আমার এই সিদ্ধান্ত আপনার গোচরে আনতেই আপনি তীব্রভাবে নিষেধ করলেন। আপনিই সেদিন বলেছিলেন—আপনি কেন যাবেন? আপনি চলে গেলে এই উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ডগুলো কে লিখবে?

আমি বলেছিলাম—এত নিন্দা-অপবাদের পরেও আপনি আমাকে লিখতে বলছেন? আমি কি আর লিখতে পারবো?

স্বামী বিবেকানন্দকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ বলেই জানতাম, কিন্তু তাঁর এক এক চিঠিতে দেখেছি তিনি লিখেছেন, তিনি খুব ভাবপ্রবণ প্রকৃতির মানুষ। এই এখনই হয়ত তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে আকাশে উড়ছেন আর ঠিক তার পরমুহূর্তেই আবার হতাশায় পাতালে ডুবছেন। সংসারে যারা মহৎ কিছু করেছে

তারাই মাত্রাতিরিক্তভাবে ভাবপ্রবণ। স্বামী বিবেকানন্দের কথা আলাদা। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ সংসারী মানুষের মধ্যেই এমন অনেক ভাবপ্রবণ মানুষ দেখেছি যাঁরা ঝোঁকের মাথায় নিজের চরম সর্বনাশ-সাধন করেছেন, আবার ততোধিক ঝোঁকের মাথায় দেশ-দশের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রাতঃস্মরণীয়ও হয়েছেন। রাজকন্যার মুখে 'বেলা যায়' আহ্বান শুনে কোটিপতি লালাবাবুর সংসার ত্যাগ করার কাহিনী তো বহু বিদিত।

আমিও একজন তেমনি অতি-সাধারণ ভাবপ্রবণ মানুষ। অতি-সাধারণ হলেও দাসত্ব-শৃঙ্খল আমার বিশেষ মর্মপীড়ার কারণ হয়ে আমাকে যে কী নিদারুণ অস্থির করে তুলতো ভেবে দেখেছি তার অনেক কারণ ছিল। কর্মস্থানের বড়-কর্তাদের বাড়িতে-বাড়িতে তাঁদের গৃহিণীদের দ্বারা আয়োজিত চায়ের পার্টিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও নাকি আমার একটা অবশ্য পালনীয় অন্যতম কর্তব্য বিশেষ বলে তাঁরা মনে করতেন। যেহেতু স্বামীদের অধীনস্থ কর্মচারী আমি সেই হেতু যেন তাঁদের গৃহিণীরাও আমার প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ মনিব বিশেষ। আমার লেখক-সত্তার সঙ্গে আমার দাস-সত্তার একীকরণ করে তাঁরা মনে মনে প্রভুত্ব বিস্তারের কৃতিত্বে একটা পৈশাচিক আনন্দ পেতেন। তাতে কর্মস্থলে পদোন্নতির ভরসা পেয়ে আমার দাস-সত্তা যত খুশী হতো তেমনি আমার লেখক-সত্তা হতো ততো বিরক্ত। কিন্তু আমি বরাবর আমার লেখক-সত্তার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির সুযোগ গ্রহণ করে আমার দাস-সত্তার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির উন্নতি-সাধন করাকে ঘৃণার্হ মনে করতাম। আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে আমার নিজের মানসিকতার মধ্যেই সবসময়ে একটা স্ববিরোধিতার ভাব বিরাজ করে। আমার মনের গভীরে আমার Self-এর সঙ্গে পাশাপাশি আর একটা anti-self বরাবর ক্রিয়া করে। তাদের একজন যদি বলে এ সংসার মায়া তো আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে এ-সংসার স্বর্গ। একজন যদি বলে যে অর্থ অনর্থ তো আর একজন বলে অর্থ আশীর্বাদ। সারা জীবন এই দুই পরস্পর-বিরোধী সত্তা আমার জীবনে অনেক অনর্থপাত ঘটিয়েছে। সন্দেহ, ভয়, আনন্দ, প্রয়োজন, প্রীতি প্রভৃতি নানা প্রবৃত্তি যেমন আমাকে অনেকবার পথভ্রষ্ট করেছে আবার তেমনি নতুন পথের সন্ধানও দিয়েছে। একটা গ্রীক প্রবাদ আছে "Call no man happy until he is dead." শ্রীযুক্ত নিরোদ সি চৌধুরী তাঁর "The Intellectual in India" নামক গ্রন্থে কথাটার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "Don't say that anyone has survived until he is dead." তাই

জীবনে আমি কী-করেছি না-করেছি তার বিচার আমার জীবদ্দশায় না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় বলে বিশ্বাস করি।

এখানে যাঁরা আমার রচনার সমালোচক তাঁদের অবগতির জন্যেই জানিয়ে রাখি যে তাঁদের চেয়ে আমি নিজেই আমার রচনার সব চেয়ে বেশি নির্মম সমালোচক। কিন্তু আমার চেয়ে আরো নির্মম এবং আরো নিরপেক্ষ একজন সমালোচক আমার স্বগৃহেই আছেন। বই লিখলেই যেমন কেউ লেখক-তালিকাভুক্ত হন্ না তেমনি বই পড়লেই কেউ পড়ুয়াও হন না। যাঁর কথা বলছি সাহিত্য-বিচার-বোধ তাঁর সহজাত। তিনি পাস মার্কা দিলেই তবে আমি পাস এবং ফেল বললেই তবে আমি ফেল। কিন্তু তাঁর প্রতিভার পরিচয় কেউ কোনও দিন পাবে না, কেউ কোনও দিন জানতেও পারবে না তাঁর প্রকৃত পরিচয়। তিনি চিরকালই আড়ালে থেকে যাবেন। এবং বোধকরি আমার পরিচর্যা আর তুষ্টিসাধন করেই তাঁর জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবার জন্যেই তাঁর সৃষ্টি! একদিন সেই তাঁর কাছেই আমার একটা কাজের অনুমতি নেবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠলো।

তাই আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমি তাঁর কাছে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। জানিয়ে দিলাম যে সেইদিন থেকেই আমি স্বাধীন হতে চাই। তবে সিদ্ধান্তটা তাঁর অনুমতি-সাপেক্ষ। তারও একটা কারণ ছিল। কারণটা এই যে যৌবনে বিবাহের বাজার-মূল্য হিসাবে আমার মত পাত্রের মাত্র দুটি প্রত্যক্ষ গুণ ছিল। তার মধ্যে একটি হলো কলকাতা শহরের পৌর-এলাকায় আমাদের একটি ছোটখাটো পৈতৃক পাকা দ্বিতল বাড়ি আর দ্বিতীয় গুণ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নতিশীল স্থায়ী একটা চাকরি। প্রথমটি আগেই ত্যাগ করেছিলাম। এবার দ্বিতীয়টাও ত্যাগ করতে চাই। তাঁর পিতৃ-মাতৃকুলের যখন সবাই বিগত, তখন তাঁর অনুমতি বিনা সেটি ত্যাগ করতে পারি না। তা সেই অনুমতিটাও যখন এক-কথায় পাওয়া গেল তখন কোনও দিক থেকে আর কোনও দ্বিধা কোনও বাধা রইল না। আমি এক মুহূর্তে স্বাধীন লেখক হয়ে গেলাম সেইদিন সেই সকাল বেলার সেই শুভ মুহূর্ত থেকেই। স্যামুয়েল বাটলার যে-স্বাধীনতার কথা বলেছেন আমি সেই মুহূর্ত থেকে সেই স্বাধীনতাই পেলাম।

আর তখনই ভাবলাম যে বাঁচতে হলে আমি লিখেই বাঁচবো আর মরতে হলে আমি লিখেই মরবো। তখনই ঠিক করে নিলাম যে সর্ব-সময়ের বা পেশাদারি

লেখক হতে গেলে জীবনে চারটে নিয়ম আমাকে কঠোরভাবে পালন করতেই হবে। সেগুলো হলো :—

১) সংসারে বাস করেও সংযমী হয়ে নিরাসক্ত জীবন-যাপন।

২) সভা-সমিতির আক্রমণ থেকে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা।

৩) সম্মান যেখানেই লোভনীয় তার সংস্রব পরিহার।

৪) অনলস পরিশ্রম।

কিন্তু হায় রে কপাল, তখন কি জানতাম যে দুর্নীতি-নিবারক-অফিসার-হিসেবে আমি যেমন ব্যর্থ হয়েছি, দুর্নীতি-নিবারক-অফিসার হয়েও আমি যেমন দেশের কোনও উপকার করতে পারিনি, লেখক হিসেবেও একদিন আমি তেমনিই ব্যর্থ হবো। লেখক হিসেবেও আমি মানুষের বা সমাজের বা সাহিত্যের কোনও উপকারেই আসবো না! নইলে এত মানুষ থাকতে আমার নাম চুরি করেই বা বাজারে এত জাল-বইএর ঢালাও কারবার কেন? প্রায় দু'শো উপন্যাস যে বাজারে 'বিমল মিত্র' নাম-যুক্ত হয়ে চলছে তাতে কি এই-ই প্রমাণ করে না যে আমার পৈত্রিক নামটা পর্যন্ত মুনাফার দৃষ্টিতে লাভজনক? কিংবা হয়ত সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের এক বৃহৎ মাপকাঠি'!

আমার যন্ত্রণা-বেদনার কথা আগেই বলেছি। জ্ঞান থেকেই বেদনা। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যতক্ষণ আমার জ্ঞান আছে ততক্ষণ আমার যন্ত্রণা বেদনা থাকবেই।

কিন্তু সুখ? সুখও কি পাইনি?

পেয়েছি বইকি। অপার সুখও পেয়েছি। সেই সুখের কথা না বললে আমার এই বিশ্বাসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি দিনের পর দিন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সামনে বসে রাগসঙ্গীত শুনে সুখ পেয়েছি। রবিশঙ্করের সেতার আর বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের শানাই শুনে সুখ পেয়েছি। সায়গলের পাঞ্জাবী তরকিফ দেওয়া গজল আর হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে সুখ পেয়েছি, পরেশ ভট্টাচার্যের তবলা-সঙ্গতের সঙ্গে শচীন দেববর্মনের গাওয়া অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে' গান শুনে সুখ পেয়েছি। আর সুখ পেয়েছি পান্না ঘোষের আড়-বাঁশীতে পিলু-বাঁরোয়ার আলাপ-তান-লয় যুক্ত ঠুংরি শুনে। এর চেয়ে বেশি সুখ আর পৃথিবীতে কী-ই বা আছে? 'শুক্লপক্ষ হতে আনি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি

যে পারে সাজাতে কৃষ্ণপক্ষ রাতে' সেই-ই একমাত্র সুখী। সুখ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা আমি মনে-প্রাণে মানতে চেষ্টা করেছি। লিখতে লিখতে যখন হঠাৎ কলম আটকে এসেছে, যন্ত্রণায় বেদনায় যখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে, নিজেরই সৃষ্টিকরা গল্পের জটিল জালে জড়িয়ে গিয়ে যখন প্রাণপণে মুক্তির পথ খুঁজেছি, যখন গল্পের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর প্রেতাত্মারা আমাকে তাড়না করে আমার মধ্যরাত্রের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আর তার জন্যে যখন অত্যন্ত প্রিয়জনকেও অকারণে অপ্রিয়ভাষণ শুনিয়েছি, অর্থাৎ যখন আমার চারপাশের এই সুন্দর পৃথিবীটাও আমার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে, তখন ওই ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, রবিশঙ্কর, বিসমিল্লা খাঁ সাহেব, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, পান্না ঘোষের সামনে বসে গান-বাজনা শোনার সেই সব দিনগুলোর কথা স্মরণ করে সুখ পেয়েছি। কখনও ভৈরবীর সেই কোমল নিখাদ, ভূপালীর সেই শুদ্ধ গান্ধার, মালকোষের সেই মধ্যম আর ইমন-কল্যাণের সেই কড়ি মধ্যমের আর হাম্বীরের সেই একখানা যুৎসই ধৈবৎ-এর অনাবিল সমুদ্রে আত্ম-অবগাহন করেই আমি সুখ পেয়েছি। গান গাইবার ক্ষমতা আমার নেই। তা না-ই বা থাকলো। গান শুনতে তো আমি ভালবাসি। গান শুনেই তো আমি ব্রহ্মস্বাদ পাই। আর ব্রহ্মস্বাদই তো সুখের চরম স্তর। অবাঙমনসোগোচর সুখ।

স্যামুয়েল বাটলারের কথা দিয়েই এই রচনা শুরু করেছিলাম। সেই যে যিনি বলেছিলেন, "Independence is essential to permanent but fatal to immediate success"। তাঁর শুরুটাই বলেছি কিন্তু শেষটা এবার বলি। তিনি তো ১৯০২ সালে মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর নিজের সম্বন্ধে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো ১৯৩১ সালে যখন হঠাৎ তাঁর রচনাবলী বার্নার্ড শ'র নজরে পড়লো। নজরে পড়তেই বার্নার্ড শ' তাঁর সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেই প্রবন্ধ লেখার পর থেকে স্যামুয়েল বাটলারের সমস্ত রচনা যা তাঁর জীবদ্দশায় এক-কপিও বিক্রি হয়নি তা তখন সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হতে লাগলো। তাঁর সম্বন্ধে অসংখ্য সমালোচনা-গ্রন্থ লেখা হতে লাগলো। সেই যে তাঁর সম্বন্ধে গবেষণা হতে লাগলো তা আর বন্ধ হলো না। এখনও তাঁর সম্বন্ধে গবেষণা-গ্রন্থ লেখা হচ্ছে। স্বয়ং বার্নার্ড শ'র গুরু-স্থানীয় বলে তিনি স্বীকৃতি পেলেন। "ওয়ান হানড্রেড্ ক্লাসিকস" বলে ইংরেজি ভাষায় যে

গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর "দ্য ওয়ে অব্ অল্ ফ্লেশ" উপন্যাসটি সন্নিবেশিত হবার গৌরব অর্জন করেছে।

আপনি লিখেছিলেন, "যে-উপন্যাস প্রথম পাঠক-মহলে প্রভূত আলোড়ন ও সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল সেই উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বের এবং প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী আজকের কৌতূহলী পাঠকদের কাছে সবিস্তারে তুলে ধরবার অনুরোধ জানাচ্ছি।"

মনে হয় হয়ত সবিস্তারেই আমি তা বলতে পেরেছি।

আপনার শেষ প্রশ্ন : কোন্‌টি আমার এতাবৎকালীন রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ-প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব? যে-ভূতটা আমার মত একজন অলস-কর্মবিমুখ লোককে দিয়ে একটি চোখের সাহায্যে এত মোটা মোটা বই লেখালে, এত বেগার খাটালে, সেই তাকে যদি কোনওদিন কোথাও কখনও খুঁজে পাই তো তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত সে এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। আমি কেউ না। আমি বিশ্বাস করি আমি শুধু কারক, কর্তা সেই ভূতটা।

আর একটা কথা।

ওই ব্রহ্মস্বাদের কথায় ব্রহ্মসঙ্গীতের কথাও মনে পড়লো। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট-এর বাড়িটা থেকে বেরিয়েছি বাড়ি ফিরবো বলে। হঠাৎ সামনে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটার বাইরে দেখি অনেক গাড়ি অনেক লোক-জনের আনাগোনা। বুঝলাম সেখানে মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান চলছে। কী জানি কী ভেবে আমিও মন্দিরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু ভাগ্যিস সেদিন সেই মন্দিরে প্রবেশ করেছিলাম। তখন সেখানে ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে—

আমার বিচার কর তুমি তব আপন করে
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে,
আমার বিচার কর তুমি তব আপন করে।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম-বিমুখ

পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে
আমার বিচার কর তুমি তব আপন করে।

সেই চল্লিশ বছর আগেকার কথা আজ এতদিন পরে মনে পড়বার একটা সঙ্গত কারণও আছে। আজ আমারও দিনের কর্ম শেষ হয়ে এল। আমারও আজ শেষ-স্বীকারোক্তি করবার লগ্ন এল। আজ আমিও আমার দিনের কর্ম-সম্ভার নিয়ে তোমাকে নিবেদন করতে এসেছি। আমিও বিচার-প্রার্থনা করছি তোমার কাছে। আমি যদি কখনও প্রীতির চেয়ে প্রয়োজনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি, যদি কখনও চিরকালটার চেয়ে ক্ষণকালটাকেই বেশি প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, যদি শারীরিক ক্লান্তির জন্যে কখনও কর্তব্যচ্যুত হয়ে থাকি, পরমার্থকে অস্বীকার করে অর্থকে গুরুত্ব দিয়ে যদি কখনও সাহিত্যকে পণ্য করে থাকি, সাহিত্যের জন্যে জীবন-সর্বস্ব দেবার ব্যাপারে ভক্তির বদলে বাইরের পৃথিবীর চাপে যদি কখনও আপোস করে বাঁচবার চেষ্টা করে থাকি, যদি সাহিত্যকে কখনও কার্যসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি, কিংবা পরের অখ্যাতিতে যদি কখনও মনের কোণে এক বিন্দুও তৃপ্তি পেয়ে থাকি তো তুমি আমায় ক্ষমা কোর না, তুমি আমার বিচার কোর। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু আমার বিচার-প্রার্থী। তোমার বিচারের নিঃসঙ্কোচ নিরপেক্ষতায় আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। ইতি—২৭শে মার্চ ১৯৭৫ ॥ দোল-পূর্ণিমা ॥

আমার সাহিত্যের অন্তরালে

উনিশ-শো তিরিশ সালের কথা। আমেরিকাতে বই-এর বাজারে খুব মন্দা চলছে। লেখকদের তখন উপোস করার অবস্থা। এক-একজন লেখক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে। একটার পর একটা প্রকাশকের দোকানে যায় আর হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসে।

প্রকাশকরা ভাল করে কথাও বলে না।

—আজ্ঞে, একটা বই ছাপবেন ?

প্রকাশক মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে—কী বই ?

—আজ্ঞে, একটা উপন্যাস। খুব খেটে লিখেছি। আপনি ছেপে দেখুন, খুব বিক্রি হবে—

অনেক পীড়াপীড়ির পর ভদ্রলোক বলে—আচ্ছা রেখে যান, দেখবো। ছ'মাস পরে এসে খবর নেবেন—

এ হচ্ছে সেই যুদ্ধপূর্ব যুগের কথা। তখন পৃথিবীর বাজারে আগুন লেগেছে। চরমে উঠেছে সাহিত্যিক আর শিল্পীদের দুরবস্থা। চাল, ডাল, মাছ, মাংস, লোহা, সিমেণ্ট না কিনলে নয় তাই কেনে। কিন্তু বই কিনবে কে ? কার এত মাথা ব্যথা ! বিশেষ করে গল্প উপন্যাসের বই ?

গ্রাহাম গ্রীণ বলে একজন তখনকার দিনের লেখক। এখনও বেঁচে আছেন। এখন নাম হয়েছে, বিত্ত হয়েছে, গাড়ি-বাড়ি প্রতিষ্ঠা প্রতিপ্রত্তি সব কিছু হয়েছে। কিন্তু সেই বিংশ শতকের তিরিশের দশকে তখন প্রায় তাঁর উপোস করবার অবস্থা। তিনি তখন তাঁর ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ামই দিতে পারছেন না। তখন বি-বি-সি হয়নি। সরকারী কোনও ব্যবস্থাও নেই লেখকদের দিকে নেক-নজর দেবার। বাড়িতে বসে একটার পর একটা করে এগারোখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। প্রথম বই ছাপা হয়েছিল পঁচিশশো কপি। আর

যখন একাদশ সংখ্যক বইটি লিখলেন তখন মাত্র তিন হাজার কপি প্রথম সংস্করণে ছাপা হলো। তখন ভাবছেন কী করে সংসার চলবে। লটারীর টিকিট কেনেন প্রত্যেক বছর। তাতেও যদি একবার তাঁর কপালে কিছু ফাঁকা টাকা এসে যায়।

অথচ পত্র-পত্রিকায় সমালোচকরা গ্রাহাম গ্রীণকে বেস্ট-সেলার বলে রায় দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কী হবে? বেস্ট-সেলারের লেখকই যে খেতে পায় না সেই ত্রিশের দশকে। সুতরাং সাধারণ লেখকদের দুর্দশার কথা তো কল্পনাই করে নেওয়া যায়।

বাংলাদেশে সাধারণত যারা লেখক পর্যায়ভুক্ত তাঁরা বেশির ভাগই কোনও না কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তাঁরা অবসর সময়ে লেখেন। অবসর সময়ে ছাত্র না পড়িয়ে সেই উপার্জনটা গল্প উপন্যাস লিখে উপরি উপায়ের একটা বাড়তি পথ বার করেন। এই জাতীয় বেশির ভাগ লেখকই একটা বিষয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত যে তাঁদের লেখা ভালো হোক আর মন্দ হোক, তাঁদের লেখা বিক্রি হোক আর না হোক, কিছু টাকা তাঁদের আসবেই। তা যত সামান্যই হোক। আর যেহেতু সেটা উপরি আয় সেই হেতু ফাউ। ফাউটা ফাউ-ই। সেটার অঙ্ক বা কৌলীন্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

ঠিক এই অবস্থাই একদিন হয়েছিল ওদের দেশে। সাহিত্য-ব্যবসাকে জীবিকা করে সংসার চালানো যে কী কঠিন তপশ্চর্যা সে সম্বন্ধে পৃথিবীর সব দেশের লেখকেরই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আছে। বিশেষ করে গ্রাহাম গ্রীণ-এর মত জনপ্রিয় লেখককেও যখন এককালে এগারোখানা বই লেখার পরেও অর্থাভাবে ভুগতে হয় তখন বাংলাদেশের মত দরিদ্র অঞ্চলের লেখকদের দুর্দশা সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। এদেশে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেও শরৎচন্দ্রকে শেষ জীবনে সিনেমার দাক্ষিণ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

মনে আছে শরৎচন্দ্রের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীঅবিনাশ ঘোষালের কথা।

অবিনাশ ঘোষাল ছিলেন তখনকার দিনের সিনেমার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' সম্পাদক। আমার ছাত্র-জীবনে বাতায়ন কার্যালয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে। লেখা ছাপানোর জন্যে নয়। সন্ধ্যেবেলা যখন অফিসের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত, যখন সবাই বিদায় নিত, তখন অবিনাশ ঘোষাল ও আমি বসে বসে গল্প করতাম। আমি তাঁর মুখে সে যুগের সাহিত্যিক-দের গল্প শুনতাম। আমি তখন একজন ভাবী সাহিত্যিক। অনেক বিখ্যাত

সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। যেমন প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

শরৎচন্দ্রের কথাই বলি।

'দেবদাস' উপন্যাসটি নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী ছবি করবার জন্যে কিনেছিল এই অবিনাশ ঘোষালের মধ্যস্থতাতেই।

যেদিন চুক্তি হবে তার আগের দিন অবিনাশ ঘোষাল গেছেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে।

শরৎচন্দ্র অবিনাশ ঘোষালকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? কত দাম ঠিক হলো?

অবিনাশ ঘোষাল বললেন—সাত হাজার!

সাত হাজার! সেদিন অবিনাশ ঘোষাল যতটা না অবাক হয়েছেন, তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কাছে গল্পের দাম হিসেবে সাত হাজার টাকা পাওয়াটা এক অভাবনীয় ঘটনা। অত টাকা একসঙ্গে কখনও শরৎচন্দ্র আগে আর হাতে পাননি। সেদিন সিনেমার দাক্ষিণ্য না পেলে হয়ত শরৎচন্দ্রের কলকাতায় বাড়ি করাও হতো না, গাড়ি করাও অসম্ভব হতো।

তারপর শরৎচন্দ্রের কাল অনেকদিন হলো কেটে গেছে। পৃথিবীর বাজারে দুর্ভিক্ষ এসেছিল একদিন, যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে সে দুর্ভিক্ষ কেটে গেল। শরৎচন্দ্র মারা গেলেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও মৃত্যু হলো যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে ১৯৪১ সালে। কিন্তু শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীরাই হিসেব দিতে পারেন তাঁদের সাহিত্য বিক্রি করে সিনেমা থেকে তাঁরা কত টাকা উপার্জন করেছেন, এবং সাহিত্য প্রচারেই বা কতখানি সহায়তা পেয়েছেন।

ঠিক এই হলো গ্রাহাম গ্রীণের বেলায়।

গ্রাহাম গ্রীণ তখন এগারোখানা বই লিখে ফেলেছেন। প্রত্যেকটা উপন্যাস আড়াই হাজার, তিন হাজার করে কপি ছাপানো হয়েছে। কাগজে কলমে পত্র-পত্রিকার পাতায় তাঁর নাম বেশ ফলাও করে ছাপাও হয়। এক ডাকে তাঁর নাম জানে লোকে। কিন্তু টাকা-পয়সা হাতে বেশি আসে না। কারণ দেশে তখন আকাল।

হঠাৎ যুদ্ধ বাধলো ১৯৩৯ সালে।

আর ঠিক তার সাত বছর আগে ১৯৩২ সালে একদিন আমেরিকা থেকে একটা চিঠি এল তাঁর কাছে।

চিঠিতে তাঁর আমেরিকার এজেন্ট লিখেছে যে তাঁর "Stanbul Train" নামে উপন্যাসটা হলিউডের 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি ফক্স' কোম্পানী ছবি করবে বলে কিনতে চায়। কত দর বলবো? তিনি কত চান?

লেখকের অবস্থা তখন প্রায় শোচনীয়। 'ইস্তানবুল ট্রেন' তাঁর চতুর্থ উপন্যাস। হাতে তখন একটা পয়সা নেই। বাক্সের ঝুলিতে তখন মাত্র শেষ কটা টাকা পড়ে আছে, সেটাই ভরসা। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর সন্তান হবার সম্ভাবনা আছে। তখন একটা মোটা রকমের খরচার ধাক্কা আছে। চাকরি একটা পাবার আশাও ছিল। 'দি ক্যাথলিক 'হেরল্ড্' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের চাকরি। কিন্তু তাতে বিপদ ছিল এই যে সে-চাকরি নিলে উপন্যাস লেখবার আর সময় পাওয়া যেত না।

গ্রাহাম গ্রীণের অবস্থাটা হলো ঠিক শরৎচন্দ্রের মতন।

এত টাকা?

কিন্তু যখন হলিউড থেকে চুক্তিপত্রটা এল তখন সেটা পড়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। চুক্তিটা এমন যাকে বলা যায় একেবারে চিরস্বত্ব বিকিয়ে দেওয়া। তোমার গল্প তোমার থাকবে না। আজীবন সে-গল্পের স্বত্ব ভোগ করবে ফিল্ম কোম্পানী। এমন কি, তোমার উপন্যাসের নামটি পর্যন্ত ছবিতে বদলে দিতে পারি ইচ্ছে করলে। তোমার গল্পটি ট্র্যাজেডি, কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা সেটাকে কমেডি করে দিতেও পারি। নায়ক-নায়িকার নাম পর্যন্ত বদলে দেবার অধিকার আমাদের রইলো। সমস্তই আমাদের এক্তিয়ারে। তার বদলে তোমাকে শুধু আমরা থোকথাক মোটা টাকা দিয়ে দিলাম।

ভাগ্যটা খারাপ, কিন্তু তবু তিনি ওই অপমানকর চুক্তিতে সেদিন সই করে দিলেন। সই না করলে অন্য কোনও গতিও ছিল না। তখন অত টাকা একসঙ্গে তাঁকে কে দেবে?

তারপর এল আর একটা চান্স। ১৯৩৪ সালে।

ঠিক ওই রকম চিঠি। ঠিক ওই রকম চুক্তিপত্র।

এমনি করে একটার পর একটা তাঁর গল্পের ছবি হতে লাগলো। বেশ টাকা আসতে লাগলো। কিন্তু ছবি দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠলো। এ কি, এ গল্প তো তাঁর লেখা নয়! এ কথা তো তিনি লেখেননি! অথচ ছবিতে শুরুতে ছোট

ছোট অক্ষরে তাঁর নাম-লেখা রয়েছে ! লেখা রয়েছে তাঁর উপন্যাস অবলম্বনেই ছবিটি তৈরি হয়েছে !

কিন্তু মনের দুঃখ তিনি মনেই চেপে রইলেন। কারণ তাঁর ধারণা হলো তাঁর গল্পের চেয়ে টাকার দাম অনেক বেশি। টাকাটা না পেলে তিনি উপোস করতেন। সেই টাকা যাঁরা তাঁর প্রয়োজনের দিনে তাঁকে দিয়েছে, তাঁদের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। মনে মনে এই ভেবেই সান্ত্বনা পেলেন যে, যাক্ ছবি তো দুদিনের। দুদিন পরেই লোকে ছবির কথা ভুলে যাবে। তাঁর গল্প চিরস্থায়ী। যতদিন ছাপানো বইতে তাঁর গল্প রয়েছে ততদিন তাঁর পরমায়ু। সে পরমায়ু থেকে তো কেউ তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

তবে সিনেমায় গল্প হওয়ার একটা সুবিধে এই যে ওই কয়েক হাজার টাকার জন্যে আরো কিছুদিন লড়াই করা যায়, আরো একটা দুটো বই লিখতে পারা যায় নিশ্চিন্ত হয়ে।

এই জন্যেই প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের উচিত সিনেমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। তিনি লিখেছেন—"I repeat that I am grateful to the cinema. It made twenty years of my life easier."

কিন্তু এ-সব তো আমার পড়া কথা। বই পড়ে এই সব জেনেছি। আর শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি তা শুনেছি অবিনাশ ঘোষাল আর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যএর কাছে।

সাধারণত আমি এমন এক চরিত্রের মানুষ যে সহজে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিলতে মিশতে পারে না। আসলে আমার ভয় করে। অন্য কিছুর জন্যে নয়, শুধু ভয় এই জন্যে যে যদি আঘাত পাই অজান্তে ?

সিনেমার লোক সম্বন্ধে তাই আমার আরো বেশি ভয় ছিল। ভাবতাম তারা এক একজন এক একটি স্নব। আমি যে-আদর্শে যে-আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি, তার সঙ্গে স্নবারি ঠিক খাপ খায় না।

শুনেছি শেষ জীবনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প উপন্যাস সিনেমায়িত করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সিনেমার লোকজনদের বলতেন—আচ্ছা আমার 'পথের পাঁচালী'কে সিনেমা করতে পারেন না আপনারা ?

যে ধরনের লোকেদের তিনি অনুরোধ করতেন তারা সেই স্নব পর্যায়ভুক্ত। ওরা হাসতো।

তারা বলতো ও-গল্প সিনেমা হয় না।

বিভূতিবাবু বলতেন—কিন্তু শরৎবাবুর 'দেবদাস' তো হয়েছে। আমার 'পথের পাঁচালী' কি 'দেবদাস'এর চেয়ে খারাপ কিছু?

তারা বলতেন—কী যে বলেন! শরৎচন্দ্র আর আপনি? আপনার 'পথের পাঁচালী'তে ড্রামা কোথায়?

বিভূতিবাবু ভালো মানুষ। ভদ্রলোক। ভাবতে বসলেন তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে ড্রামা আছে কিনা। ড্রামা আসলে কাকে বলে তাও ভাবতে লাগলেন। ড্রামা থাকাই যদি সিনেমার গল্পের প্রধান গুণ হয় তো সেই ড্রামা দিয়েই গল্প লেখবার কথা ভাবতে লাগলেন। ড্রামা সম্বন্ধে বই পড়তে লাগলেন। কিন্তু তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে ড্রামা নেই একথা তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপর তখনকার দিনের বিখ্যাত পরিচালক দেবকীকুমার বসুর কাছে গেলেন।

বিভূতিবাবু বললেন—আপনি এত ছবি করছেন, আমার 'পথের পাঁচালী'টা একবার ছবি করে দেখুন না। ওটা কি ছবি হয় না?

দেবকী বসু মশাই বললেন—বইটা আর একবার পড়ে দেখতে হবে।

বিভূতিবাবু একদিন বইটা গিয়ে দিয়ে এলেন তাঁকে। তারপর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন! আশা করেন একদিন চিঠি আসবে কোনও ফিল্ম কোম্পানীর অফিস থেকে। তারা লিখবে—আপনার পথের পাঁচালী উপন্যাসটা আমরা ছবি করতে চাই, আপনি কত টাকা নেবেন। পত্রপাঠ জানাবেন—ইতি।

কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর কেটে যায়, কোনও খবর আসে না কোথাও থেকে। দেবকীকুমার বসুর কাছ থেকেও কোনও চিঠি আসে না। তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। টাকাটার কথা বড় কথা নয় বিভূতিবাবুর কাছে। টাকার বেশি প্রয়োজন নেই তাঁর। তাঁর একজোড়া জুতো, দুটো পাঞ্জাবি আর একজোড়া মোটা ধুতি হলেই বছর চলে যায়। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের ছবি হওয়া চাই। কারণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ছবি হয়েছে। 'দেবদাস'এর কথা সকলের মুখে মুখে। তারা সবাই নিজেরাই যেন মূর্তিমান দেবদাস আর পার্বতী। তাঁরও ইচ্ছে হতো 'পথের পাঁচালী'র অপু আর দুর্গার কথাও লোকে তেমনি মুখে মুখে আলোচনা করুক। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার আঁটা হোক। সেখানে বড় বড় করে রঙীন কালিতে ছাপা থাকুক—'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'।

নিজের কল্পনার সৃষ্টিকে বাস্তবে দেখবার লোভ বড় প্রবল লোভ। এ লোভ অশোভন নয়। শিল্পী মাত্রেরই এ-লোভ থাকে। শরৎচন্দ্রের ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল।

স্বর্গীয় মধু বসুর কাছে শুনেছি—তিনি তখন 'দালিয়া' গল্পের চিত্রনাট্য শোনাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— মধু, তুই আমার 'শেষের কবিতা'টার সিনেমা কর না। ওটা তোদের সিনেমাতে ভাল হবে।

বাঙলা সিনেমার জগতে বাঙলা সাহিত্যের অবদান কতখানি তা নিয়ে এখনও কোনও গবেষক কোনও গবেষণা গ্রন্থ লেখেন নি। ওরা চেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পের ছবি হোক। ছোটবেলায় পড়া সেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের ছবি হোক। তারপর আজ এই ১৯৬৭ সাল। যেখানে এসে ঠেকেছি, সেখানে একটা যুগের প্রথম পরিচ্ছেদ বলা চলে। কিন্তু এ ইতিহাস কে লিখবে? কে লিখবে সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' নিয়ে সিনেমার ডাইরেকটারদের অনুরোধ-উপরোধ করার কাহিনী?

শেষে একদিন আর থাকতে পারলেন না। গেলেন দেবকীকুমার বসুর বসন্ত রায় রোডের বাসা বাড়িতে, গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন। ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিলে।

বিভূতিবাবু জিজ্ঞেস করেলেন—দেবকীবাবু বাড়ি আছেন?

ভৃত্যটি জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম?

সাহিত্য গিয়ে সিনেমার দ্বারস্থ হয়েছে—এ ঘটনা এই-ই প্রথম। যতদূর মনে পড়ে ১৯১০ সাল থেকেই সবাক চিত্রের জন্ম। তখন থেকেই দেখা গেছে সিনেমাতে সাহিত্যের একটা আংশিক স্থান আছে। সেই আংশিক স্থান পূরণের জন্যে সিনেমা বার বার সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছে! সিনেমা তৈরি করতে গেলেই একটা মোটামুটি গল্প চাই। সেই গল্পের দাবি মেটাবার জন্যেই গল্প লেখকদের কাছে যেতে হয় সিনেমা-কারকদের। সে-যুগে অর্থাৎ সিনেমার সেই আদি যুগে পৌরাণিক কাহিনী, কোনও ধর্মগুরুর জীবনী, কিংবা কোনও ক্লাসিক সাহিত্যই ছিল সিনেমা-কারকদের একমাত্র অবলম্বন। উদাহরণ হিসেবে 'কংস বধ', 'সন্ত তুকারাম' কিংবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর নাম করা যায়।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছবির কে পরিচালক ছিলেন, কে বা প্রযোজক, আর কে-ই বা কামেরাম্যান, তা কারো মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু ওই নামটা

মনে আছে। ওই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। তা থেকেই বোঝা যায় ছবি যেমনই হোক গল্পটাই প্রধান। সে প্লটহীন গল্পই হোক আর সস্তা গল্পই হোক। গল্পের তো রকমফের আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গল্পকাররা গল্প নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। সবাই চাইছেন একটা নতুন কিছু করতে। ফ্রান্সই বোধহয় এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী। সেখানে সাহিত্য সিনেমা ছবি সব ব্যাপারেই একটা না একটা হুজুগ লেগে আছে। গতানুগতিক পথে কেউ-ই চিরদিন চলতে চায় না। সেখানকার সরকার বা মন্ত্রীত্ব যেমন ক্ষণস্থায়ী, শিল্পও তাই। প্রতিদিনই সকালবেলা একটা করে মতবাদ গজিয়ে ওঠে আবার সন্ধ্যে-বেলাতেই সেই মতবাদটা মুছে যায়।

কিন্তু আসল ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন অদল-বদল হয়নি। যে মানুষ বা যে শিল্পী সেই মূল ব্যাপারটি অস্বীকার করেছে, সে সাময়িকভাবে একটা হৈচৈ তুলতে পারলেও একদিন নিঃশেষে তা বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে।

শিল্পের ভাষায় সেই আসল ব্যাপারীর নাম এক কথায় যাকে বলে ধ্রুব।

এই ধ্রুব কথাটা বড় গোলমেলে। এটার ব্যাখ্যা দরকার। ব্যাখ্যা দরকার এই জন্যে যে আধুনিকটাই ভালো—আর চিরকালেরটা সেকেলে—এইটে বলাই আজ ধর্ম হয়ে উঠেছে।

বোম্বাই প্রদেশে, মানে এখনকার মহারাষ্ট্রে গিয়ে দেখেছি যখনই 'সন্ত তুকারাম' ছবিটা কোথাও দেখানো হয়, সেখানে ভিড়ে ভিড় হয়ে যায় দর্শকের। 'সন্ত তুকারাম'এর বেলায় কেউ আধুনিক কিংবা সেকেলের নিয়ম মানে না।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা দীর্ঘ কোটেশন বা উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হলাম। সেজন্যে আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। কারণ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ এ-যুগের সিদ্ধিদাতা গণেশ।

সেই সিদ্ধিদাতা গণেশের কথাগুলো একবার শুনুন।

"ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমন্বয়েই রসের ওজন ঠিক থাকে। কাব্যে ও মানব জীবনেও দূরকাল ও বহুজনকে যে-সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ-সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না। তা যদি হয় তাহলে সেই আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ

করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।"

আজকালকার সিনেমাতেও সেই আধুনিক হওয়ার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। আজকালকার সাহিত্যের সঙ্গে আজকালকার সিনেমারও সেইখানে একটা মিল আছে বলেই কথাটা বলতে হলো। সাহিত্য বা সিনেমা দুটোকেই যদি শিল্প হিসেবে ধরা যায় তাহলে দেখতে হবে সেই সাহিত্য বা সিনেমার মধ্যে সেই আয়ু কি আছে? দেখতে হবে ১৯৯০ সালেও সে-বই কেউ পড়বে কি না, বা সেই ছবি কেউ দেখবে কি না। যদি পড়ে কিংবা দেখে তাহলে বুঝতে হবে তা আধুনিক হয়েও ধ্রুব। তার পরমায়ু অশেষ।

আমি নিজে অন্তত শিল্প বিচারে সেই মানদণ্ডই ব্যবহার করি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল করেছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর 'পথের পাঁচালী' বিরাট সাহিত্য। তাহলে তিনি সিনেমা পরিচালকের বাড়ি গিয়েছিলেন কেন?

সিনেমা পরিচালকের গৃহ-ভৃত্য যখন তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তিনি সহজভাবেই নিজের নাম বলেছিলেন। কিন্তু গৃহ-ভৃত্য বললে—তিনি তো বাড়ি নেই।

বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সিনেমার বহু সৌভাগ্য যে সেদিন দেবকীকুমার বসু বাড়িতে ছিলেন না। থাকলে আজ কী দুর্ঘটনা ঘটতো তা ভাবতেও ভয় হয়।

রাজনীতি, সিনেমা এবং স্পোর্টস—এই তিনটেরই এমন একটা গ্ল্যামার আছে যা সাহিত্যের নেই। রাজনীতি, সিনেমা, স্পোর্টস এই তিনটে বিষয়েই প্রতিদিনকার খবরের কাগজের খোরাক। ও তিনটি না থাকলে খবরের কাগজই কেউ কিনতো না। অনেক বাড়িতে দেখেছি খবরের কাগজ এলে বাড়ির কর্তা রাজনীতির খবর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, গৃহিণী সিনেমা আর ছেলে স্পোর্টস।

এর মধ্যে সাহিত্যের স্থান নেই।

আর এই গ্ল্যামার নেই বলেই সাহিত্যের আবেদন সুদূর প্রসারী। সেক্সপীয়রের জন্মের তিনশো বছর পরে জার্মানীতে প্রথমে তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু সিনেমার বেলাতে কি এটা সম্ভব?

কিন্তু তবু সাহিত্যিকদের কাছে সিনেমার একটা উপকারিতা আছে। সেটা আধ্যাত্মিক উপকার নয়, আর্থিক উপকার। সাহিত্যিকদেরও খেতে পরতে

হয়, সাহিত্যিককেও এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালাতে হয়। নিতান্ত ভিক্ষায় দিন চলে না।

গ্রাহাম গ্রীণ নিজের জীবনের সেই কাহিনী সবিস্তারে বলেছেন। আজকের দিনের বাঙালী সাহিত্যিকদের সে-কাহিনী জানা ভালো। কারণ বাঙালী সাহিত্যিকদের অনেকেই আজ সিনেমা উপযোগী করে তাঁদের গল্প উপন্যাস লিখছেন। সে ভাবে গল্প উপন্যাস লেখা ভালো কি মন্দ সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। কারণ সেটা সাহিত্য-প্রসঙ্গ। আর আমি এখানে লিখছি সিনেমার গল্প।

এই বাঙলাদেশে কোনও সাহিত্যিক যখন সিনেমায় গল্প বিক্রি করেন, তখন সাধারণত তার একটা মেয়াদ থাকে। যেমন পাঁচ বছর কি সাত বছর, কি দশ বারো বছর। হিন্দী ফিল্মেও তাই। অন্তত কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁরা সেইরকম চুক্তিই করেন।

কিন্তু হলিউডের নিয়ম আলাদা। তারা চান চিত্রের চিরস্বত্ব। দশ বারোটা পাতা ভর্তি চুক্তির সর্ত। অত সর্ত পড়ার সময় ও ধৈর্য বেশির ভাগ লেখকেরই থাকে না। সব পড়ে বুঝতে গেলে উকীল এটর্নীর সাহায্য লাগে। তাতেও মোটা খরচ আছে। তার চেয়ে চোখ বুজে মোটা অঙ্কের চেক পকেটে পুরে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

গ্রাহামএর সেই অবস্থাই হলো।

প্রথম ছবিটা বিক্রি হলো দেড় হাজার পাউণ্ডে। তার দুবছর পরেই এল আর একটা সুযোগ। তাঁর বই 'এ গান্ ফর সেল' উপন্যাসটার চিত্রস্বত্ব বিক্রি করে পেলেন আড়াই হাজার পাউণ্ড।

টাকাটা খুবই কম, কিন্তু তাতে কী? সেই টাকাতে তো আরও কিছুদিন বেঁচে থাকা যাবে। আরও দু-একখানা বই লেখা যাবে।

সাহিত্যিকের জীবনে সিনেমার দাক্ষিণ্য যে কত বড় সহায়ক তা শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ছবি বিক্রির ব্যাপারে আগেই বলেছি।

কিন্তু ছবি দেখে গ্রাহাম সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ। এ কার গল্প? এ গল্প কি তাঁর লেখা? ছবির পরিচালক সমস্ত গল্পটা আগাগোড়া বদলে দিয়েছে। যে চরিত্র বইতে ছিল সৎ, তাকে অসাধু করা হয়েছে। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাথামুণ্ড কিছু বোঝা যায় না।

গ্রাহাম সাহেব পরিচালককে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমি তো এ গল্প লিখিনি স্যার, আপনি এ কী করেছেন? এ গল্প কোত্থেকে পেলেন?

পরিচালক বললেন—আপনি সিনেমার কি বোঝেন মশাই? সিনেমাতে আপনার গল্প না বদলালে আমার বদনাম হতো, দর্শক পয়সা দিত না—

এর ওপরে আর কথা নেই।

এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একটা গল্প বলি।

কবি কালিদাস রায় তখনও নিজের বাড়ি করেননি। ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন টালিগঞ্জ থানার পেছনে একটা গলির ভেতরে। শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু। এক সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করেন।

আড্ডাবাজ মানুষ শরৎচন্দ্র। পানিত্রাস ছেড়ে তখন পণ্ডিতিয়া রোডে বাড়ি করেছেন। শরীরটা তখন থেকেই খারাপের দিকে। বেশি ধকল সহ্য হয় না। বেশি লেখবারও ক্ষমতা নেই তাঁর তখন। ডাক্তার বিকেলবেলা একটু একটু খোলা হাওয়ায় পায়চারি করে অঙ্গ-সঞ্চালন করতে বলেছে। শুধু বিকেলে নয় সকালেও।

কিন্তু আড্ডাবাজ মানুষ আড্ডা না দিলে থাকে কেমন করে।

তাই পায়ে পায়ে চলে আসেন কালিদাস রায়ের সাহানগর রোডের ভাড়াটে বাড়িতে। সেখানে আরো অনেকে জোটে। মদের গন্ধে যেমন মাতাল জড়ো হয়, তেমনি আড্ডার গন্ধ পেয়ে বহু আড্ডাবাজ সাহিত্যিকও জোটে। সে আড্ডার প্রধান আকর্ষণ শরৎচন্দ্র। মজার মজার গল্প হয় সব। শরৎচন্দ্রের জন্যে ধূমপানের ঢালোয়া বন্দোবস্ত থাকে। তিনি এলেই অম্বুরি তামাক দিয়ে সাজা গড়গড়া এসে হাজির হয়। সব লোক হাঁ করে তাঁর কথা শোনে। শিশির ভাদুড়ীর গল্প, নিউ থিয়েটার্সের গল্প, বর্মার গল্প, ভাগলপুরের গল্প। তাছাড়া আছে ভূতের গল্প, সাপের গল্প, গানের ওস্তাদের গল্প। তারপর মাতাল, জুয়াড়ি, চোর, ডাকাতের গল্প।

গল্প করতে করতে বেলা বারোটা বাজে। এক একদিন দুপুর একটাও বেজে যায়। সেখানে আসেন শিশির ভাদুড়ী, আসেন বিশ্বপতি চৌধুরী, আসেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, আর আসেন উঠতি কিছু তরুণ সাহিত্যিকের দল। তাঁদের কারো লেখা তখন সবে ছাপা হচ্ছে কিংবা কারো লেখা তখন কোনও কাগজে ছাপাই হয় নি। কিন্তু আশা আছে একদিন সকলেরই লেখা কাগজে ছাপা হবে, বই ছাপা হয়ে বেরোবে। আর তারপর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত সে-গল্পের সিনেমাও হবে। সিনেমা হলেই তবে সে-সাহিত্যিকের সিদ্ধি। তার আগে নয়।

রবিবার দিনটার সকাল বেলাটাই আড্ডাটা জমে বেশি। সকাল মানে এই বেলা সাড়ে ন'টা দশটা থেকেই সাধারণত সে আড্ডা শুরু হয়।

কিন্তু সেদিন এক অঘটন ঘটলো।

ভোর সাতটার সময়েই শরৎচন্দ্র এসে হাজির।

কবি কালিদাস তো অবাক। বললেন—একি শরৎদা, এত সকালে?

শরৎচন্দ্র আয়েস করে ইজি-চেয়ারটায় বসলেন—আর ভাই, বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

কবি বুঝতে পারলেন না। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি বিপদ?

শরৎচন্দ্র বললেন—কাল আমার 'বিজয়া' ছবি রিলিজ হলো?

'বিজয়া' মানে 'দত্তা'। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের সিনেমার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিজয়া'। তারই আগের দিন সবে তা শুরু হয়েছে। আর ওদিকে তখন শিশির ভাদুড়ীও সেই 'বিজয়া' নাটক নিজের থিয়েটার 'নাট্যমন্দির'এ চালাচ্ছেন। স্টেজে 'বিজয়া' হিট। কিন্তু সিনেমার ভাগ্য তখন অনিশ্চিত।

সেই সিনেমার শুরুর দিন লেখক শরৎচন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করেছিল নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী। যথারীতি সিনেমা দেখানো হলো। শরৎচন্দ্র গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেন। নিজের উপন্যাসের ছায়াছবি। এ লেখকদের দেখতে ভালো লাগে। কল্পনার মানুষগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিখ্যাত বিখ্যাত স্টাররা লেখকের কল্পনার চরিত্রগুলোকে অভিনয় করে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলেন। তাতে লেখকের আত্মতৃপ্তি হয়। কিন্তু ছবি খারাপ হলে উল্টো ফল। তখন ঔপন্যাসিকের কষ্ট যন্ত্রণা। নিজের চোখের সামনেই সৃষ্ট চরিত্রগুলোর হত্যা দেখতে হয়। যেমন হয়েছিল গ্রাহাম গ্রীণের বেলায়।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গ্রাহাম গ্রীণের তুলনাটা ঠিক হলো না। গ্রাহাম গ্রীণের তখন ছিল দুরবস্থা। ছবি খারাপ হোক আর ভালোই হোক তাতে তাঁর কিছু বলবার ছিল না। তিনি টাকার জন্যে হলিউডের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র কি তাই?

শরৎচন্দ্রের তখন ভারতবর্ষ জোড়া খ্যাতি। তাঁকে দেখবার জন্যে তখন ছেলে-মেয়েরা ভিড় জমায়। যেমন এখনকার দিনে ভিড় জমায় কোন সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখবার জন্যে, ঠিক তেমনি। রাজনীতি, সিনেমা, স্পোর্টস তখন মানুষকে এমন করে রাহুগ্রস্ত করেনি।

যা হোক, ছবি শেষ হতেই শরৎচন্দ্রকে পাকড়াও করলেন নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ। তাদের মধ্যে অমর মল্লিক মশাই প্রধান।

অমর মল্লিক মশাই কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—ছবি কেমন লাগলো আপনার শরৎদা?

শরৎদা মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন—বেশতো ভালই।

অমর মল্লিক বললেন—তাহলে আপনার মতামতটা দু কলম লিখে দিয়ে যান—কালকের কাগজে আমরা সেটা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে পারি।

শরৎচন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু খুব শাণিত বুদ্ধির মানুষ বলেই সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন—মতামত কি এত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় হে?

অমর মল্লিক মশাইকে যাঁরা জানেন তাঁরা বলতে পারেন তিনি কেমন ধরনের বিনয়ী ভদ্রমানুষ। বললেন—আপনি হাসালেন শরৎদা, আপনি এতবড় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথা সাহিত্যিক, দুটো লাইন লিখে দিতে আপনার ক' সেকেণ্ড লাগবে শুনি?

শরৎচন্দ্র বললেন—সব স্বীকার করছি, কিন্তু মুশ্‌কিল কী জানো। ছবি দেখে এত আচ্ছন্ন হয়ে গেছি যে এখন আমার মাথায় কিছুই বেরোবে না—

অমর মল্লিক বললেন—তাহলে কবে লিখতে পারবেন? কাল সকালবেলা আপনার বাড়ি যাবো?

—আচ্ছা যেও।

বলে শরৎচন্দ্র গাড়িতে উঠে বাড়িতে ফিরে এলেন।

কবি কালিদাস রায় এতক্ষণ শুনছিলেন। বললেন—তারপর?

শরৎচন্দ্র বললেন—তারপর আর কী? তারপর এই এখানে তোমার বাড়িতে এসেছি। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই পালিয়ে এসেছি। বাড়িতে বলে এসেছি কেউ যদি আসে তো যেন বলে দেয় আমি বাইরে বেরিয়ে গেছি। কোথায় যাচ্ছি তা বলে আসিনি।

কালিদাস রায় বললেন—কিন্তু আপনার গাড়ি?

শরৎচন্দ্র বললেন—গাড়ি নিয়েই এসেছি। গাড়িটাকে তোমার বাড়ির সামনে আনিনি। শা'নগর রোডের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি, যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে।

কালিদাস রায় বললেন তাহলে ছবি খারাপ হয়েছে বুঝি?

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

শরৎচন্দ্র তামাক খেতে খেতে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—ওই, ওই ওরা এসেছে, তোমার পাশের ঘরে আমাকে লুকিয়ে রাখো। বউমাকে বলো ওখান থেকে সরে যেতে—

কালিদাস রায় বুঝতে পারলেন না।

বললেন—কারা এসেছে? কে? কাকে দেখে লুকোবেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—আবার কে? অমরকে তো তুমি চেনো না কালিদাস। সে পুলিশে চাকরি করলে ভালো স্পাই হতে পারতো কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসে হে, আমাকে খুব ভক্তি করে। তাকে এড়ানো শক্ত বলেই তো তোমার এখানে পালিয়ে এসেছি।

কালিদাস রায়ের ভৃত্য গিয়ে দরজা খুলে দেবার আগেই শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু যিনি এলেন তাঁকে দেখে আর পালাবার দরকার হলো না। আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন।

বললেন—ওঃ, তুমি খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে হে শিশির, আমি ঘর থেকে অন্দরমহলে পালাচ্ছিলাম।

শিশির মানে শিশির ভাদুড়ী। মোটা লম্বা কালো চুরোট একটা মুখে জ্বলন্ত। বললেন—কেন, পালাচ্ছিলেন কেন দাদা? কিসের ভয়।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি ভেবেছিলাম বুঝি ওরা এসেছে—তা তুমি এত সকালে আসবে, ভাববো কী করে?

শিশির ভাদুড়ী তবু বুঝতে পারলেন না। বললেন—ওরা মানে কারা?

শরৎচন্দ্র বললেন—ওরা মানে, ওই যারা 'বিজয়া' ছবি করেছে। নিউ থিয়েটার্সের লোকেরা। ওই অমর মল্লিক আর···

সেদিন সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সেই কালিদাস রায়ের বাড়িতে। কালিদাস রায় তখনকার দিনে ছিলেন সাহিত্যিকদের আড্ডার মধ্যমণি সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

শিশির ভাদুড়ীর চুরোটটা তখন নিভে এসেছিল। তিনি সেটায় দেশলাই জ্বালিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—অমর মল্লিক? কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে সেই কথাই তো এতক্ষণ কালিদাসকে বলছিলাম। কালকে 'বিজয়া' দেখলুম।

শিশির ভাদুড়ী বললেন—বলুন, কেমন দেখলেন? আমার থিয়েটারের চেয়ে ভালো, না খারাপ?

শিশির ভাদুড়ীর মঞ্চে তখন 'বিজয়া' চলছিল বহুদিন ধরে। মঞ্চ জগতে তখন শিশির ভাদুড়ীর যুগ চলছে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' স্টেজে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস নিয়ে থিয়েটার সিনেমায় তখন প্রায় কাড়াকাড়ি চলছে। একে শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প তার ওপর শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনা আর অভিনয়। সুতরাং ভিড়ের কমতি ছিল না সেখানে। আর সেই গল্পেরই আবার সিনেমা-রূপ শুরু হলো 'চিত্রায়'। লোকের আগ্রহের সীমা পরিসীমা ছিল না সে-ছবির ব্যাপারে। শরৎচন্দ্র নিজেও আশা করেছিলেন যে ছবিটা হয়ত ভাল হবে। তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু হলো উল্টো।

শিশির ভাদুড়ী বললেন—তাহলে তো আপনাকে বড় বিপদে ফেলবে ওরা। এখন তো আপনাকে দিয়ে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেবে—

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে ভাই, সেই জন্যেই তো এখানে ভোরবেলা পালিয়ে এসেছি।

হঠাৎ আবার দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। আবার ভয়ে আঁতকে উঠেছেন শরৎচন্দ্র। ওই বুঝি এল।

এবার আর এড়ানো গেল না। গৃহভৃত্য দরজা খুলে দিতেই নিউ থিয়েটার্সের চাঁইরা সশরীরে ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভেতরে। সকলের পরনেই কোঁচানো ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি। পায়ে পাম্প-শু।

—দাদা আপনি এখানে? আর আমরা আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

শরৎচন্দ্র আর কী করেন, বললেন—তোমরা এখানে কী করে এলে? আমি তো হঠাৎ এসে পড়েছি কালিদাসের বাড়িতে।

অমর মল্লিক বললেন—আপনার বাড়িতে গিয়ে শুনলুম আপনি মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ বসে রইলুম। তারপর যখন দেখলাম আপনার দেখা নেই, তখন ভাবলাম মর্নিং ওয়াক করতে কোথায় আর যাবেন, বড় জোর দেশপ্রিয় পার্কে। সেই দেশপ্রিয় পার্কের মধ্যে বার-চারেক ঘুরলুম। শেষে বুদ্ধি হলো, ভাবলাম আর্টিস্ট যতীন সিংহীর যতীন দাস রোডের বাড়িতে যদি গিয়ে থাকেন, তাই গেলাম সেখানে—

এতক্ষণে আরো চার কাপ চা এলো নতুন অতিথিদের জন্যে।

কালিদাস রায় জিজ্ঞেস করলেন—তা এখানকার ঠিকানা কে দিলে আপনাদের?

সত্যিই কবিদের সঙ্গে সিনেমার লোকদের কোনও সম্পর্ক কোনও দিন থাকে না। গানের জন্যে দরকার হয় বটে কবিদের, কিন্তু তার জন্যে স্পেশাল গীত-রচয়িতা আছে। আর সে জন্যে তাদের বাড়িতে গিয়ে ধর্নাও দিতে হয় না। গীত-রচয়িতারাই সিনেমা মহলে ঘোরাঘুরি করে।

অথচ এতগুলি ভদ্র সন্তানের যে তাঁর বাড়িতে আগমন হলো তার জন্যে প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শরৎচন্দ্রের। শরৎচন্দ্র যে কবি কালিদাস রায়ের বাড়িতে আসেন সেটা ছিল সর্বজনবিদিত। এবং শরৎচন্দ্রের আকর্ষণই যে সেখানে ছিল প্রধান, আর কালিদাস রায়ের আকর্ষণ ছিল গৌণ।

অমর মল্লিক বললেন—শিল্পী যতীন সিংহী, তিনিই বললেন—যান, একবার কালিদাস রায়ের বাড়িতে গিয়ে খুঁজে দেখুন। ওখানেও যান মাঝে মাঝে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তা কী ব্যাপার তোমাদের? ছবির বিক্রি কেমন হচ্ছে?

অমর মল্লিক বললেন—দাদা, আপনার গল্প, আর নিউ থিয়েটার্সের ছবি, টিকিট বিক্রি হবে না? তার ওপর পাহাড়ী সান্যাল নরেন সেজেছে—পপুলার স্টার।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাহলে তো ল্যাঠা চুকে গেল। আমার সার্টিফিকেটের আর দরকার কি?

অমর মল্লিক মশাই বললেন—না দাদা, একসঙ্গে এই শিশিরবাবুর স্টেজে প্লে হচ্ছে, আবার এদিকে সিনেমা হচ্ছে, শেষকালে কেউ যেন বলতে না পারে যে আমাদের নিউ থিয়েটার্স খারাপ করে ফেলেছে গল্পটা—

তারপর বললেন—আপনার দাদা বাড়িয়ে বলবার দরকার নেই। আপনি যেমন দেখেছেন তেমনি বলবেন। আপনি তো কাল রাত্তিরে নিজেই বললেন, আপনার খুব ভালো লেগেছে।

শরৎচন্দ্র তখনও দ্বিধা করছেন। সার্টিফিকেট দেবেন কি দেবেন না। তিনি যদি ছবি ভালো হয়েছে বলে ঘোষণা করেন তাহলে লোকে তাঁকে ধিক্কার দেবে। আর যদি খারাপ হয়েছে বলে ঘোষণা করেন তাহলে নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী অসন্তুষ্ট হবে। এখন কোন পথ তিনি নেবেন?

অমর মল্লিক তখন পকেট থেকে একটা নতুন কেনা ফাউন্টেনপেন বার

করেছেন। আর একটা নতুন প্যাড। একেবারে শরৎচন্দ্রের নাম ঠিকানা ছাপানো প্যাড। বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের ব্যবহারের জন্যেই তৈরি করিয়ে এনেছেন তাঁরা। আর কলমের নিব্‌টাও সরু। ঠিক যেমন সরু কলমে লেখেন শরৎচন্দ্র।

অগত্যা আর কী করেন শরৎচন্দ্র।

এমন দুর্বিপাকে শরৎচন্দ্রকে আগেও অনেকবার পড়তে হয়েছে। কিন্তু সে-সব সাহিত্যের ব্যাপারে। খারাপ বইকে ভাল বলে সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে। নাছোড়বান্দা সাহিত্যিক আর পাবলিশারদের সে-সব অত্যাচার কাকেই বা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু তা বলে সিনেমা ?

অনেক সময় পত্র-পত্রিকায় আজকাল সিনেমার সমালোচনা ছাপা হয়। কত খারাপ ছবিকে যে কত ভালো ছবি বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছে, এবং কত ভালো ছবিকে যে কত খারাপ বলে সমালোচনা করা হয়েছে, তার ঠিক নেই। যখনই এ-সব ঘটনা নজরে পড়ে তখনই সেদিনকার সেই শরৎচন্দ্রের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়।

আহা, বেচারা শরৎচন্দ্র !

আজকের সমালোচকদের জন্যে প্রযোজকদের হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়। খাওয়ানো-দাওয়ানো ছাড়া আছে নানান-রকম উপহার। কাউকে স্যুট, কাউকে ঘড়ি, কাউকে আবার সোনারবোতাম ইত্যাদি ইত্যাদি—

কিন্তু সেদিন শরৎচন্দ্রকে অতখানি অপমান করতে দুঃসাহস হয়নি কারো, এইটেই রক্ষে। ছবির গল্প ছবিরই গল্প। সে জগৎ আলাদা জগৎ। তার সঙ্গে উপন্যাসের কোনও যোগাযোগ নেই। যেটুকু সামান্য যোগাযোগ আছে তা ঘটনার। উপন্যাসে ঘটনা ঘটাই আমরা। সিনেমা পরিচালকও ঘটনা ঘটান। কিন্তু দুই-এর মধ্যে অনেক পার্থক্য।

Pudovkinএর একটা বই আছে তার নাম 'Film Technique and Film Acting.' সেখানে দেখেছি এক জায়গায় লেখা আছে The novelist expresses his key stories in written descriptions, the dramatist by rough dialogue, but the scenarist must think in plastic (externally expressive) images. He must train his imagination, he must develop the habit of representing to

himself whatever comes into his head in the form of a sequence of images upon the screen. Yet more he must learn to command these images and to select from those he visualises the clearest and most vivid, he must know how to command them as the writer commands his words and the playwright his spoken phases. (Film Technique And Film Acting. Vision Press Page 42.)

কথাগুলো ভাববার মত। আমি নিজে সিনেমা দেখি কম। সিনেমা আমার পেশাও নয়, নেশাও নয়। তার ওপর নিজের চোখের ওপর বিশ্রাম দেওয়াও আমার সিনেমা না দেখার অন্যতম কারণ। কিন্তু বই পড়তে ভালো লাগে, বই পড়াটা কাজেও লাগাই। সেই সূত্রেই সব রকম বই-এর সঙ্গে সিনেমা সংক্রান্ত বইও কিছু ঘেঁটেছি।

গ্রাহাম গ্রীণের কথা আগেই বলেছি। ভদ্রলোক সিনেমার গল্পই শুধু লেখেননি, সিনেমা পরিচালনাও করেছিলেন শেষ পর্যন্ত। কয়েক বছর ধরে সিনেমা নিয়েই মেতে ছিলেন। কিন্তু শেষকালে সিনেমা সম্বন্ধে এতখানি হতাশ হয়ে এসেছিলেন যে তার আর সীমা পরিসীমা নেই।

সে-কথা পরে বলবার ইচ্ছে রইলো।

তারপর বলেছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর মোহ ভাঙবার আগেই তিনি পৃথিবীর মোহ ভেঙে চলে যেতে পেরেছিলেন।

আর তারপর শরৎচন্দ্রের কথা বললাম।

এবার আর একটা গল্প বলি শুনুন। আসলে এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। ঘটনাটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে নিয়ে। এই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন কাউন্ট লিও টলস্টয়।

টলস্টয় ১৯১০ সালে পরলোকগমন করেছেন। আর এ ঘটনাটা হলো ১৯০৯ সালের।

সেই ১৯০৯ সালে রাশিয়ার একটি ছেলে বাবা মাকে লুকিয়ে একদিন ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে একটা চিঠি লিখতে বসলো। অনেকগুলো কাগজ নষ্ট করেও চিঠিটা লেখা ঠিক মনঃপূত হলো না। এই রকম বার বার লেখার পর শেষকালে একটা চিঠি কোনও রকমে খাড়া করে ফেললে সে।

ছেলেটির বয়েস তখন মাত্র আট বছর।

আট বছর বয়সের একজন ছেলে যে এমন করে কাউকে চিঠি লিখতে পারে একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বানান ভুলে ভর্তি, বাঁকাচোরা লাইন, চোতা কাগজ। সেই চিঠিখানা খামে পুরে একদিন লুলিয়ে লুকিয়ে সে ডাকবাক্সে ফেলে এল।

উনিশ শো ন' সালের রাশিয়া। তখন সিনেমা বলে কোনও বস্তুর আবিষ্কার হয়নি পৃথিবীতে। সিনেমা যে সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে তা-ও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। আবার সিনেমাও সে সাহিত্যের ঘাড়ে চড়ে বসবে তা তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

এ ঘটনা সেই সময়কার। ছোট ছেলে। কেমন করে না জানি টলস্টয়ের নাম শুনে ফেলেছিল। টলস্টয়ের খ্যাতিও শুনে ফেলেছিল। এখনকার দিনে আট বছর বয়সের ছেলেদের কানে কোন সাহিত্যিকের নাম সাধারণতঃ পৌঁছোয় না। পৌঁছোয় খেলোয়াড়দের নাম, সিনেমা স্টারদের নাম, অথবা মন্ত্রীদের নাম। তারাই এখন খবরের কাগজের পাতা জুড়ে বসে থাকেন।

শরৎচন্দ্রের একটা সৌভাগ্য ছিল এই যে তাঁর যুগে সিনেমা প্রচলন হয়েছিল বটে, কিন্তু তখনও তা এমন সর্বনাশা প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারেনি। এখন যেমন সিনেমা স্টারদের ভিড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে পুলিশ আর মিলিটারীর বন্দোবস্ত করতে হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকেও ভিড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে পুলিশের বন্দোবস্ত করতে হতো।

মনে আছে একবার শরৎচন্দ্রের আসবার কথা ছিল তখনকার দিনে অ্যালবার্ট হলে। সে যুগে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। শরৎচন্দ্রকে বা রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া একটা পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হত তখন। তখন সাহিত্যিকদের মর্যাদাও ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রেলিং-এর ওপর দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল ছাত্ররা। তারা চেয়েছিল শরৎচন্দ্রকে শুধু একবার দেখতে।

এ শ্রদ্ধা শরৎচন্দ্রকে কেউ জোর করে দেয়নি। তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে এ শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য প্রতিভা দিয়ে। আজ সে মর্যাদাও যেমন কেউ পায় না, সে মর্যাদার যোগ্য সাহিত্যিকও কেউ নেই। এখন ১৫ পয়সার একটা পোস্টকার্ড পাঠালেই একটা সভাপতি পাওয়া যায়। সেই কারণেই বলেছি যে এখন সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অধঃপতনের যুগ।

কিন্তু সেই মর্যাদার যুগে শরৎচন্দ্রকে নিউ থিয়েটার্স যে মর্যাদা দিয়েছিল

সে মর্য্যাদা এখনকার কোনও সাহিত্যিককে দেয় না কোনও সিনেমা প্রোডিউসার।

মনে আছে একদিন সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখেছিলাম বাঙলা খবরের কাগজের সিনেমার পাতায় শরৎচন্দ্রের হাতের লেখা বিজ্ঞাপন। শরৎচন্দ্রের নিজের হাতে লেখা সার্টিফিকেট।

শরৎচন্দ্র লিখেছেন—"বিজয়া দেখলাম। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় যে 'বিজয়া' ছবি 'চিত্রা' চিত্র গৃহে দেখানো হচ্ছে তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার মনে হয় দর্শকবৃন্দেরও তা ভালো লাগবে।"

আসল ভাষাটা মনে নেই। অনেকদিন আগেকার কথা, তাই সবটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে থাকবার কথা নয়। তবে যা লেখা ছিল তারই কাছাকাছি একটা আদল দেবার চেষ্টা করলাম। খবরের কাগজের পুরনো ফাইল দেখে কোনও গবেষক তা আজো উদ্ধার করতে পারেন।

কিন্তু সে যা হোক, যে কথা বলছিলাম সেই কথাতেই ফিরে আসি। সেই কাউণ্ট লিও টলস্টয় প্রসঙ্গ।

আট বছরের ছেলেটি সেই চিঠিটা তো লিখলো। কিন্তু উত্তর আর তার এলো না। যে ছেলেটি চিঠিটা লিখেছিল সে নিজেও চিঠিটার কথা ভুলে গেলো। কারণ চিঠিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা বরাবর মনে রাখতে হবে।

এইটুকু শুধু ছেলেটির মনে ছিল যে লিখেছিল—'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। পৃথিবীতে আপনাকেই আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। আমি বড় হয়ে একজন সাহিত্যিক হতে চাই। তাই আপনার আশীর্বাদ কামনা করি। ইতি—'

ছোট চিঠি। কিন্তু যিনি বহু লোকের শত শত চিঠি রোজ পান তিনি কেন সামান্য একজন আট বছর বয়সের ছেলের বানান-ভুল চিঠির উত্তর দেবেন? তাঁর অত সময় কোথায়? তাঁকে তো আরো বড় জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।

কিন্তু না, একদিন সত্যিই উত্তর এল টলস্টয়ের।

একটা বাড়ির বাইরের ঘরে এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বসে আছেন। এমন সময়ে একজন ডাক পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল তাঁর হাতে। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন চিঠিটা বুঝি তাঁদেরই নামে। কিন্তু তা নয়। চিঠির ওপরে তাঁদের আট বছর বয়সের ছেলের নাম ঠিকানা লেখা।

আশ্চর্য ! আট বছর বয়সের ছেলেকে কে চিঠি লিখলো ?

তাড়াতাড়ি তাঁরা চিঠির মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললেন। পত্রদাতার নাম পড়ে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। চিঠি লিখেছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং বিখ্যাত সাহিত্যিক টলস্টয়। Lev Tolstoy.

লিখেছেন—

Seryojha yermoluisky.

Snegovaya st. 7. Flat no-1. Villinus. Yasanaya Polyana.

March 25, 1909

Your wish to become a writer is a wicked wish, for it means that you want woredly fame for yourself. It is just wicked vanity. One should have only one desire to be kind, not to offend, not to cansure and not to hate any one, but to love every body.

Lev Tolstoy.

সামান্য একজন আট বছর বয়সের ছেলেকে লেখা চিঠি। চিঠিটাতে টলস্টয় যা লিখেছিলেন তার তাৎপর্য বোঝবার মত বয়েস তখন ছেলেটির হয়নি। ছেলেটির মধ্যে এই সমস্যা দেখা দিল যে, তবে কি লেখক হওয়া খারাপ ?

কথাটা বড় জটিল। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে হওয়া খারাপ নয়, ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার ইচ্ছে হওয়াও খারাপ নয়, উকিল-ব্যারিস্টার-অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার ইচ্ছেও খারাপ নয়। শুধু কি লেখক সাহিত্যিক হওয়ার ইচ্ছেটাই খারাপ ? যশ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছেটাও কি খারাপ ?

অথচ সবাই তো অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা চায়।

কথাগুলো ভাবিয়ে তুললো সেই আট বছর বয়সের ছেলেটিকে।

কিন্তু ছেলেটির বাপ-মায়ের খুব আনন্দ। তারা তো কৃতার্থ হয়ে গেছে। তাদের ছেলেকে টলস্টয় চিঠি লিখেছে এর চেয়ে আনন্দের কী হতে পারে ? রাতারাতি ছেলেটি বিখ্যাত হয়ে উঠলো গ্রামের মধ্যে।

রাস্তা দিয়ে গেলে অন্য লোকেরা আঙুল দিয়ে দেখায়। বলে—ওই ছাখ, ওই ছেলেটা।

বাড়িতেও ভিড় জমতে লাগলো শেষকালে। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন আসতে লাগলো ছেলেটিকে দেখতে আর সেই চিঠিটা দেখতে। সমস্ত পৃথিবীর

লোক যে মহাপুরুষকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সেই তিনিই চিঠি লিখেছেন। চিঠি লিখেছেন নিজের হাতে। এ এক রকমের বিস্ময়কর ঘটনা।

তারপর আর এক মজার ঘটনা ঘটলো।

সেই গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকেই একখানা করে চিঠি যেতে লাগলো টলস্টয়ের নামে। সবাই টলস্টয়ের হাতের লেখা চিঠি চায়। কেউ বা একখানা বই চায়। কেউ লেখে উপদেশ চেয়ে, কেউ লেখে আশীর্বাদের জন্যে। কেউ দেখা করতে চায়। কেউ আবার চায় একটা ফটোগ্রাফ—অটোগ্রাফ দেওয়া।

এ সেই যুগ যখন পৃথিবীতে সিনেমা নামক বস্তুটির আমদানি হয়নি। এ সেই যুগ যখন মনুষ্যত্বের দাম ছিল বেশি, টাকা পয়সার দাম ছিল কম। এ সেই যুগ যখন মানুষ মানুষকে ভালবাসতো তার গুণ-বিচার করে, তার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বিচার করে নয়।

আজকের দিনে সাহিত্যিকদের কাছে এ সম্মান হয়ত দুর্লভ। কারণ এমন কোন সাহিত্যিক আছে কি যে অর্থের বিনিময়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে না? আজকের দিনে এ-কথা আর কারো জানতে বাকি নেই যে একটা পনেরো পয়সার পোস্টকার্ড পাঠালেই সাহিত্যসভার সভাপতি পাওয়া যায়। আজকে সাহিত্যিকরা বই হাতে নিয়ে সিনেমা-অভিনেত্রীদের বাড়িতে গিয়ে ধরনা দেয়। যদি তিনি তার গল্প চিত্রায়িত করেন।

বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ একজন অভিনেত্রী একদিন আমাকে বলেছিলেন—বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রী অমুকচন্দ্র অমুক আমার বাড়িতে নিজে এসে তাঁর নিজের লেখা উপন্যাস উপহার দিয়ে গেছেন, আপনি কি তাঁর চেয়েও বড়?

একবারের ঘটনা বলি।

তখন 'সাহেব বিবি গোলাম' নিয়ে সিনেমা মহলে কাড়াকাড়ি চলছে। নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে ছোটাই মিত্র মশাই একটি চিঠি দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল যে তাঁরা আমার 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসটি সিনেমা করতে চান।

যে নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী একদিন সিনেমার ছবি করে সারা ভারতবর্ষে তোলপাড় তুলেছে, সেই কোম্পানী আমার গল্প সিনেমা করবার জন্যে আমার দ্বারস্থ এটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না।

এ ধরনের ঘটনায় অন্য লোকের কী অনুভূতি হতো আমি তা বলতে পারবো

না। প্রথমে আমার একটু রোমাঞ্চ হলো। শুধু যদি রোমাঞ্চ হতো তা হলে ক্ষতি ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ও হলো।

ভয় হওয়ার কারণ আমি বরাবর আড়ালে থাকার মানুষ। সকলের চোখের আড়ালে থাকতে পেলে আমি বড় নিশ্চিন্ত থাকি।

কিন্তু ছোটাই মিত্র মশাইকে যাঁরা সেকালে জানতেন তাঁরা বলতেন আমার মত দশটা লেখককে এক হাটে কিনে নাকি অন্য হাটে তিনি বিক্রি করতে পারতেন। ছোটাই মিত্রের আসল নাম ছিল যতীন মিত্র। কিন্তু ছোটাই মিত্র নামেই তিনি কলকাতা শহরে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মতন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারাটাই নাকি সেকালে ছিল একটা অসাধ্য-সাধন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার লোকের অভাব হতো না সেকালে। তিনি একটু কৃপাদৃষ্টি দিলেই নাকি অনেকে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেত।

ছোটাই মিত্র সম্বন্ধে যা কিছু কিংবদন্তী সব আমার শোনা ছিল প্রফুল্ল মিত্রের কাছে। প্রফুল্ল মিত্রকে আজ কেউ চেনে না। কিন্তু এককালে প্রফুল্ল মিত্র একখানা গানের রেকর্ড করে রসিক-সমাজে নাম করে ফেলেছিল। গানটির প্রথম লাইন আমার এখনও মনে আছে : "সাড়া না পেয়ে গেল চলে—"

সেই প্রফুল্ল মিত্রই কথায় কথায় আমায় খোটা দিত। বলতো—'তুমি মিত্তির কুলের কলঙ্ক।'

আমি বলতাম—তুমি কি তাহলে মিত্তির কুলের গৌরব ?

প্রফুল্ল বলতো—না, আমি নই, ছোটাই মিত্তির। ছোটাই মিত্তির হলেন মিত্তির কুলের কুল-তিলক।

প্রফুল্ল মিত্রের মুখ থেকে আরো অনেক কাহিনী শুনে শুনে ছোটাই মিত্র সম্বন্ধে সেকালে আমার মনে একটা-ভীতি জন্মে গিয়েছিল। প্রফুল্লর কথাগুলো যে মিথ্যে তা মনে করবার কোন কারণ আমার ছিল না। কারণ প্রফুল্ল মিত্র আমার মতন লাজুক প্রকৃতির মানুষ নয়। সে সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছে সেই বয়েসেই। লাহোরে সে কোন এক সিনেমা কোম্পানীর ক্যামেরাম্যান ছিল। কানন দেবীর সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল। সেই তখনকার যুগের কানন দেবী।

আমি তখন তার সব গল্প অবাক হয়ে শুনতাম। তখন আমি বি-এ ক্লাসের ছাত্র। কলেজের ছুটির পরই বই-খাতাপত্র নিয়ে সোজা চলে আসতাম অক্রুর দত্ত লেনের হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর অফিসে। সেখানে আমার

যাওয়ার একটা ক্ষীণসূত্রও ছিল। আমি রেকর্ডের গান লিখতাম। অনুপম ঘটক আমার সেই গানের সুর দিত। আর গান গাইতো রাধারাণী, আশালতা প্রভৃতি বিখ্যাত গায়ক-গায়িকারা। ঘটনাচক্রে সেই সময় আমিও একটা নিজের লেখা গানের রেকর্ড বার করেছিলাম। কিন্তু সে গান বেশি জনপ্রিয় হয়নি। তাই এখন ভাবি ভাগ্যিস সে গান জনপ্রিয় হয়নি!

সাহিত্যের জগতের মানুষ হয়েও সেই সময়ে কোন গ্রহচক্রে যে প্রায় সিনেমার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম তা আমারও খেয়াল ছিল না। অনুপম দু-একদিন নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওর মধ্যেও নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমার তখন ভয় করেছিল সব কিছু দেখে। বিশেষ করে ভয় হয়েছিল বাঙলা-দেশের কিছু সাহিত্যিকের অধঃপতন দেখে। সাহিত্যিক যদি স্বধর্মচ্যুত হয় তাহলে তার আর নিস্তার নেই—এই শিক্ষাই আমি বরাবর পেয়ে এসেছি ছোটবেলা থেকে। খ্যাতির জন্যে নয়, অর্থের জন্যে নয়, জনতার প্রিয় হবার জন্যে নয়, এমন কি পরমার্থের জন্যেও নয়, সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্যের সেবা করা উচিত। এই-ই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু সেই ছোটবেলাতেই দেখতাম সাহিত্যের তুলসী প্রাঙ্গণ ছেড়ে সিনেমার বিলাস-ভূমিতে দু-জন সাহিত্যিক আপন কর্ম ত্যাগ করেছেন। কষ্টের পথ ছেড়ে সহজ পথে আপন ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থ করছেন।

সত্যিই সেদিন বড় ভয় হয়েছিল আমার।

ভাবতাম আমার ভাগ্যেও যদি ওই দুর্ঘটনা ঘটে! আমিও যদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থতার সহজ পথে গা এলিয়ে দিই।

কিন্তু চোখের সামনে তখন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ছিলেন শরৎচন্দ্র। আর ছিলেন টলস্টয়, বালজাক আর ডিকেন্স। যাঁদের পায়ের তলায় বসে বিনীত শিক্ষার্থীর মত আমি লেখা শিখেছি। তাঁদের লেখা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে। সাহিত্যিকদের একটা মস্ত মূলধন হলো সংযম। সব কিছু ক্লেশ-গ্লানি পঙ্কিলতার মধ্যে যুক্ত থেকেও মুক্ত থাকতে হবে সাহিত্যিককে। তবেই সাহিত্যের সত্য সাহিত্যিকের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠবে।

তাই যখন এম-এ ক্লাসে ঢুকলাম তখন আমি মনস্থির করে ফেলেছি! জেনে নিয়েছি আমি যদি সাহিত্যিক হতে চাই তো গান-সিনেমা প্রভৃতি থেকে নিজেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ ওগুলো সাহিত্যের পরিপন্থী। ছাত্রদের পক্ষে অধ্যয়ন যেমন তপস্যা সাহিত্যিকদের পক্ষেও জীবন-অধ্যয়ন তেমনি

তপস্যা। নিয়ম করে সাহিত্যের জন্যে দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতে হবে। আপাত মধুর বিলাস-সম্ভোগ থেকে মনকে বিমুক্ত করতে হবে।

জানি অনেকের কাছে মনে হতে পারে এগুলো পুরনো-পন্থী মনের পরিচয়। কিন্তু আমি ধ্রুব বিশ্বাস নিয়ে আমার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি তখন থেকেই। প্রশ্নটা পুরনো-পন্থী নতুন পন্থী নয়। কারণ আগেই রবীন্দ্রনাথের কথাটা উদ্ধৃত করে দিয়েছি যে 'আশ্বস্তের কথা এই যে আধুনিক চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।' কথাটা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলুন, যাদের লক্ষ্য করেই বলুন, আমি আমার নিজের মত করে তাকে গ্রহণ করে সিদ্ধির পথে একাত্ম হয়ে চলেছিলাম।

কিন্তু প্রথম বিপর্যয় এল সেই সিনেমার তরফ থেকেই।

ছোটাই মিত্র মশাই-এর আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি তখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। আর শুধু কি তিনি একলা? 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর তখন অনেক খরিদ্দার। নন্দন পিকচার্সের হারুবাবু, নারায়ণ পিকচার্সের নারায়ণবাবু। তাছাড়া আছেন কানন দেবীর তরফে হরিদাস ভট্টাচার্য এবং শেষকালে নিউ থিয়েটার্সের তরফে মিত্র মশাই। অভিমন্যুর মত দশদিক থেকে আমার ওপর আক্রমণ শুরু হলো।

এতে অন্য যে-কোন সাহিত্যিক প্রীত হতেন, পুলকিত হতেন, বিচলিত বিগলিত হতেন। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় পেয়ে গেলাম আমার সাহিত্যিক-মানসের গঠন-প্রকৃতির জন্যে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এমন কী বই লিখেছি যার জন্যে এত চাহিদা? আমি তো শরৎচন্দ্রও নই, বঙ্কিমচন্দ্রও নই।

ঘটনাটা পরে শুনলাম। সত্যিই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উপযুক্ত বিচারের মত ঘটনাই বটে!

একটা বিয়ে বাড়ির এক নববধূ বিয়ের অন্যান্য উপহারের সঙ্গে আমার সাতাশ'টি 'সাহেব বিবি গোলাম' বই উপহার পেয়েছিল। একই বই-এর সাতাশটি কপি উপহার পাওয়ার ঘটনা অভিনব নিশ্চয়ই। জানি তাতে নববধূর লোকসান, কিন্তু আর্থিক লাভ প্রকাশকের এবং আংশিকভাবে লেখকেরও।

সিনেমা ব্যবসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এক সজ্জনের নজরে পড়লো দৃশ্যটা।

জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কী বই?

একজন উত্তর দিলেন—সাহেব-বিবি-গোলাম।

—সেটা কী? কার সম্বন্ধে লেখা?

ভদ্রলোক বইটা দেখে শুনে পরীক্ষা করে বললেন—একটা উপন্যাস মনে হচ্ছে।

—কার লেখা?

ভদ্রলোক দেখে নিয়ে বললেন—বিমল মিত্তির।

কিন্তু ততক্ষণে তিনি হিসেব করতে লেগে গেছেন। একটা বিয়ে বাড়িতে একই বই-এর সাতাশখানা কপি। তাহলে নিশ্চয়ই খুব জনপ্রিয় বই! এ বইখানাকে যদি সিনেমায় তোলা যায় তাহলে তো যতগুলো লোক এ-বই পড়েছে তারা সবাই ছবি দেখবে। সবাই যদি একবার করেও সে ছবি দেখে তাহলে তো ছবির খরচ উঠে যাবে। আর যদি ছবি ভালো হয় তাহলে তো কথাই নেই। অনেক টাকা লাভ। তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মনে মনে একটা বাজেট তৈরি করে ফেললেন। আর তার পরদিনই ছুটলেন প্রডিউসারের বাড়িতে, প্রডিউসার ছুটলো ডিস্ট্রিবিউটারের বাড়িতে। আলোচনা হলো। ঠিক হলো গল্পটা কিনতে হবে। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ছোটাই মিত্র মশাই খোঁজ করতে লাগলেন কোথায় বিমল মিত্রের ঠিকানা।

আর শুধু ছোটাই মিত্রই নয়, ততক্ষণে সেই বিয়ে বাড়ি থেকে খবরটা আরো দুচারজনের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিকানা খুঁজতে আরম্ভ করেছে বিমল মিত্রের।

এদিকে ছোটাই মিত্র মশাই যখন আমার কাছ থেকে তাঁর চিঠির উত্তর পেলেন না তখন একদিন সশরীরে এসে হাজির হলেন আমার বাড়িতে।

তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন—আরে মশাই, আপনি আমার এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এটা জানতাম না।

বললাম—কী রকম?

তিনি বুঝিয়ে দিলেন। কোন্ ক্ষীণ সূত্র ধরে আমাদের একটা নিবিড় আত্মীয়তা সম্পর্কের বন্ধন আছে তা যেমন তার অজ্ঞাত ছিল, তেমনি অজ্ঞাত ছিল আমারও। অন্য লোক হলে কী হতো জানি না, আমি কিন্তু বিশেষ কৃতার্থ বোধ করলাম না। কারণ আমার তখন টলস্টয়ের গল্পটা মনে আছে—"ইয়োর ডিজায়ার টু বি এ রাইটার ইজ এ উইকেট উইশ, ফর ইট মিন্‌স্ ছাট ইউ ওয়াণ্ট ওয়ার্লড্‌লি ফেম ফর ইওরসেলফ্।"

খ্যাতির জন্যে নয়, আর্টের জন্যে নয়, জনতার প্রিয় হবার জন্যে নয়, এমন কি পরমার্থের জন্যেও নয়, সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্যের সেবা করা উচিত এই-ই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু ছোটাই মিত্র অত সহজে আমাকে নিষ্কৃতি দেবার লোক নন।

যাবার সময় বললেন—তাহলে আপনি আমাকে 'সাহেব-বিবি-গোলাম'টা দিলেন ?

আমি বললাম—আমি ঠিক কথা দিতে পারছি না। কারণ মিস্টার ভট্টাচার্য আমার কাছে প্রথম প্রস্তাব করেছেন, আপনার আগেই।

ছোটাই মিত্র বললেন—কে মিস্টার ভট্টাচার্য ?

বললাম—তা আমি জানি না। তবে কানাইলাল সরকারের কাছে শুনেছি।

—কে কানাইলাল সরকার ?

বললাম—আনন্দবাজার পত্রিকার ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, তিনি চান যে আমি বইটা কানন দেবীকে দিই।

মুখটা কীরকম গম্ভীর হয়ে গেল ছোটাইবাবুর। যেন হেরে গেছেন। বললেন—কিন্তু আপনি তাকে কথা দেননি তো ?

বললাম—না, কথা আমি কাউকেই দিইনি।

ছোটাইবাবু বললেন—তাহলে ঠিক আছে, কাউকে কথা দেওয়ার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবেন—

বলে তিনি চলে গেলেন। আর আমি মুক্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমার মনে হলো আমি যেন আবার আমার বিশ্বাস ফিরে পেলাম। 'সাহেব বিবি গোলাম' তো আমার শুধুই নিছক গল্প নয়। গল্পের অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে তবে তাই।

আমার প্রকাশক বললেন—না বিমলবাবু, আপনি সিনেমার জন্যে 'সাহেব-বিবি-গোলাম' বেচবেন না। আপনি ঠিক কাজ করেছেন।

আমি আরো নিশ্চিন্ত হলাম। মন থেকে সমস্ত জঞ্জাল দূর হয়ে গেল। বড় শান্তি পেলাম নিজের মনে। যেমন করে সেই রাশিয়ার আট বছর বয়সের ছেলেটা শান্তি পেয়েছিল। সত্যিই লেখক হওয়ার কামনা নিকৃষ্ট কামনা। তাতে নিজের খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকে। কামনা হওয়া উচিত পরকে দয়া করার, অন্যের ভালো করার, সকলের কল্যাণ করার।

কিন্তু সেই ছেলেটির দেখাদেখি গ্রামের আরো অনেক ছেলেদের দিয়ে তাদের

বাবারা টলস্টয়কে চিঠি লেখালো। সবাই ওই একই কথা লিখলে। ভালো কাগজে, শুদ্ধ বানানে, লাইন সোজা করে সবাই-ই লিখলে—শ্রদ্ধেয় লিও-টলস্টয়, আমি বড় হয়ে একজন লেখক হতে চাই, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

কিন্তু তখন ১৯১০ সাল। সে সব চিঠি টলস্টয়ের কাছে পৌঁছোলো কিনা কে জানে! কারণ সে বছরেই, সেই ১৯১০ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে তিনি মারা গেলেন। তাই সে গ্রামের আর কোনও ছেলেই সে সব চিঠির উত্তর পেলে না।

কিন্তু এর পরেই আর একটা ঘটনা ঘটলো। যার ফলে আমাকে আবার সিনেমার সংস্রবে আসতে হলো।

আমার কাছে বরাবর মনে হয়েছে সিনেমা একটা অন্য ধরনের শিল্প। সাহিত্যকে আশ্রয় করে এ-শিল্প গড়ে উঠলেও, সিনেমার আবেদন নিকৃষ্ট। সিনেমা দেখেছি এবং ভুলে গিয়েছি, কিন্তু কোনও বই পড়ে ভুলতে কষ্ট হয়েছে। সিনেমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়, কিন্তু বই বহুদিন পর্যন্ত মনকে টানে।

আমাদের ছোটবেলাতেই সিনেমা বাজারে ছেয়ে গিয়েছিল। সেই 'ঋষির প্রেম', সেই 'তুর্গেশনন্দিনী', সেই 'কৃষ্ণকান্তেব উইল' আমাদের ভাবিয়েছে, উত্তেজিত করেছে, রোমাঞ্চিত করেছে, কিন্তু তাকে আমরা ভালবাসিনি। বড় জোর মনে হয়েছে সিনেমায় কেমন করে কাকে ধরলে অভিনয় করা যায়।

কিন্তু বই ?

বই-এর আবেদন শতাব্দীর সীমারেখা ছাড়িয়ে চিরকালের দিগন্তে গিয়ে মেশে। সেই কারণেই একই গল্পের বার বার সিনেমা হয়। বার বার করে মানুষের দেখতে ইচ্ছা করে সেই সব চরিত্রদের—যারা বই-এর পাতার মধ্যে সজীব হয়ে পাঠকদের হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, ভাবিয়েছে। দর্শকেরা সে-ছবি দেখে খুশী হয় না। তাই আবার নতুন করে তাদের দেখতে চায়। সেটাও চায় বলেই আবার কোনও পরিচালক সেই উপন্যাসকে নিয়ে ছবি তোলেন।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে একজন লেখিকার কথা। তাঁর নাম মার্গারেট মিচেল।

অনেক লেখক বই লিখে অনেক খ্যাতি পেয়েছে, কিন্তু মার্গারেট মিচেলের মত একখানা বই লিখে কেউ আজ পর্যন্ত অত খ্যাতি পায়নি। বইটার নাম—'গন উইথ দ্য উইণ্ড।'

এই উপন্যাসটা লেখার একটা ইতিহাস আছে।

সাদাসিধে চেহারার একজন মেয়ে। লেখাপড়ার বেশি ধার ধারেনি। একদিন হাসপাতালে গিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেয়াল হলো যে একটা উপন্যাস লিখবে। জীবনে আগে কখনও মেয়েটি উপন্যাস লেখেনি। কী করে উপন্যাস লিখতে হয় তাও জানে না। শুধু মা দিদিমার মুখে নিজের দেশের গল্প শুনেছে। গল্পগুলো শুনে প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগতো।

একদিন স্বামী এসে কাগজ কলম দিয়ে গেল।

কাগজ তো দিয়ে গেল। কিন্তু উপন্যাস লিখতে হয় কী করে? কিছুই জানা নেই মেয়েটার। ভরসার মধ্যে শুধু আছে দেশের অতীতের কাহিনী। তাও বইতে পড়া কাহিনী নয়, মা দিদিমার কাছে শোনা।

দিদিমা গল্প বলতো যুদ্ধ-বিগ্রহ। রাজা-প্রজা। গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখের গল্প।

মার্গারেট উদ্‌গ্রীব আগ্রহে শুনতো। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—তারপর?

দিদিমার গল্প আর শেষ হতে চাইতো না যেন। ছোট মেয়েটি সেই গল্প শুনতে শুনতে অন্য এক দেশে চলে যেতো।

হাসপাতালে শুয়ে লিখতে লিখতে মার্গারেট যেন সেই সব যুগে চলে গেল। যত লিখতে লাগলো তত আরো কলম চললো। আরো গল্প, আরো গল্প। গল্প যেন আর শেষ হতে চায় না। কখনও শেষের দিকটা আগে লেখে, আগের দিকটা শেষে। যা একবার লেখে, তা পরের বারে কেটে ফেলে। কিছুতেই যেন আর পছন্দ হয় না।

স্বামী আসে হাসপাতালে। জিজ্ঞেস করে—এসব কী লিখছো?

মার্গারেট বলে—গল্প।

গল্প! গল্প শুনে অসন্তুষ্ট হয় স্বামী। বলে—গল্প লিখে কী লাভ? কেন গল্প লিখে মিছিমিছি শরীর খারাপ করছো? কে তোমার ও গল্প পড়বে?

মার্গারেট বলতো—কেউ না পড়ুক, আমি সময় কাটাবার জন্যে লিখছি। সমস্তদিন একলা শুয়ে শুয়ে কী করি? একটা কিছু করতে তো হবে?

একটা কিছু করার জন্যে যে বইটা লেখা—সেই বই-ই যে একদিন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের বাহন হবে তা সেদিন সেই মেয়েটি কল্পনা করতে পারেনি।

শুধু মেয়েটিই বা কেন, তার স্বামীও কল্পনা করতে পারেনি। আর হাসপাতালে থাকতেও হলো অনেক দিন। হাসপাতালে না এলে সে-বই লেখবার ইচ্ছেও হতো না। আর হাসপাতালে ভর্তি হতেও হলো একটা দুর্ঘটনার ফলে।

স্বামী স্ত্রী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। এমন সময় আচমকা একটা গাড়ি ধাক্কা দিলে মার্গারেটকে।

কিন্তু মার্গারেটের অনেক সৌভাগ্য যে গাড়িটা সেদিন তাকে ধাক্কা দিয়েছিল। আর ধাক্কা দিয়েছিল বলেই হাসপাতালে গেল! আর হাসপাতালে গেল বলেই বইটা লেখা হলো!

একদিন ও দেশের প্রকাশক মহলে কেমনভাবে যেন খবরটা পৌঁছে গেল যে মার্গারেট মিচেল নামে একজন অখ্যাত মহিলা একটা উপন্যাস লিখে ফেলেছে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে। আর বইটা যারাই পড়েছে তাদের নাকি ভালো লেগেছে।

ওদের দেশের প্রকাশক ঠিক আমাদের দেশের মত প্রকাশক নয়। তারা আরো বেশি করিতকর্মা, আরো বেশি উৎসাহী। বইকে কেমন করে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার ফন্দি-ফিকির তারা আরো বেশি জানে।

একদিন কার মুখ থেকে খবর পেয়ে তারা এল।

মার্গারেট লজ্জায় পড়লো। আমি? আমি সামান্য মানুষ, আমি লিখব উপন্যাস, আর সেই উপন্যাস আবার ছাপা হবে?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো মার্গারেটের মুখ।

কিন্তু স্বামী পড়তে দিলে সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। তারা নিয়ে গেলেন সে-বই। বললেন—চমৎকার নাম বইটার। 'গন উইথ দ্য উইণ্ড'—কিন্তু মানে কী?

মার্গারেটের স্বামী বললে—তা জানিনে মশাই, আমি পড়েও দেখেনি। আপনারা পড়ে দেখবেন, যদি ভালো লাগে তো ছাপবেন, আর ভালো না লাগলেও আমাদের দুঃখ নেই। ছাপবার জন্যে তো আমার স্ত্রী ওটা লেখেনি। শুধু সময় কাটাবার জন্যে লিখেছে।

প্রকাশকরা জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা রয়্যালটি দিতে হবে?

স্বামী বললেন—যা সচরাচর দিয়ে থাকেন তাই-ই দেবেন। যেমন যেমন বিক্রি হবে তেমনি-তেমনি দেবেন।

প্রকাশকরা যাবার সময়ে বলে গেল—আমরা খবর দেব—

কিন্তু খবর যখন এল, তখন তার সঙ্গে কণ্ট্রাক্টও এল, চেকও এল। ম্যাকমিলান কোম্পানী একটা বিরাট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট এইচ-এম-ল্যাথাম নিজে এসে হাজির লেখিকার কাছে। বললেন—এ রকম উপন্যাস আমি আগে পড়িনি।

চুক্তি সই হয়ে গেল। চেকও ক্যাশ হলো। একদিন বইও বাজারে বেরোল।

আর বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তার যে ঝড় বয়ে গেল উপন্যাসের ইতিহাসে তা অভিনব। সমস্ত আমেরিকাতে সবচেয়ে নামজাদা ছিল তখন ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেণ্ট। ঠিক তার পরেই মার্গারেট মিচেলের জনপ্রিয়তা।

জনপ্রিয়তা যে কী জিনিস, তা বই-এর বাজারে মার্গারেট মিচেল যেমন করে জানলো, পৃথিবীর আর কোনও লেখক আর তেমন করে জানেনি। প্রথম দিনেই বইটা বিক্রি হলো পঞ্চাশ হাজার কপি।

শুধু মার্গারেট নিজে অবাক নয়, সমস্ত আমেরিকার লোকও অবাক। এমন বইও লেখা হয়, এমন বইও লেখা হতে পারে?

কে লিখেছে এ বই? কোথায় থাকে সে? কী রকম তার চেহারা?

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত উপন্যাস লেখা হয়েছে যত লেখক-লেখিকা জন্মগ্রহণ করেছে, সব তুচ্ছ হয়ে গেল 'গন উইথ দ্য উইণ্ড'-এর কাছে। সব যেন ছোট হয়ে গেল মার্গারেট মিচেলের কাছে। পাঠকদের মনে হলো এতদিন পরে যেন সত্যিকারের একজন লেখক এসেছে।

ঠিকানা যোগাড় করে লোকেরা এসে হাজির হলো বাড়িতে।

—কাকে চাই?

—মিসেস মার্গারেট মিচেল এ বাড়িতে থাকেন?

স্বামী উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

—একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্বামী জিজ্ঞেস করলেন—কী দরকার?

তারা বললে—আমরা শুধু একবার তাঁকে দেখবো।

কিন্তু দেখবে কাকে? সেই লেখিকা তো তখন খ্যাতির ভারে থরথর করে কাঁপছে। অখ্যাতির মত খ্যাতিও তো একটা বোঝা। খ্যাতি যখন আক্রমণ করে মানুষকে তখন সে বড় মারাত্মক হয়ে আক্রমণ করে। আর খ্যাতি যে কত বড় মারাত্মক তা শুধু খ্যাতিবানরাই জানে। অখ্যাতি মানুষকে কষ্ট দেয়

বটে, কিন্তু খ্যাতি মানুষকে বিন্দু বিন্দু করে দগ্ধে মারে। অখ্যাতির যন্ত্রণা অসহ্য কিন্তু খ্যাতির যন্ত্রণা সহ্যের অতীত। অখ্যাতি অনেককে নিঃসঙ্গ করে, কিন্তু খ্যাতি নিরাবরণ করে সকলকে। খ্যাতি সকলকে দূরে ঠেলে দেয়।

মার্গারেট মিচেল ছোটোখাটো মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। মাঝারি লেখা-পড়া করে ডাক্তারি পড়তে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছিল। কিন্তু এক বছর পরেই মা মারা যাওয়াতে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হলো তাকে। কারণ মেয়ে যদি কলেজে যায় তো সংসার দেখবে কে?

তা সংসার দেখতে দেখতেই একদিন খবরের কাগজের অফিসে চাকরি নিয়েছিল মার্গারেট। তখন তার বয়েস বাইশ, বাড়িতে মা নেই কিন্তু বাবা আছে, ভাই আছে। তাদের রান্না-বান্না দেখে ছুটতে হতো অফিসে। খবরের কাগজে রবিবাসরীয় সংস্করণের কাজ। এই রকম করেই চলছিল। যখন পঁচিশ বছর বয়েস তখন একদিন বিয়েও হলো তার। তারপর যখন ছাব্বিশ বছর বয়েস তখন একদিন রাস্তা দিয়ে স্বামীর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা গাড়ির ধাক্কা লেগে পা দুমড়ে গেল, পায়ের হাড় ভেঙে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হলো হাসপাতালে।

সেই ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬—এই দশ বছর লেগেছিল বইটা লিখতে। সেই দশটা বছরই যা আনন্দে কেটেছে। তারপর থেকেই এল অভাবনীয় খ্যাতির যন্ত্রণা। ষোলটা ভাষায় অনুবাদ হলো সেই বই। চারিদিক থেকে হাজার হাজার চিঠি আসতে লাগলো তার কাছে। অত চিঠি কি পড়ে ওঠা যায়? তারপর আছে প্রাইজ। একটার পর একটা পুরস্কার পেতে লাগলো বইটা। পুলিৎজার প্রাইজ পেল ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৯ সালে যে কলেজে পড়তো মার্গারেট, তারা এম-এ ডিগ্রী দিলে।

ততদিনে ১৯৩৯ সালের মধ্যেই কুড়ি লক্ষ কপি বই বিক্রি হয়ে গেছে।

কিন্তু এত কাণ্ড যাকে নিয়ে ঘটছে সেই মার্গারেট কোথায়? সে কারো সঙ্গে দেখা করে না। কোনও পার্টিতে যায় না। সে তখন খ্যাতির ভিড় থেকে ক্রমেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। কেউ দেখা করতে এলে দেখা করতে চায় না।

স্বামী বলে—তুমি বাইরে বেরোও। ওদের সঙ্গে দেখা করো। ওরা অনেক বড়লোক, ওদের সঙ্গে মিশলে তোমার অনেক নাম হবে। আরো অনেক টাকা হবে।

মার্গারেট বলে—না, আমার নাম ভালো লাগে না, আমার টাকা ভালো লাগে না, আমাকে শুধু একটু নিরিবিলিতে থাকতে দাও।

—কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর লোক যে তোমাকে দেখতে চাইছে, তাদের কী বলে ঠেকাবো ?

মার্গারেট বললে—তা আমি জানি না।

স্বামী বললে—তোমার কত নাম হয়েছে জানো তুমি? কল্পনা করতে পারো তুমি ?

মার্গারেট বললে—আমার জেনে দরকার নেই। আমি এই বেশ আছি।

সত্যি মার্গারেট খ্যাতির পীড়ন সহ্য করতে পারতো না। রোজ হাজার হাজার চিঠি আসতো বাড়িতে। সকলের সব চিঠির উত্তর দেওয়া কি সোজা? চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্যে দু'জন সেক্রেটারী রাখতে হলো। তারা দিন-রাত কেবল চিঠির উত্তরই দিয়ে যায়।

শেষে আর দেশে থাকতে পারলো না মার্গারেট। আর ভালো লাগলো না খ্যাতি। বললে—চলো কোথাও পালিয়ে যাই।

স্বামী বললে—কোথায় পালাবে ?

মার্গারেট বললে—যেখানে হয়, এমন জায়গায় চলো, যেখানে গেলে কেউ আমাকে চিনবে না।

স্বামী বললে—তা কি হয়? সব জায়গাতেই তোমার নাম ছড়িয়ে গেছে। সব জায়গাতেই লোক তোমাকে চিনে ফেলবে।

শেষকালে সত্যিই থাকা গেল না সেই জায়গায়। একদিন দু'জনে স্বদেশ অ্যাটল্যাণ্টা ছেড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, যে-খ্যাতির জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঁচিয়ে থাকে সেই খ্যাতিই একদিন দুর্বহ হয়ে উঠলো মার্গারেটের কাছে।

কিন্তু গুণীর গুণ কি তাতেই চাপা থাকে? গুণ হচ্ছে আগুনের মত। একবার ছড়াতে আরম্ভ করলে তাকে আর ঠেকানো যায় না। লক্ষ লক্ষ কপি বই উধাও হয়ে যেতে লাগলো নিমেষের মধ্যে।

মার্গারেটের শেষ জীবনে একটা হিসেব নেওয়া হয়েছিল। বইটা ছাপা হবার তের বছর পর পর্যন্ত আটত্রিশ লক্ষ বই বিক্রি হয়েছে। গড়ে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার বই বিক্রি হয়েছে শুধু আমেরিকাতেই। জার্মানীতে যখন নাৎসী-পার্টি ক্ষমতায় এল তখন ওই বই পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে। আমেরিকা ছাড়া

একুশটা দেশে কুড়ি লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। তারপর আছে জাল বই। কত প্রকাশক যে কত লক্ষ জাল বই প্রকাশ করে বড়লোক হয়েছে তার আর গোনাগুনতি নেই। কেউ তার হিসেব পায়নি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু মুশকিল বাধলো লেখিকাকে নিয়ে।

প্রকাশকরা তখনও পেছনে লেগে আছে—আর একটা এমনি বই লিখুন ম্যাডাম, আরো কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিন।

কিন্তু সে চিঠির কোন উত্তর দেয় না মার্গারেট।

শেষ যখন কোথাও মার্গারেটকে পাওয়া যায় না তখন চারিদিকে লোক চলে গেল লেখিকাকে খুঁজে বার করবার জন্যে। প্রায় দশ বারো জন মেয়ে বলতে লাগলো তাদেরই নাম মার্গারেট। কত যে জাল মার্গারেট বেরোল তার ঠিক নেই। জাল বই ও জাল লেখিকা বেরিয়েও আসল মার্গারেটের খ্যাতি নিষ্প্রভ করতে পারলে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মার্গারেট মিচেলের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগলো। তার খ্যাতি আকাশে গিয়ে ঠেকতে লাগলো।

কিন্তু যে-বইএর এত আদর, সে বই সম্বন্ধে সিনেমা কোম্পানীই বা চুপ করে থাকবে কেন? তাদেরও তো সেই উপন্যাসকে ভাঙিয়ে পয়সা উপায় করা চাই। খ্যাতি যখন আসে তখন তাকে ভাঙাবার জন্যে মানুষের উৎপাতের যে অভাব হয় না। অথচ উপন্যাসের যে আসল লেখিকা তার কোনও মাথা-ব্যথা নেই সিনেমা সম্বন্ধে। যেমন শরৎচন্দ্রের ছিল না। বা কোনও মহৎ লেখকেরই থাকে না। কিংবা থাকা উচিত নয়। অথবা এও বলা যায় যে সিনেমার জন্যে বইটা লেখা নয় বলেই হয়ত সিনেমা কোম্পানীর লোকরা 'সাহেব বিবি গোলামে'র ছবি তৈরি করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আমি বরাবর দেখেছি—যে লেখক সিনেমার কথা না ভেবে গল্প লেখেন তার গল্পের জন্যে সিনেমার লোক লালায়িত হয়। এটাই নিয়ম। তাই হলিউড থেকে যখন মার্গারেটের নামে চিঠি যেতে লাগলো—সে চিঠির উত্তর কেউ দিলে না। তোমরা আমার গল্পের জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে টাকা উপায় করবে তাতে আমার গরজটা কিসের? গরজ তো তোমাদের, সুতরাং তোমরাই বারবার চিঠি লিখে মরো।

আসলে মার্গারেট ততদিনে খ্যাতির শীর্ষে উঠে গেছে। তাকে আরো লেখবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে পাবলিশাররা। পাঠকরা তার কাছে আরো

অন্য উপন্যাস দাবী করছে। তুমি আর একখানা বই লেখো ম্যাডাম। আমাদের আরো আনন্দ দাও। আর একখানা বই লিখে দেখিয়ে দাও যে তুমি সত্যিই আরো ভালো বই লিখতে পারো।

অনেকেই বলতে লাগলো—লেখিকা ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কোনও বই লিখতে পারবে না। একখানা বই কোনও রকমে লিখে ফেলেছে।

স্বামী বললে,—হ্যাঁ গো, তুমি আর একখানা বই লিখতে আরম্ভ করো না।

সত্যিই লেখক জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই। মাত্র একখানা ভালো বই লিখলে চলবে না। আরোএকখানা ভালো বই লিখতে হবে; আরো আরো একখানা ভালো বই। এ-খানার চেয়েও যেন সেটা ভালো হয়। তারপর আরো ভালো বই। উত্তরোত্তর ভালো। একখানা বই লিখেছ বলে আমরা তোমায় ক্ষমা করবো না, আরো ভালো একখানা বই লিখতে হবে। এইরকম করে ভালোর চেয়ে আরো উত্তরোত্তর ভালোর সংগ্রামে যতক্ষণ না তুমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছো, ততক্ষণ আমরা তোমায় রেহাই দেব না। তোমার মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তোমার পেছু ধাওয়া করবো। না লিখতে পারলে আমরা তোমায় দুয়ো দেব।

মার্গারেটের মনেও তখন সেই ভয় উদয় হয়েছে। আরো একখানা বই সে লিখতে পারতো হয়ত, কিন্তু প্রথম বইখানাতেই কেন তার এত খ্যাতি হলো? কেন খ্যাতি তার এমন করে পেছু নিলে? কেন তোমরা বললে, এমন ভালো উপন্যাস এর আগে কখনও লেখা হয়নি। কেন এত প্রশংসা করে তোমরা আমায় ভয় পাইয়ে দিলে?

মার্গারেট গ্রামের নিরিবিলিতে নির্জনে আবার একদিন কাগজ-কলম নিয়ে বসলো। দু-চার লাইন লিখলে। কিন্তু পছন্দ হলো না। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে কাগজটা। আবার নতুন কাগজ নিলে, আবার দু-চার লাইন লিখলে, আবার সেটা ছিঁড়ে ফেললে। শেষে হতাশ হয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। ভগবান একটা গল্প দাও ভগবান; এ গল্পটার চেয়েও আরো ভালো গল্প।

সেদিনকার সেই মেয়েটির যন্ত্রণা কেউ বুঝেছিল কিনা কে জানে। লেখকের কলমে যখন লেখা আসে না, তখনকার যন্ত্রণা লিখে বাইরের লোককে বোঝাতে যাওয়াও তো বোকামি। যে সব কিছু বোঝে সেই স্বামীও তখন বোঝে না। একমাত্র বোঝে কেবল সেই লেখক, যে ভুক্তভুগী!

স্বামী তাকে বোঝায়, তাকে সান্ত্বনা দেয়।

বলে—তাতে কী হয়েছে, তুমি আবার চেষ্টা করো। খুব ভালো হবে, নিশ্চয় ভালো হবে।

মার্গারেট কাঁদে! সে কান্নার অর্থ অন্তর্যামীর কানে গিয়ে যদি পৌঁছতো তো মার্গারেটের জীবনের ইতিহাস হয়ত অন্যরকম হতো। কিন্তু তা হলো না। খ্যাতির অক্টোপাশ তখন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে। খ্যাতি তাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেছে। বাইরে থেকে একেবারে তাকে নিরুদ্দেশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এত খ্যাতি কবে কোন লেখক পেয়েছিল? কবে লেখককে খুঁজে পাবার জন্যে পাঠক এমন করে ব্যাকুল হয়েছিল? কবে আসল লেখকের নাম নিয়ে এমন করে জাল লেখকের বেসাতি চলেছিল? কবে এমন করে জাল বই ছাপিয়েছিল জাল প্রকাশকেরা।

মাত্র একখানা তো বই। সেই একখানা বই-ই এত সার্থক হওয়া কি উচিত? ভালো বই লেখা ভালো, কিন্তু তা বলে এত ভালো বই লেখাও কি ভালো?

এর উত্তর দেবে কে? মার্গারেটের জীবনের ভাগ্য দেবতা কেন এত উদার হয়েও কেন এত বাদ সাধলেন? বইখানা আর একটু কম প্রশংসা পেলে বিধাতা-পুরুষের কী এমন লোকসান হতো? এত টাকা, এত খ্যাতি, এত প্রতিপত্তি একজন সামান্য মহিলাকে না দিলে কি তাঁর ঘুম হচ্ছিলো না?

শেষকালে হলিউডের একজন এজেণ্ট একেবারে সশরীরে বাড়িতে এসে হাজির।

স্বামী বললে—কী দরকার আপনার?

এজেণ্ট বললে—আমি অনেক দিন থেকে মিসেস মার্গারেট মিচেলকে খুঁজছি। তাঁর গল্পটা নিয়ে সিনেমা করা হবে বলে।

স্বামী বললে—আচ্ছা আপনি বসুন। আমি মিসেসকে ডেকে আনছি।

সেদিন কলেজ স্ট্রীটে এম-সি সরকারের বই-এর দোকানে লুকিয়ে বসে আছি। হঠাৎ সুধীরদা (অর্থাৎ পরলোকগত সুধীরচন্দ্র সরকার) এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। একেবারে পাকা আমের মত টকটকে ফরসা গোলগাল চেহারা। মাথা ভর্তি টাক।

সুধীরদা বললেন—নম্ভবাবু, এই-ই হচ্ছে বিমল মিত্তির।

নম্ভবাবু একেবারে লাফিয়ে উঠলেন—আরে, মশাই আপনিই? আর এদিকে আপনাকে আমরা এখানে সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছি?

সুধীরদা বললেন—ইনি নম্ভবাবু হলেও এঁর নাম হলো এম. এন, ঘোষ, নিউ থিয়েটার্সের ল-অ্যাডভাইসর।

নম্ভবাবু বললেন—চলুন, এখানে বসে বৈষয়িক কথা হবে না, কফি হাউসে বসে কথা বলি গিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম—'সাহেব বিবি গোলাম' সম্বন্ধে বৈষয়িক কথা?

নম্ভবাবু বললেন—আর তা নয়তো চলুন, 'রূপবাণী' সিনেমা হাউসে। সেখানে একেবারে নিরিবিলি, কফি না খান, শ্যামবাজারের সন্দেশ খাবেন।

নম্ভবাবু শেষ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন 'রূপবাণী' সিনেমা হাউসের ভেতরে। তখন সেখানে কী একটা ইংরেজি ছবি চলছিল। আমাকে নিয়ে পেছনের সীটে বসালেন। তিনি ভাবলেন ছবি দেখলে হয়ত আমার মন গলে যাবে। এবং আমি রাজী হব গল্প বিক্রি করতে। ছবি দেখতে দেখতেই নানা-রকম কথা চলতে লাগলো। বৈষয়িক কথাবার্তা।

কিন্তু আমার বড় ভয় করতে লাগলো। ভাবলাম এও বোধহয় আমার কাছ থেকে গল্প আদায় করবার একটা ফন্দি। আমি সামান্য লোক, মানীলোক যদি সামান্য লোককে খাতির করে তাহলে ভয় হওয়াই স্বাভাবিক।

ছবি শেষ হবার পর খাওয়া। সত্যিই ভালো সন্দেশ, বাজারের শ্রেষ্ঠ। মনটা প্রফুল্ল হলো খুব। তাছাড়া আমিও তো মানুষ। ভালবাসা পেলে কে না খুশী হয়! ছোটাই মিত্র মশাই-এর যে প্রস্তাব আমি অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলাম নম্ভবাবুর সেই একই প্রস্তাব সহজে প্রত্যাখ্যান করা গেল না। কারণ তখন তিনি আমাকে নুন খাইয়ে দিয়েছেন।

নম্ভবাবু বললেন—কালকে একবার এম.সি. সরকারের দোকানে আসবেন?

জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

—দরকার আছে।

কিছুটা আন্দাজে বুঝতে পারলাম, আবার কিছুটা বুঝতে পারলাম না।

বললাম—আসবো।

মনে মনে খুব খুশী ছিলাম। কিন্তু আবার অস্বস্তিও হচ্ছিল। আমার গল্পের সিনেমা হবে। এতো আনন্দেরই কথা। কিন্তু আমার অজ্ঞতাকে যদি

ওঁরা সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে চরম সুবিধে আদায় করে নেন ? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি। কার পরামর্শই বা নিই। কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বাঙলাদেশে সাহিত্যিকদের কোনও সংস্থাই নেই যে তাদের কাছে পরামর্শ চাইবো।

যথা সময়ে চা মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে এলাম। আসার সময়ে কথা দিয়ে এলাম যে দু-চারদিন বাদে আবার এম.সি. সরকারের দোকানে দেখা হবে।

তখন একটা চাকরিও করতাম আমি। তার ওপরে ছিল লেখা। তারপরে বাঙলাদেশে যখন লেখক হয়ে জন্মেছি তখন শত্রুতা তো ভোগ করতে হবেই। সুতরাং তার মোকাবিলা করতেও কিছু সময় ব্যয় করতে হবে বৈকি।

আর তার ওপর আছে পড়া। একখানা ভালো বই লেখার বিপদের কথা আগেই বলেছি। সবাই হাঁ করে আছে আমার মুখের দিকে। এবার আমি কী লিখি। একবার না হয় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, এর পরের বারে দেখা যাবে কী রকম মহালেখক বিমল মিত্তির।

বাঙলাদেশে যে কোনও কাজ করতে গেলে অর্ধেক শক্তি ব্যয় হয় আত্মরক্ষা করতে। আত্মরক্ষার জন্যে যদি বেশি সময় ব্যয় করতে না হতো তো বাঙালীরা অনেক বেশি কাজ করতে পেত। এই ব্যাপারে অন্য জাতের মানুষদের অনেক বেশি সুবিধে। তারা কাজ করে যায়, পেছন থেকে তাদের ছুরি খাবার ভয় করতে হয় না। পরশ্রীকাতর জাতের মানুষ হয়ে যে জন্মেছে তাকে এ দুর্ভোগ সইতেই হবে।

গ্রাহাম গ্রীণের যে অবস্থা ছিল, আমার তখন সে অবস্থা নয়। গ্রাহাম গ্রীণকে চাকরি করতে হয়নি। তার মনের কথা ছিল এই যে লেখককে যদি কারো কাছে চাকরি করতে হয় তো একমাত্র নিজের কাছেই চাকরি করতে পারে সে। নিজের হুকুম নিজে তামিল করার স্বাধীনতা না থাকলে, লেখক ভালো লেখা লিখতে পারে না। সেই স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যেই গ্রীণকে একটার পর একটা গল্পের চিত্রস্বত্ব সিনেমা কোম্পানীকে বেচতে হয়েছে। এবং প্রত্যেকবারই অনুতাপ দগ্ধ হতে হয়েছে সেই গল্পের অপমৃত্যু দেখে। কিন্তু তাঁর অন্য কোনও গতি ছিল না। আমার নিজের দিক থেকে কিন্তু সেই অসুবিধে ছিল না।

ব্যাপারটা আমি আর কাকে বলবো ? একদিন কথায় কথায় বললাম সাগর-বাবুকে। 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষকে।

বললাম—ওঁরা আমাকে বড় বিব্রত করছেন, আপনি এর একটা ফয়শালা করে দিন—আমি আর পারছি না।

সাগরবাবু বললেন—ঠিক আছে, আমি ছোটাইবাবুকে চিনি, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে দেব। আপনি ও নিয়ে আর কিছু ভাববেন না।

তিনি তো বললেন 'ঠিক করে দেব', কিন্তু ততদিন আমি বাঁচি কী করে? অন্য আরো দুজন প্রোডিউসার, তাঁরাও আছেন। এটা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বুঝতে পারলুম না। আমার প্রকাশক ওদিকে সাবধান করে দিয়েছেন—খুব সাবধান বিমলবাবু, কিছুতেই সিনেমাতে বই দেবেন না। বই মার খাবে।

সাগরবাবু ছোটাইবাবুর বাড়ি যেতেই ছোটাইবাবু বললেন—এ কী রকম লেখক মশাই বিমলবাবু, অন্য সব লেখক সিনেমায় বই দেবার জন্যে ছটফট করছে, আর বিমলবাবু কিনা একেবারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ব্যাপারটা কী?

সাগরবাবু বললেন—সেই কথা বলতেই বিমলবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে। ওঁকে একদিকে সবাই মিলে গল্প বিক্রি করতে বারণ করছে, আবার অন্যদিকে সবাই বিক্রি করতে বলছে—ওঁর প্রকাশক সিনেমায় বই বেচতে বারণ করেছে।

ছোটাইবাবু বললেন—কেন, ওঁর কি টাকার দরকার নেই?

সাগরবাবু বললেন—টাকার দরকার আছে, কিন্তু ওঁর ভয় আপনারা ছবি করে ওঁর বই নষ্ট করে দেবেন। সাহিত্যকে ও টাকার চেয়েও বেশি ভালবাসে।

ছোটাইবাবু হো হো করে দমফাটানো হাসি হাসতে লাগলেন। বললেন—মুখে ওরকম সবাই বলে মশাই। আমার তো কোনও লেখককে আর দেখতে বাকি নেই। শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আজকালকার চুনোপুঁটি সব সাহিত্যিককে আমার চেনা হয়ে গেছে! টাকার কাছে সবাই জব্দ।

শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা দরদস্তুর সব ঠিক করে সাগরবাবু ফিরে এলেন। আমাকে সব রিপোর্ট দিলেন। শুনে আরো আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। আড়ষ্ট হয়ে গেলাম এই ভেবে যে নিউ থিয়েটার্স আমার গল্প নিয়ে ছবি করবেই। ছবি করাতে আমার আপত্তি নেই। আড়ষ্ট হয়ে গেলাম ওদের আগ্রহের তীব্রতা দেখে। তবে কি আমার বইকেও ওরা পয়সা উপায়ের যন্ত্র হিসাবে ধরে নিয়েছে? কদিন ধরে সমস্ত রাত ঘুম হলো না। অফিসে যাই কাজকর্ম করি কিন্তু

প্রকাশকের সতর্কবাণীটাও কানে বাজছে। তিন চারজনকে এড়াই কী করে? এবং সত্যিকথা বলতে গেলে এড়াবোই বা কেন? আমি তো চুরি করিনি।

হঠাৎ চারিদিকে রব উঠলো আমি নাকি 'সাহেব বিবি গোলাম'এর গল্প শিবনাথ শাস্ত্রীর বই থেকে চুরি করেছি। কয়েকটি পত্রিকায় ছাপাও হলো সে কথা। সম্পাদকরা আমাকে সে কথার প্রতিবাদ করতে চিঠি লিখলেন। আমি উত্তর দিলাম না। কেন উত্তর দেব? পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়—বাঙলায় তো প্রবাদই আছে।

শেষকালে একদিন এম. সি. সরকারের দোকানে আবার গেলাম।

মার্গারেট মিচেল বাইরে বেরিয়ে এলেন কাঁপতে কাঁপতে। স্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন হলিউডের সিনেমা কোম্পানীর প্রোডিউসারের সঙ্গে।

ভদ্রলোক বললেন—গুড্ মর্নিং।

মার্গারেটও বললেন—গুড্ মর্নিং।

তারপর কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ বেরোল। লম্বা চুক্তিপত্র। অত পড়বার ধৈর্য নেই কারো। হলিউডের চুক্তিপত্র মানে এক কথায় দাসখৎ। সেই দাসখতের তলায় সই করবার জায়গা।

মার্গারেটের হাত তখন কাঁপছে। বললে—কোথায় সই করবো?

ভদ্রলোক বললেন—এখানে।

মার্গারেট সেখানেই সই করে দিলে। লিখলে—মিসেস মার্গারেট মিচেল।

আমিও গিয়ে দেখি নন্তবাবু ঠিক বসে আছেন। নন্তবাবু আর সুধীর সরকার। দুজনেই ফিল্ম সেনসার বোর্ডের মেম্বার। আমাকে দেখেই বললেন—কী হলো, এতদিন আসেননি কেন?

বলে হাসতে হাসতে আমার দিকে একটা চেক বাড়িয়ে দিলেন।

চেকটা আমাকেও হাত বাড়িয়ে নিতে হলো। যেমন করে প্রকাশকের কাছ থেকে চেক নিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি করেই। কিন্তু সেবার চেকটা নিয়ে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিলাম। এবার কী করবো বুঝতে পারলাম না। কারণ মনে হলো এটা যেন ঠিক আমার প্রাপ্য নয়। এটা দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা ওদের।

চেকটা পকেটে নিরাপদে রেখে বাড়ি এলাম। বুকের কাছটায় খচ্ খচ্

করতে লাগলো। সামান্য টাকা হোক, ও টাকাতে আমার দুঃখ ঘুচবে না বটে, কিন্তু তাই-বা কেন নিলাম? আমি টাকার ব্যাপারে মিতব্যয়ী মানুষ। মিতব্যয়ী এই জন্যে যে তাতে সাহিত্যের ওপর অনাবশ্যক চাপ পড়ে না। অভাব বোধটাকে আমি মুখচাপা দিয়ে রাখতে শিখেছি। আমাদের মত লোকের অভাব কি কখনও মেটে? লক্ষ টাকাতেও যখন অভাব মিটবে না তখন চাহিদাটাকে রাশ টেনে রাখাই ভালো। প্রয়োজনটাকে বিলাসিতা বলে ভাবাই যুক্তিযুক্ত। তাতে সাহিত্যের প্রতি সুবিচার হয়, অবসরও পাওয়া যায় প্রচুর। ফলে সাহিত্য-সৃষ্টির ওপর মনোযোগ দেওয়া যায় বেশি করে।

যা হোক, পরামর্শ আর কার কাছে চাইবো? পরের দিন গেলাম ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর ত্রিদিবেশ বসুর কাছে। ত্রিদিবেশ বসু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তা আমি জানতাম।

গিয়ে সব বললাম তাঁকে।

তিনি আঁৎকে উঠলেন। বললেন—করেছেন কী, চেক নিয়ে নিয়েছেন? ভাউচারে সই করেছেন নাকি?

বললাম—তা জানি না, কীসে যেন একটা সই করিয়ে নিলেন।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন—সর্বনাশ, ও চেক যেন ক্যাশ করবেন না। তাহলে মুশকিলে পড়বেন। কনট্র্যাক্ট না দেখে কখনও চেক নিতে আছে? তাতে কি টার্মস্ বসিয়ে দেবে তা কে বলতে পারে। সিনেমার লোকদের আপনি চেনেন না।

জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কী হবে?

ত্রিদিবেশবাবু বললেন—আপনাকে আমি কালই নিয়ে যাবো আমার অ্যাটর্নীর কাছে, তিনি যেমন যেমন বলবেন তেমনি-তেমনি হবে।

অগত্যা তাতেই রাজী হলাম। একজন অন্তত পাওয়া গেল, যার কাছে সুপরামর্শ পাওয়া যাবে। ত্রিদিবশবোবু বেশ ধমকাতে লাগলেন আমাকে। বললেন—আপনার কী এমন টাকার দরকার ছিল যে হঠাৎ চেকটা নিতে গেলেন? আপনার কি খুবই টাকার দরকার ছিল?

বললাম—না, মোটেই না। বই থেকেই তো ভালো রয়্যালটি আসছে।

—তবে? আর কখ্খনো এমন ভুল করবেন না। টাকা দেওয়াও যেমন বিপদ, টাকা যার-তার কাছ থেকে নেওয়াও তেমনি বিপদজনক।

সেই বহুদিন আগে—ত্রিদিবেশবাবুর কাছ থেকে শেখা বিদ্যেটা এখনও

অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। টাকা দিতে এলেই ভেবে-চিন্তে হিসেব করে নিই।

ত্রিদিবেশবাবু আরো বললেন—টাকা দেওয়ার চাইতে নেওয়াতে বেশি রিস্ক, এটা সব সময়ে মনে রাখবেন।

একদিকে তখন 'সাহেব বিবি গোলাম' নিয়ে নিন্দের ছড়াছড়ি, চুরির অভিযোগ, অন্যদিকে তখন তা সিনেমা করার জন্যে তেমনি হুড়োহুড়ি।

ভেবে দেখেছি খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অখ্যাতিটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় 'যেখানেই যশ সেখানেই নিন্দা।' কথাটা যে কত সত্য তা আমার মত বোধকরি আর কেউই উপলব্ধি করেনি। খ্যাতির যে পরিতৃপ্তি তা ভোগ করবার সৌভাগ্য আমার কখনও হয়নি। কিংবা এও হতে পারে অখ্যাতি হয়েছিল বলেই খ্যাতির একটু রশ্মিকণা দেখতে পেলাম।

মনে আছে সেদিন আমাকে ঈর্ষা করবার লোকেরও যেমন অভাব ছিল না, আবার কুৎসা করবার লোকেরও তেমনি ছিল না কমতি। সুবিখ্যাত পত্রিকা-গুলোর পাতায় সে কুৎসা ছাপার অক্ষরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। অথচ আবার তাদের কাছ থেকেই আমার লেখারজন্যে জোর তাগিদ আসতো। সাধারণ কুৎসা হলে তবু মানে বুঝতে পারি। লেখার নিন্দে হলেও তার একটা অর্থ হয়, তা নয়-এ অন্য ধরনের শত্রুতা। অর্থাৎ, কেন আমার বই এত বিক্রি হবে?

সিনেমা কোম্পানীরা বোধহয় তাই-ই চায়। সহজে অর্থ উপার্জন করতে গেলে বহু-বিতর্কিত, বহু পঠিত, বহু প্রশংসিত বই-এর সন্ধান করে। সে-দিক দিয়ে তাঁরা কিন্তু মোটেই ভুল করেননি। হতভাগ্য আমিই যে এত আগ্রহ, এত সমাদর কোনও কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারলো না। আমি আগেও যা ছিলাম, পরেও তাই-ই রয়ে গেলাম। অর্থাৎ মনের গোপনতম কোণে অহঙ্কারটুকু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

পরের দিন যথাসময়ে ত্রিদিবেশবাবুর গাড়িতে তাঁর অ্যাটর্নীর অফিসে গেলাম। অ্যাটর্নী কী বস্তু তা তার আগে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

তিনি বললেন—ছবির কনট্র্যাক্ট যদি করতেই হয় তো আমি যেমন ড্র্যাফট্ করে দেব তেমনি করে করতে বলবেন, একটুকুও ঠকবেন না—

বলে টাইপিস্টকে ডেকে নতুন ড্র্যাফ্‌ট দিয়ে দিলেন। সে ভদ্রলোক সেটা পরিষ্কার টাইপ করে আমার হাতে দিলেন। জিনিসটা শেষ হতে প্রায়

আধঘণ্টা লাগলো। সেই আধঘণ্টা অ্যাটর্নী অফিসে বসে বসে আমার অনেক কিছু দেখা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। অ্যাটর্নীরা যে কী রকম মানুষ তাও জানা হয়ে গেল।

বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কিন্তু আমার মত ঘরের কোণের মানুষ, যারা বাইরের আইনের জগতের সঙ্গে একেবারে যোগশূন্য, তাদের পক্ষে অ্যাটর্নী-উকিলরা তো স্বর্গ। তারা আছে বলেই তো এখনও কিছু কিছু রয়্যালটি হাতে পাই। আমরা এ্যাটর্নী উকিলদের যতই দোষ দিই, তাদের জন্যেই তো এখনও সশরীরে টি'কে আছি!

তা যা হোক কিছুদিন পরে আবার আমি সুধীরদার দোকানে গিয়ে হাজির। নন্তবাবুও কথামত হাজির।

বললেন—কী মশাই, এখনও চেক ভাঙাননি কেন?

বললাম—আমাকে একজন বলে দিয়েছেন, কনট্র্যাক্ট সই না হলে চেক ভাঙাবো না।

নন্তবাবু হাসতে লাগলেন।

আমি আমার কনট্র্যাক্টের নতুন ড্র্যাফট্‌টা পকেট থেকে বার করে বাড়িয়ে দিলাম নন্তবাবুর দিকে। বললাম—এই রকম কনট্র্যাক্ট করতে হবে আমার সঙ্গে, তবে সই করবো।

নন্তবাবু নিজে নিউ থিয়েটার্সের ল-অ্যাডভাইসর। মন দিয়ে পড়লেন সবটা। তারপর বললেন—আপনি নতুন কিনা তাই এত ঘাবড়ে গেছেন। আমরা যে কনট্র্যাক্ট করবো সেও ওই রকমই, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন?

বললাম—কে শোনেনি তাই বলুন?

নন্তবাবু বললেন—তিনি যে কনট্র্যাক্টে সই করেছেন, সেই কনট্র্যাক্টে সই করবেন তো? তাতে তো আপনার আপত্তি হবে না?

বললাম—না।

নন্তবাবু বললেন—আপনি তো তার চেয়ে বড় লেখক নন্?

আমি বললাম—আপনি কী যে বলেন!

নন্তবাবু বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আপনি একখানা ভালো বই লিখে ফেলেছেন বলেই আপনাকে এত খোসামোদ। নইলে বাঙলাদেশে কি গল্পের অভাব মশাই? বাঙলাদেশে কি আর আপনার উপন্যাস ছাড়া উপন্যাস নেই ভেবেছেন?

বললাম—আমিও তো সেই জন্যেই কনট্র্যাক্ট সই করা নিয়ে এত সাবধান হয়েছি। আমিই কি আর রোজ-রোজ ওরকম বই লিখতে পারবো ?

নন্তবাবু বললেন—জানেন, এই নিউ থিয়েটার্স আপনার বই নিচ্ছে বলে আপনার কৃতার্থ থাকা উচিত। অথচ কত লেখক গল্প বেচবার জন্যে আমাদের খোসামোদ করেন, তা জানেন ? আমরা আপনার বই কিনলে আপনি বেঁচে যাবেন। শেষকালে পড়বেন এমন এক জোচ্চোর প্রোডিউসারের পাল্লায় তখন কেবল কোর্ট-ঘর করতে হবে—

কিন্তু নন্তবাবুর সঙ্গে তখন আমার নতুন পরিচয়! তিনিও তখন আমাকে ভাল করে জানতেন না, আমিও তাঁকে ভাল করে জানতাম না তখন। জানলে আর এ-সব কথা কারোর মুখ দিয়েই বেরোত না।

তাছাড়া আমি বরাবরই আড়ালে থাকার মানুষ। যারা আমার মত আড়ালে থেকে শান্তি পায় তারা স্বভাবতই ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চায়। আর মজা এই যে তারা ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চায় বলেই হয়ত যত ঝামেলা তাদের ঘাড়েই এসে পড়ে। আসলে সংসারে থেকে যারা ঝামেলা এড়াবার চেষ্টা করে তারা নির্বোধ। ঘটনাচক্রে আমিও সেই নির্বোধের দলে। এই নির্বুদ্ধিতার জন্যেই সংসারে এত ভাল ভাল পেশা থাকতে কিনা সাহিত্যকে পেশা করে নিয়েছি!

নন্তবাবু কিন্তু অভয় দিলেন। বললেন—নিউ থিয়েটার্স মুদিখানার দোকান নয়, এটা জেনে রাখবেন। যা আইনসঙ্গত তাই করা হবে আপনার সঙ্গে। দরদস্তর যখন খতম হয়ে গেছে, তখন আর টার্মস নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার কী ?

আমি আশ্বস্ত হলাম। আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে নিউ থিয়েটার্সের মত নামজাদা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

কিন্তু তখন কি জানি যে নিউ থিয়েটার্সেরও তখন অন্তিম দশা ? নইলে···

সে কথা পরে বলছি।

আসল কথা হলো যখন প্রথম জীবনে লেখক হবার স্বপ্ন দেখতাম তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে তার পেছনে এত উকিল অ্যাটর্নী কেরানীগিরির ঝামেলা পোয়াতে হবে। ভাবতাম হাতে কলম নিয়ে লিখবো আর প্রকাশক আমার বই ছাপবেন। সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিবাদ পেশা। এ পেশার চেয়ে সুখের আর শান্তির পেশা আর কী আছে!

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নেমে দেখা গেল লেখার মত ঝামেলার পেশা আর দুটি নেই। শুধু চুপ করে ঘরের সদর দরজা বন্ধ করে লেখা নয়, লিখতে গেলে সম্পাদকের তাগিদ আছে, প্রকাশক মহলে রেশারেশির শিকার হওয়া আছে। তারপর চুক্তি মানা, চুক্তি না মানা, চুক্তি না মানার জন্যে উকীল অ্যাটর্নীর দ্বারস্থ হওয়া আছে। আর সর্বোপরি আছে আয়কর বিভাগের জন্যে হিসেব রাখার বিড়ম্বনা।

তা যা হোক, শেষ পর্যন্ত নন্তবাবু একদিন আমার ঠিকানায় একটা নতুন চুক্তি পাঠিয়ে দিলেন। লিখলেন—এটা কোনও অ্যাটর্নীকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আমাদের ফেরত পাঠাবেন।

মিলিয়ে দেখলাম আসল চুক্তির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই, না ভাষায়, না বিষয়-বস্তুতে।

ভাবলাম পাঠাব না। ফেলে রাখলাম আমার কাছে। এমনি করে এক মাস কেটে গেল। বড় নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ভাবলাম আমার তো আর কিছু লোকসান যাচ্ছে না। আমার গল্পও কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে না, আর টাকারও তেমন দরকার নেই আমার। থাক না পড়ে।

আমার স্বভাবই এই যে যখন অন্যরা খুব আগ্রহশীল, আমি তখন নিষ্ক্রিয়। আমার সম্বন্ধে অন্যের নিষ্ক্রিয়তা আমাকে বড় শান্তি দেয়। তাতে আমি নিশ্চিন্তে লিখতে পারি, আমি আমার কাজে ডুবে যেতে পারি। তাই এ আমার পক্ষে ভালই হলো। আমি নতুন কিছু লেখবার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম।

নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী প্রমাদ গণলেন। সত্যিই তো এরকম লোক তো দেখা যায় না। তাড়াতাড়ি কনট্র্যাক্ট ফেরত দেবে তো। লেখকটা যত তাড়াতাড়ি ফেরত দেবে তত তাড়াতাড়ি সেটা সই হবে। আর সই হওয়া মানে তো টাকা। এ লেখকটার কি টাকারও দরকার নেই ?

এল একটা তাগাদা।

আর থাকতে পারলাম না চুপ করে। একদিন ফেরত পাঠিয়ে দিলাম সেখানা। সঙ্গে লিখে দিলাম যে আমার এ চুক্তিতে সই করতে আপত্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কোম্পানী থেকে আর একটা চিঠি এল। দিন ক্ষণ তারিখ ঠিক করে দিয়েছে। সেই তারিখে, সেই ক্ষণে আমায় হাজির হতে হবে তাঁদের অফিসে এবং সেইদিনই যথারীতি চুক্তি সই হবে।

গেলাম। তারিখ ক্ষণ সব মিলিয়েই গেলাম। জায়গাটা ধর্মতলায়। নিউ

সিনেমা নামে যে সিনেমা হাউস আছে তারই দোতলায় উঠতেই মুখোমুখি ছোটাইবাবুর সঙ্গে দেখা।

খুব খাতির করে বললেন, আসুন—আসুন—

আমি বললাম। আমার খবর শুনে নন্তবাবুও এসে হাজির।

বললেন—আপনি মশাই এত দেরি করে ড্রাফট্‌টা পাঠালেন, আপনার যেন কোনও গা নেই। আপনার অ্যাটর্নীকে সব ভালো করে দেখিয়েছেন তো?

বললাম—হ্যাঁ দেখিয়েছি। কিন্তু একটা জিনিসে আমার মত নেই। এখানে লেখা আছে লিটারারি কোল্যাবোরেশন। ওটা কিন্তু কেটে দিতে হবে।

—কেন, আপনার গল্প যদি কোথাও খারাপ হয় তো আপনি ঠিক করে নেবেন না?

বললাম—না, আমি কলম ছোঁয়াবো না, চিত্রনাট্যও আমি লিখবো না। আপনারা অন্য লোককে টাকা দিয়ে চিত্রনাট্য লিখিয়ে নেবেন।

নন্তবাবু বললেন—তা তো লেখাবো। কিন্তু যদি আপনার সাহায্যের দরকার হয়, আপনি একটু কলম ছুঁইয়ে দেবেন না?

বললাম—তা ছোঁয়াবো। কিন্তু সেটা চুক্তির মধ্যে লেখা থাকবে না। শেষকালে ওই ফাঁকে আমাকে দিয়ে চিত্রনাট্য লিখিয়ে নেবেন, সেটা হবে না।

এতক্ষণে ছোটাইবাবু কথা বললেন। বললেন—হিন্দি চিত্রস্বত্ব বেচবেন?

আমি চুপ করে রইলাম।

ছোটাইবাবু বললেন—হিন্দি আর বাংলা·দুটো ভাষার স্বত্ব বিক্রি করলে আপনাকে তিনগুণ টাকা দেবার বন্দোবস্ত করবো। বিক্রি করবেন?

বললাম—হিন্দি স্বত্বর কথা তো ছিল না।

ছোটাইবাবু বললেন—কথা ছিল না, কিন্তু এখন আমরা হিন্দি রাইট কিনতে রাজি।

আমি মুহূর্তের মধ্যে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। কারণ একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেছি যে যেখানেই টাকার লোভ সেখানে কোনও না কোনও রকম একটা ফাঁকির ব্যাপার থাকে। এই গল্প নিয়ে হিন্দি ছবি যদি কোনওদিন কারো করবার ইচ্ছেই হয় তো আলাদা ভাবে তার সঙ্গে সেই চুক্তি হবে। আগে থেকে নগদ টাকার লোভ করি কেন। আমার তো তখন অর্থের প্রয়োজন নেই। আমি বরাবর মিতাচারী মানুষ। বৃহতের দিকে লক্ষ্য থাকলেও আমি বাস্তব-জীবনে বড় অল্পে তুষ্ট। একজোড়া জুতো আর মোটা ভাত কাপড়েই

আমার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটে যায়। তার জন্যে তো চাকরিই আছে। বই-এর রয়্যালটি থেকে যা পাই সেটাতো উদ্বৃত্ত। ফাউ। তাহলে কেন বেশি টাকার লোভে হিন্দি চিত্রস্বত্ব বিক্রি করে দিই।

ছোটবেলা-থেকে একটা জিনিস সম্বন্ধে আমি ভারি সতর্ক ছিলাম। সেটা লেখক-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেছি। সেটা হচ্ছে—সংযম। আমি জীবনে বিরাট মহীরুহের পতন যেমন দেখেছি, আবার তেমনি দেখেছি গুণীর বিশ্বজয়। যখন তাদের পতন-উত্থানের হিসেব নিকেশ করছি তখন একটা মাত্র জিনিসের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। সেটা হয় সংযমের অভাব নয় তো অতি-সংযম। জীবনে পতনের সুযোগ তো পদে পদে। কিন্তু উত্থান? উত্থানের সুযোগও আসে অনেকবার। কিন্তু সেই উত্থানের সময়ে লোভ-মোহ-লালসা ত্যাগ করবার কথা কজনের মনে আসে?

এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো বলে দিই—হ্যাঁ। অতগুলো টাকা আসছে অথচ আমি অস্বীকার করছি, এটা কি ভালো? লক্ষ্মী যখন নিজে আমার দরজায় এসে হাজির তখন আমি তাঁকে পায়ে ঠেলেছি? যদি আর কখনও এ-সুযোগ না আসে। যদি পরে আর কেউ হিন্দি ভার্সান না করতে চায়? এমনও তো হতে পারে যে বাঙলা ছবিটা ফেল করলো, তখন হিন্দি ছবি করবার কথা আর কেউ ভাবলো না। তখন তো আর টাকা পাওয়া যাবে না। আর সংসারে টাকাটা কি ফ্যালনা জিনিস? তুমি কী এমন বড়লোক যে এত টাকার প্রলোভন এক কথায় এড়াবে। তোমাকে জামাকাপড় কিনতে হয়, তোমাকে সংসার চালাতে হয়। এই টাকাটা পেলে তুমি আর একটু ভালো করে, আর একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। বেশ ভালো করে ভাবো। তারপর উত্তর দিও। কিন্তু হঠাৎ আবার মনে পড়লো—আমি তো সিনেমার জন্যে এ গল্প লিখিনি। টাকা উপায় করবার জন্যেও নয়। তুমি তো বড় বড় কথা বলতে বন্ধুদের কাছে। সংযম-সাধনা-নিষ্ঠা সে সব কি স্তোকবাক্য?

ছোটাইবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো, চুপ করে আছেন কেন? হিন্দি রাইট বেচবেন?

আমি বললাম—না।

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমায় খুব দৃঢ় হতে হয়েছিল। হিন্দি ছবির স্বত্ব বিক্রি করলে আমার আর্থিক দুর্দশা ঘুচতো হয়তো, কিন্তু সেটা সাময়িক। আমি জানি টাকা সাময়িক অভাব মেটায়, কিন্তু সাহিত্যকে নিয়ে ব্যবসা করলে

আখেরে পস্তাতে হয়। সিনেমার মতো করে গল্প লিখলে তা হয়তো সিনেমা হয়, কিন্তু গল্প হয় না। কিন্তু একবার যদি সাহিত্য হয়ে ওঠে তা সিনেমাতেও ওঠে এবং আখেরেও কাজ দেয়।

পৃথিবীতে যে সমস্ত ক্লাসিক আজও অমর হয়ে আছে, তার অমরত্বের একমাত্র কারণ সেগুলো পুরোপুরি সাহিত্য। টমাস হার্ডি বা টলস্টয়ের নাম শুনেছি সিনেমার কল্যাণে নয়, তাঁদের গ্রন্থের সাহিত্যগত গুণের জন্যে।

একবার দেখলাম টমাস হার্ডির একটা ছবি এসেছে কলকাতার বাজারে। ছবিটার নাম—'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড।'

যতদূর মনে পড়ে এইটেই বোধ করি টমাস হার্ডির প্রথম উপন্যাস। এই টমাস হার্ডির জীবনই কি কম দুঃখের! একটা একটা করে উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু কোনটাই এক হাজার কপির বেশি বিক্রি হয়নি। অন্য যে কোনও লোক হলে লেখা থামিয়ে দিয়ে অন্য কোন পেশার আশ্রয় নিতেন।

কিন্তু টমাস হার্ডির প্রাণ অন্য ধাতুতে গড়া। যত ব্যর্থতা তত নিষ্ঠা। যেমন করে হোক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সম্মান আদায় করে নিতেই হবে। রাত জাগা, সমালোচকদের হাতে রাখা, প্রভৃতি নানা রকম কলা-কৌশল করতেও তিনি পেছপাও হননি। আর যাকে বলে নিষ্ঠা—তার এতটুকু ত্রুটি ছিল না তাঁর চরিত্রে।

কিন্তু ভাগ্য ছিল বিরূপ। তাঁর লেখার নিন্দে না করলে সমালোচকদেরও যেন ভাত হজম হতো না।

আর বিক্রি? টমাস হার্ডি গিয়ে প্রকাশকদের জিজ্ঞেস করতেন—কী রকম বিক্রি-টিক্রি হলো?

প্রকাশক মুখ গম্ভীর করে বলতেন—কোথায় বিক্রি? আপনার বই কেউ কিনতে চায় না মশাই।

টমাস হার্ডি বলতেন—কেন বলুন তো? আমার লেখা কেন লোকের ভাল লাগে না?

প্রকাশক বলতেন—আপনি যে বড্ড মসলা ঢুকিয়ে দেন মশাই। অত গরম গরম মসলা কেউ হজম করতে পারে?

টমাস হার্ডি বলতেন—কিন্তু আমি যে জীবনে এ-সব দেখেছি, দেখেছি তাই লিখেছি।

প্রকাশক উপদেশ দিতেন—আর একটু নরম করে লিখুন না—তাহলে

দেখবেন মেয়েদের খুব ভালো লাগবে। মেয়েরাই তো বেশি উপন্যাস-টুপন্যাস পড়ে।

কিন্তু টমাস হার্ডি অচল অটল। না হোক তাঁর বই বিক্রি তিনি নিজের কাছে সৎ থাকবেন, নিজের ধর্ম মেনে চলবেন।

তখন সিনেমার যুগ নয়। সিনেমার যুগ হলে তিনি কী করতেন বলা যায় না। হয়ত অর্থের জন্যে সিনেমা কোম্পানীর দ্বারস্থ হতে হতো। সিনেরিও লিখতে হতো। হয়তো সিনেমা পরিচালনাও করতেন।

এমনি করে পর পর প্রায় এগারোখানা বই বেরোল। কিন্তু সবগুলোরই ওই এক হাল। হাজার কপি বই-এর বেশি আর বিক্রি হয় না।

প্রকাশক বললেন—না মশাই, আপনার দ্বারা আর বই লেখা হবে না—

হতাশ হয়ে পড়লেন টমাস হার্ডি।

বললেন—কেন? ওকথা বলছেন কেন?

প্রকাশক বললেন—একটু কাগজওয়ালাদের ধরুন না। তাঁরা যদি দু-চারটে ভালো ভালো কথা লিখে দেন তো লোকে তবু একটু বই-টই কেনে।

কিন্তু তখনকার দিনে সমালোচকরাও ছিল সৎ। তারা এখনকার মতো বন্ধুকৃত্য করতো না। তখনকার যুগটাই ছিল যেন অন্যরকম। সাহিত্যটাকে সবাই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। তারা একবারও ভেবে দেখতো না কাকে প্রশংসা করলে কার কী সুবিধে অসুবিধে হবে। এখনকার মতো সাহিত্য তখন বাজারের পণ্য হয়ে ওঠেনি। এখনকার পত্রিকা-ওয়ালাদের আগে ভেবে দেখতে হয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের লেখক কোন দলভুক্ত। তাকে প্রশংসা করলে আমার কী লাভ বা আমার কী লোকসান। যদি দেখি যে বইটা খুব বিক্রি হচ্ছে তো তাকে নিন্দে করো। কারণ বই বিক্রি মানেই তো লেখকের এবং প্রকাশকের টাকা হওয়া।

এ যুগে পপুলারিটি মানেই অপরাধ। জনপ্রিয় হওয়ার খেসারৎ দিতে দিতে আজকাল লেখকদের ফতুর হয়ে যেতে হয় সামাজিক দিক থেকে।

এ দুর্দশা পৃথিবীর সমস্ত জনপ্রিয় লেখকদের সহ্য করতে হয়েছে। সমারসেট মম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তা সে যাই হোক টমাস হার্ডি যখন 'টেস্ অব দ্য ডারবারভিল' উপন্যাসটি লিখলেন তখন কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠলো। প্রকাশক প্রথমেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এবারেও মশাই আপনি গরম-মসলা দিলেন? আপনাকে পই-পই করে বারণ করে দিলুম—

কিন্তু যা হবার তা হলো।

এক মহিলা পাঠিকা বইখানা পুড়িয়ে তার কিছুটা ছাই খামে ভর্তি করে পাঠিয়ে দিলেন টমাস হার্ডির কাছে।

খুব ভয় পেয়ে গেলেন হার্ডি। কিন্তু বই বিক্রির ব্যাপারে হঠাৎ হাওয়া ঘুরে গেল। বইটার যত নিন্দে হতে লাগল তত প্রচার হতে লাগল বই-এর। সবাই ভাবলে বইটা পড়ে দেখি কী আছে এর ভেতরে।

ঘটনাচক্রে নাম ছড়িয়ে পড়লো—টমাস হার্ডির। নিন্দেয় ভরে গেল খবরের কাগজের পাতা। কিন্তু লাভ হলো টমাস হার্ডির আর্থিক দিক দিয়ে। সাংসারিক অভাব মিটলো বটে কিন্তু যে সম্মান পেলে মন পরিতৃপ্ত হয় তা জুটলো না হার্ডির কপালে। যত খ্যাতি বাড়তে লাগলো তত অখ্যাতি জুটতে লাগলো সমালোচক মহল থেকে।

ছবিটা দেখতে দেখতে সেদিন টমাস হার্ডির কথা ভাবছিলাম।

কী অমানুষিক নিষ্ঠা, কী অমানুষিক সহ্য গুণ, আর কী অমানুষিক পরিশ্রম করার শক্তি। সমস্ত ইংরেজ জাত যখন টমাস হার্ডির প্রসংসায় পঞ্চমুখ তখন ইংরেজ সমালোচকদের অবজ্ঞা আর ঘৃণা তাঁর লেখার ওপর।

সমারসেট মম্ সাহেব তো তাঁকে ব্যঙ্গ করে একটা উপন্যাসই লিখে ফেললেন। বইটার নাম দিলেন 'কেকস্ এণ্ড এল্'। কোথাও অবশ্য টমাস হার্ডির নাম গন্ধ নেই, কিন্তু ইংরেজ পাঠকরা বুঝতে পারলো এ নিশ্চয় তাঁকে নিয়েই লেখা। কিন্তু সে বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর।

কিন্তু এতকাল পরে টমাস হার্ডির সেই উপন্যাস নিয়ে ছবি হলোই বা কেন?

তবে কি এ-গল্পের আবেদন এখনও তেমনি সজীব?

যে উপন্যাস অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী হতে পেরেছে তাকেই তো লোকে স্থায়ী সাহিত্য বলে চিহ্নিত করে। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী' বা 'দেবী চৌধুরাণী নিয়ে এ-যুগে ছবি হয় তা হলে কি এইটেই বুঝবো না যে তারা এখনও পাঠক মনকে আলোড়িত করে, তাদের আবেদন চিরন্তন!

লোকে বলে টমাস হার্ডি নৈরাশ্যবাদী। তিনি গল্পের পাত্র-পাত্রীকে ঘটনার জটিল জালের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে এমন এক পরিণতিতে দাঁড়ি টানেন যেটা ঠিক স্বতোৎসারিত নয়, পুরোপুরি আয়োজিত।

কিন্তু 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড' তা নয়। এক মিলনান্তক কাহিনী। এখানে কোথাও নৈরাশ্যবাদের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। ছবির শেষে কাহিনীর

বুননের জন্যে নায়িকা নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে ঠিক নায়কের সঙ্গে গিয়েই মিলিত হলো।

কোনও সাহিত্যিককে বিচার করতে হলে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দিয়েই তাঁকে বিচার করতে হবে। মাইকেল মধুসূদনকে বিচার করতে গেলে তাঁর 'হেকটর বধ' দিয়ে বিচার করলে চলবে না। বিভূতিভূষণকে বিচার করতে গেলে তাঁর 'পথের পাঁচালী' দিয়েই বিচার করতে হবে, 'দম্পতি' উপন্যাস দিয়ে নয়। তেমনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বিচার করতে হলে বিচার করতে হবে তাঁর 'বান ভাসি' আর 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' দিয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজস্র অপাঠ্য বই আছে। কিন্তু তাঁকে বিচার করতে হলে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'পদ্মা নদীর মাঝি' দিয়ে বিচার করতে হবে।

টমাস হার্ডির বেলাতেও তেমনি। টমাস হার্ডিকে বিচার করতে হবে তাঁর 'জুডি দ্য অবসকিওর' বইখানা দিয়ে, 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড' দিয়ে নয়।

এ ছবি যে দেখতে গিয়েছিলাম তার একটা কারণ এ গল্পের লেখক টমাস হার্ডি বলেই। হাজার খারাপ ছবি হোক তবু তো টমাস হার্ডির গল্প। প্রথমত তিনি সাহিত্যিক এবং শুধু সাহিত্যিক নন ইংরেজি সাহিত্যের এক দিগ্‌দর্শক।

আমি জানি না কে বা কারা এ-ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী। ছবি দেখবার আগে বা পরে ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম জানা থাকলে কিছু সুবিধে হয় বলে আমার মনে হয় না। নায়ক বা নায়িকা মানেই গল্পের পাত্র-পাত্রী। এবং যতক্ষণ ছবি চলছে ততক্ষণ তারা আমার কাছে গল্পের পাত্র-পাত্রী ছাড়া কেউই নয়, কিছুই নয়।

এই পরিস্থিতিতেও ছবিটা আমার ভালো লাগলো না। কেন ভালো লাগলো না, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কারণ আমি আগেও যা বলেছি এখনও তাই বলছি—আমি সিনেমাভিজ্ঞ নই। কোথায় ক্যামেরা বসালে দৃশ্যের বা নাটকের কী পরিণতি হয়, তা আমার জানা নেই। ছবিকে আমি ছবি হিসেবেই দেখি। ভালো ছবি দেখতে ভালো লাগে, খারাপ ছবি দেখতে খারাপ লাগে—এই পর্যন্ত।

কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারলুম, টমাস হার্ডির সাহিত্যস্পর্শ ছবির মধ্যে নেই।

এখানেই সাহিত্যের পক্ষে বড় ভয়ের কথা।

যে বই পড়ে আনন্দ পেয়েছি, তার চিত্ররূপ দেখে তো ঠিক তেমনি আনন্দ পাবারই কথা। যদি তা না পাই তো কার দোষ দেব? পরিচালককে? চিত্রনাট্য লেখককে? অভিনেতা-অভিনেত্রীদের? ক্যামেরাম্যানকে?

এর উত্তর সঙ্গত কারণেই আমার দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং নিজের উপন্যাসের চিত্ররূপের ব্যাপারে ঠিক এই কারণেই আমার প্রচণ্ড ভয়। আমি নিজে যখন চলচ্চিত্র বুঝি না, তখন চিত্রনাট্য পড়েও বুঝতে পারবো না যে তা ছবি হলে ভালো হবে কী খারাপ হবে। এ যেন পুরোপুরি পরের হাড়িকাঠের ওপর নিজের ঘাড়টা পেতে দেওয়া। যে লোক নিজের সৃষ্ট সাহিত্যকে ভালোবাসে এ-আকাঙ্ক্ষা থাকা তার খুবই স্বাভাবিক। খারাপ চিত্ররূপ হওয়ার চেয়ে একেবারে কোন চিত্ররূপ না হওয়াই ভালো।

গ্রাহাম গ্রীণের কথা আগেই বলেছি। নেহাত তখন তার অর্থাভাব বলেই হলিউডের চুক্তিপত্রের যে কোনও শর্তেই তাঁকে চোখ বন্ধ করে দাসখৎ লিখে দিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গল্পের ছবি হবার পর তিনি কী ভাবে অনুশোচনা করেছেন তাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন।

তারপর মার্গারেট মিচেলের কথা লিখেছি। তাঁর বেলায় উলটো ব্যাপার। পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে তাঁকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছে। শুনেছি সে ছবি নাকি ভালোই হয়েছে।

সবই তো যোগাযোগ। সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার এই যে শুভ সম্পর্ক তা পঙ্কিল হোক তা কেউই চায় না। না চায় সাহিত্যিক না চায় সিনেমার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এ-ব্যাপারে লেখকের ভয় থাকা কি অস্বাভাবিক?

আমিও ঠিক সেই কারণেই ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম।

কিন্তু যখন অফিসের আর একটা কামরায় ঢুকলাম তখন নিউ থিয়েটার্সের মালিক বি. এন. সরকারকে দেখলাম। চেহারাটা দেখেই যেন নিজের অজান্তেই একটু আশ্বস্ত বোধ করলাম। সৌম্যদর্শন মূর্তি। আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। নমস্কার করে সামনের চেয়ারে বসলাম।

মিস্টার সরকার বললেন—কাকে দিয়ে এ ছবি ডাইরেক্ট করাই বলুন তো?

আমি তো হতবাক। বি. এন. সরকারের মত লোক আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কাকে এ ছবির পরিচালক করবেন?

আমি সবিনয়ে বললাম—আমি কোনও পরিচালককেই চিনি না।

তিনি বললেন—তবু আপনি ছবি তো দেখেন।

বললাম—ছবি মাঝে মাঝে দেখি বটে কিন্তু কার পরিচালনা ভালো, সে সব বোঝবার মতো ক্ষমতা নেই আমার।

ততক্ষণে সই সাবুদ আরম্ভ হয়ে গেছে। তিনি এক জায়গায় সই করছেন, আমি আবার তার পাশে সই করছি। যেখানে যেখানে টাইপের ভুল সেখানে সেখানে কালিতে সংশোধন করে দিয়ে দুজনে পাশাপাশি সই করছি।

আবার তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—হেমচন্দ্র কেমন?

হেমচন্দ্রের নাম শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁর পরিচালিত কোনও ছবির কথা মনে করতে পারলাম না।

মিস্টার সরকার বললেন—হেমচন্দ্র খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে। আপনার 'সাহেব-বিবি-গোলাম'এ যে-রকম বর্ণনা আছে, ঠিক ঐরকম ফ্যামিলি ওদেরও।

আমি আর কী বলবো। আমি তখন এই ভেবেই অবাক হচ্ছিলাম যে এ-বিষয়ে আমার মতামত নেওয়ার জন্যে উনি অত পীড়াপীড়ি করছেন কেন। এ তো আশা করিনি।

'সাহেব-বিবি-গোলাম' পরিচালনা করতে গেলে যে সেখানে বর্ণিত পরিবারের মানুষ হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। আমি নিজেই তো মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। আমিই বা কী করে উচ্চবিত্ত পরিবারের জীবন-যাপন প্রণালী লিখলাম।

—আচ্ছা, চিত্ত বোস কেমন মনে হয় আপনার?

মিস্টার সরকারের কথায় আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। চিত্ত বসু বলে কোনও পরিচালকের নাম তখন আমার শোনা ছিল না।

ততক্ষণ ঘড়িতে প্রায় দুপুর দুটো বাজে।

নন্তবাবু কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আমিও দাঁড়িয়ে উঠলাম। আর কোনও কিছু করবার নেই। আমার নিজের সই দিয়ে চুক্তি-পত্রে দাসখৎ লিখে দিলাম। এখন আর আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এই 'সাহেব-বিবি-গোলাম'এর চিত্রস্বত্ব, এখন থেকে কয়েক বছরের জন্যে তা সুবিখ্যাত নিউ থিয়েটার্সের কর-কবলিত।

বাইরে আসতেই ছোটাইবাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন—হয়ে গেছে?

বললাম—হ্যাঁ—

ছোটাইবাবু বললেন—খুব লাভ করলেন মশাই।

আমি তো হতবাক তাঁর কথা শুনে। ছোটাইবাবু এ কী বলছেন?

সেদিন হিন্দী ছবির স্বত্ব বিক্রি না করার জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ তো হয়ই নি, বরং মুক্তি পেয়েছিলাম নিজের দিক থেকে। অর্থের প্রয়োজন সকলের কাছেই সমান। বিশেষ করে আমাদের মতন মধ্যবিত্ত সমাজের লোকের কাছে। কিন্তু যখন সাহিত্যকে ভালোবেসে পেশা করে নিয়েছিলাম তখন এই ভেবেই তা করেছিলাম যে সাহিত্যকে কখনও যেন পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করি।

অথচ সাহিত্য যখন পেশা তখন একদিক থেকে তা পণ্য তো বটেই। তবে পণ্য বলি তাকে যা নিয়ে ব্যবসা করি। যে ছেলে বেশি রোজগার করে তাকে যদি কোনও মা কম উপায় করা ছেলের চেয়ে বেশি স্নেহ দেখায়, তাহলে সেটা আর স্নেহ রইল না—সেটা পণ্যে পর্যবসিত হয়ে গেল।

কিন্তু এ সম্বন্ধে কারো কোনও দ্বিমত হবে না যে লেখকরাও সামাজিক জীব, এবং তাদেরও পরিবারবর্গ ভরণপোষণের প্রয়োজন অনিবার্য হয়।

যখন চুক্তিপত্রে যথারীতি সই-সাবুদ হয়ে গেল তখন বি. এন. সরকার মশাই উঠলেন। ঘড়িতে প্রায় দুটো বাজে। আমার টালবাহানার দেরির জন্যে তাঁর খেতে দেরি হয়ে গেল সেদিন। টালবাহানার অনেকগুলি কারণ ছিল। সবচেয়ে বড় কারণ ছিল চুক্তিপত্রের একটা শর্ত। সেখানে লেখা ছিল প্রয়োজন হলে আমি ছবির কাজে 'লিটারারি কোলাবরেশন' করবো। অর্থাৎ সাহিত্যিক-সহযোগিতা করতে হবে আমাকে।

কথাটা পড়ে আমার একটু সন্দেহ হলো। মনে হলো এই ফাঁদ পেতে হয়ত আমাকে দিয়ে কোম্পানী চিত্রনাট্য লিখিয়ে নেবে।

আমি বললাম—এ ক্লজ্‌টা তুলে দিতে হবে।

নন্তুবাবু পাশেই বসেছিলেন, বললেন—এ নিয়ে আপনি অত মাথাব্যথা করছেন কেন? এ তো সকলের বেলাতেই লেখা থাকে। আপনার গল্প, আপনি যদি একটু কলম লাগান তো তাতে আপনারই সুনাম হবে। আপনি ও নিয়ে অত অশান্তি করছেন কেন?

আমি বললাম—দরকার হলে আমি একবার কেন হাজারবার তা করবো। কিন্তু লেখাপড়ার মধ্যে ওটা থাকবে না। সেটা আমার নৈতিক দায়িত্ব রইল।

মিঃ সরকার শেষ পর্যন্ত ওই শর্তটা কালি দিয়ে কেটে দিয়ে সই করলেন, আমিও একটা সই করলাম তার পাশে। এই রকম ছোটখাটো দু-চারটে

ব্যাপারে (যা যা আমার আপত্তির কারণ হয়েছিল) সবগুলোই মেনে নিলেন ওরা।

আমি মুক্তি পেলাম।

বাইরে আসতেই ছোটাই মিত্র মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী, শেষ হলো ?

বললাম—হ্যাঁ।

ছোটাইদা বললেন—আমি শুনেছিলাম আপনি খুব নিরীহ ভালো মানুষ। এখন দেখছি অন্যরকম।

বলে হাসলেন।

আমিও রসিকতা করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম—আপনি নিজে একজন মিত্তির বংশজ হয়ে এ-কথা কী করে বললেন ছোটাইদা ? মিত্তির বংশের সন্তান কখনও নিরীহ ভালো মানুষ হয় ?

শুনে তিনিও হো হো করে হাসতে লাগলেন।

তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—হিন্দী-রাইট না বিক্রি করে আপনি খুব লাভ করলেন মশাই, খুব লাভ করলেন—

আমি বললাম—দেখুন ছোটাইদা, লাভ করার জন্যে ও-বই লিখিনি। সিনেমা করবার জন্যেও লিখিনি। লিখেছি প্রাণের দায়ে। বহু অপমান আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এ-বই লিখেছি। লোকের যে পড়তে ভালো লেগেছে তাতেই আমি খুশী, আমি এ-গল্প সিনেমায় হতে দিতেও চাইনি। আপনারা পীড়াপীড়ি করেছেন বলেই দিলাম।

তারপর একটু থেমে বললাম—আর হিন্দী স্বত্বের কথা বলছেন। যখন আপনারা হিন্দী ছবি করবেন তখন তার স্বত্ব দেব। এখনই তো আর হিন্দী করছেন না—

এই পর্যন্ত সব কথা হলো সেদিন। আমি সকলকে নমস্কার করে চলে এলাম।

সেদিন একজন জিজ্ঞেস করছিলেন কেন আমি সাহিত্যের হয়ে এত ওকালতি করছি। কারণ আমি নিজেও তো সিনেমা থেকে কিছু অর্থ উপার্জন করেছি, এবং এখনও করছি।

কিন্তু অর্থের কথা থাক। ও-সম্বন্ধে আগেই বলেছি। ছোটবেলা থেকে মানুষের সমাজের অবহেলা আর অবজ্ঞা পেতে পেতে একদিন আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। নিঃসঙ্গ হওয়া অনেকের পক্ষেই অসহ্য। নিঃসঙ্গতার অনেক দোষ। যে মানুষ নিঃসঙ্গ সে ধাপে ধাপে ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলে। নিঃসঙ্গতা

অনেক সময় মানুষকে উন্মাদ করে দেয়, কখনও বা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। নিঃসঙ্গ মানুষকে নিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস, অনেক সিনেমা হয়েছে। কিন্তু আমার বেলায় সেই নিঃসঙ্গতা যেন আশীর্বাদ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। আমি যে সাহিত্যের ভক্ত হয়েছি তা ওই নিঃসঙ্গতার ফলেই। সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমি ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম সাহিত্যকে। সাহিত্যই আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। ছোটবেলায় সাহিত্যের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম বলে এই ভিড়ের যুগেও জনতার মধ্যে হারিয়ে যাইনি। সাহিত্য আমাকে স্বধর্ম-চ্যুত করেনি।

টমাস হার্ডির কথা আগেই বলেছি। তাঁর 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড'-এর কথাও বলেছি। সেই হার্ডির বই পড়তে পড়তে মনে হয়েছে হার্ডি আমার মনের কথাগুলো জানলেন কেমন করে? ডিকেন্সও তাই। তাঁর 'অলিভার টুইস্ট্' যেন আমাকে নিয়েই লেখা। এই যে সারা পৃথিবীর লোক সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে এটা কেমন করে সম্ভব হয়। জাতিভেদ কিংবা দেশভেদ তো এর মধ্যে পাঁচিল তুলে দেয় না!

'টেল অব্ টু সিটিজ্' কতবার যে পড়েছি তার বোধ করি ইয়ত্তা নেই। সাতবারের কম তো নয়ই। একটা সিনেমার ছবি পনেরোবার দেখেছেন এমন লোকের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি। তখন ভেবেছি, আহা ভদ্রলোক যদি একবার আসল বইটা পড়তেন তাহলে আরো কত আনন্দ পেতেন।

সে বোধহয় ১৯৩৩-৩৪ সালের কথা। কলকাতায় 'টেল অব্ টু সিটিজ' উপন্যাস ছবি হয়ে এল। আমার বহু সাধের উপন্যাস। যত রকমের সংস্করণ আছে বইটার সব সংস্করণগুলোইআমার পড়া। ফরাসী-বিদ্রোহদেখিনি, শুনেছি। এবং ফরাসী-বিদ্রোহের কথা ইতিহাসেও পড়েছি। কিন্তু 'টেল অব্ টু সিটিজ' পড়ার আগে সে-সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানতাম না। ভাষার যে যাদু, তা কি ক্যামেরায় আসে? ক্যামেরা সেইটুকুই দেখাতে পারে যেটুকু চোখে দেখা যায়। কিন্তু মন? মনেরও তো একজোড়া চোখ আছে। সেই মনের চোখের দৃষ্টি যে অন্তর্ভেদী। সে এমন জিনিস দেখে যা যন্ত্র দিয়ে দেখা কী সম্ভব? যন্ত্র শুধু দৃষ্টি দিতে পারে কিন্তু দর্শন দিতে পারে না। সেটা দিতে পারে মন। সাহিত্য সেই মনকে যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে আর এক লোকে নিয়ে যায় যাকে বলা যায় কল্পনালোক।

বিখ্যাত সমালোচক গেভার্ড জেনেট একটা নতুন কথা বলেছেন সাহিত্য

সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন—'ওন্‌লি হোয়েন ল্যাংগুয়েজ লুজেস্ ইট্‌স্ মিনিং ডাজ্ ইট্ অ্যাচিভ দ্য স্টাটাস অব লিটারেচার।'

ভাষাই অবশ্য সাহিত্যের বাহন। কিন্তু সেই ভাষার সিঁড়ি বেয়ে যখন আমরা আকাঙ্ক্ষিত লোকে পৌঁছোই তখন ভাষার আর কোন তাৎপর্য থাকে না। তখন ভাষা তার অর্থ হারিয়ে ফেলে। ভাষা অতিক্রম করে ভাষাহীনতার রাজ্যে আমরা বিচরণ করি। তখনই বুঝতে পারি সাহিত্যের মূল্য। মুনি-ঋষিরা যাকে বলেছেন—ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর—

'টেল্ অব্ টু সিটিজ' যখন পড়েছিলাম তখন মনে আছে এই অপার অলৌকিক অনুভূতিই আমার হয়েছিল। কয়েকদিনের জন্যে আমি সেই ভাষাহীন ভাবরাজ্যে বিচরণ করেছিলাম। তারপর কী যে দুর্বুদ্ধি হলো সিনেমাটা দেখতে গেলাম। আমার সঙ্গে যাঁরা দেখছিলেন তাঁরা দেখলাম বেশ আনন্দ পাচ্ছেন ছবি দেখে। বাইরে বেরিয়ে আসতে বহুলোকের মুখে ছবিটার প্রশংসা শুনলাম। তারপরেও ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার ঘটনা অনেক ঘটেছে। তাঁরা অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন, ফটোগ্রাফির প্রশংসা করেছেন, বিভিন্ন আঙ্গিকের খুঁটিনাটির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কেবল আমার মনে হয়েছে তাঁরা ডিকেন্সের সেই বইটা নিশ্চয়ই পড়েননি। যদি আসল বইটা একবার পড়তেন তাহলে আরো কত না আনন্দই পেতেন।

বলতে গেলে আমি হতাশই হয়েছিলাম সেই ছবি দেখে। আমার সাধের সেই লেখকের অপমৃত্যু দেখে আমি যে কত ব্যথা পেয়েছিলাম তা কাউকে বুঝিয়ে বলবার নয়।

অথচ ডিকেন্স যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে একদিন তাঁর বই কেউ আর পড়বেও না, শুধু সিনেমাতেই দেখে নিয়ে গল্প পড়ার দায় থেকে মুক্তি পাবে। আজকের ছেলেরা ক'জন চার্লস ডিকেন্সের নাম জানে? কিন্তু 'টেল্ অব্ টু সিটিজ' ছবির নায়ক রোন্যাল্ড্ কোল্‌ম্যানের কুলুজী অনেক বিদ্যাবাগীশেরই কণ্ঠস্থ।

আজকে পাঠকদের এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে আজকালকার যুগের সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো একদা ডিকেন্সেরও একটা গ্ল্যামার ছিল। সারা ইউরোপে তাঁকে দেখবার জন্যে মানুষের যে আগ্রহ তা যে-কোনও রাজনীতিক বা অভিনেতাকে দেখার আগ্রহের চেয়ে কম নয়। শুধু তিনি একবার সেখানে যাবেন। গিয়ে তাঁর নিজের লেখা পড়ে শোনাবেন। যাওয়ার

খরচ, খাওয়া থাকার খরচ সমস্তই তাঁদের। তার বদলে তিনি পাবেন কখনও দশহাজার পাউণ্ড, কিংবা পনেরো হাজার পাউণ্ড !

সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। ডিকেন্স গল্প পড়বেন তাঁর নিজের ছাপানো বই থেকে। তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনবো তাঁর গল্প। আগের রাত থেকেই টিকিটের জন্যে ভিড় শুরু হয়ে গেল। যারা মধ্যবিত্ত লোক তাঁরা আগেই দাঁড়িয়ে গেছে টিকিট-ঘরের সামনে। টিকিট-ঘর খুলবে পরের দিন। কিন্তু তখন এলে যদি টিকিট না পাই ? বাজার বসে গেছে সেখানে। যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত তাদের জন্যে ফেরিওয়ালারা খাবারের দোকান খুলে বসেছে। কেউ আবার শতরঞ্চি মাতুর নিয়ে এসে খোলা আকাশের তলায় শুয়ে পড়েছে। বিশ্রাম করছে। যেমন করে হোক একটা টিকিট চাই প্রত্যেকের।

এ ঘটনা একদিন নয়, দু'দিন নয়। কখনও অস্ট্রেলিয়াতে, কখনও আমে-রিকাতে, কখনও আয়ার্ল্যাণ্ডে, কখনও বা নিজের জন্মভূমি ইংলণ্ডে। তারপর মুখোমুখি প্রশ্ন। নানা রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। কার লেখা আপনার ভালো লাগে ? কে আপনার প্রিয় লেখক ? কার লেখা পড়ে আপনি লেখা শিখেছেন ?

যার লেখা পড়ে ভালো লাগে তাকে একবার নিজের চোখে আমরা দেখতে চাই। তাকে স্পর্শ করতে চাই। তার মুখের কথা শুনতে চাই।

একবার তার মাথার একগুচ্ছ চুলও অজ্ঞাতে কেটে নিয়েছিল একজন। জিনিসটা যত বিকৃত-রুচিসূচক ও যত নিন্দনীয়ই হোক, এও তো একধরনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিদর্শন ! কিন্তু হা-হুতাশ করে লাভ নেই। যন্ত্রের কাছে আমাদের নতি-স্বীকার করতেই হবে। যন্ত্র আমাদের জীবনকে যে-ভাবে ঢালাই করবে আমরা সেই ভাবেই গড়ে উঠবো। এর মন্দ দিক যেমন আছে তেমনি ভালো দিকও তো আছে ! সেটাই বা অস্বীকার করি কী করে ?

লোক-শিক্ষার এমন সহজ ও প্রত্যক্ষ মাধ্যম আর কোথায় পাবো ? যারা লেখাপড়া শেখেনি তাদের সিনেমা ছাড়া আর কী গতি আছে ? তারা এতদিন জানোয়ারের মতো শুধু মেহনতই করে গেছে, আর অবসর সময়ে নেশায় বুঁদ হয়ে ক্লান্তি অপনোদন করেছে, তাদের জন্যে সেক্সপীয়র নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই, কালিদাস, বাল্মীকি, কেউই নেই। সিনেমা আসাতে তারা জানতে পেরেছে এ জগৎটা কী জিনিস। এ পৃথিবীতে যে তাদের চোখের অগোচরে আরো কত ঘটনা ঘটছে, সিনেমা না থাকলে তারা জানতো কী করে ? শুধু

তাই-ই নয়, তাদের হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ যেমন তাদের নিজেদের কাছে বাস্তব সত্য, তেমনি বাস্তব সত্য যে অন্য অনেকেরই কাছে এ বোধ তাদের কেমন করে জাগতো? আর প্রচারের কথাই ধরা যাক! সব দেশে সব ভাষাতেই তো ভালো-ভালো সাহিত্য রচনা হচ্ছে। সে-সাহিত্যের খবর এত তাড়াতাড়ি পেতাম কী করে যদি সিনেমায় সে-গল্প না চিত্রায়িত হতো!

আবার আর একটা দিকের কথাও ধরা যাক। উদাহরণ দিলে জিনিসটা স্পষ্ট হবে। কলকাতা শহরে একটা ছবি এসেছিল তার নাম 'গুড বাই মিস্টার চিপস্'। সকলেই ছবিটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন ছবি নাকি আগে কখনও হয়নি। বন্ধু-বান্ধব দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতো—'গুড বাই মিস্টার চিপস্' দেখিসনি এখনও?

শেষ পর্যন্ত সত্যিই ছবিটা দেখা হয়নি। বিভিন্ন মহল থেকে ছবিটার প্রশংসা শুনে শুনে ধারণা হয়েছিল যে হয়ত সত্যিই ছবিটা দেখবার মত। কোনও ছবি ভালো হয়েছে শুনলে আনন্দ তো হবারই কথা। শুধু ছবি কেন, কোনও ভালো সাহিত্যের বই বেরোবার খবরই কি আনন্দের নয়?

কিন্তু বই আর সিনেমার এই-ই হলো প্রধান তফাত। একটা ভালো ছবির খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা না দেখলে পরে তা দেখার আর সুযোগ পাওয়া যায় না। আবার পরে কবে সে-ছবি আসবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। হয়ত যখন এল তখন আমি অসুস্থ, কিংবা বিদেশে ছুটি কাটাচ্ছি।

অথচ বইএর ব্যাপার আলাদা। সময়মতো লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসা যায়, কিংবা দোকান থেকে কিনে আনতে পারি! সময় আর সুযোগ পেলে আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে চেখে চেখে তা পড়তে পারি।

'গুড বাই মিস্টার চিপস্' বইটা তেমনি ভাবেই একদিন হাতে এল। লেখক—জেমস্ হিলটন্।

ভূমিকাতে লেখা ছিল একদিন কোনও পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে গল্পের বরাত পেয়ে তিনি নাকি গল্পটা লিখতে আরম্ভ করেন। একরাত্রেই গল্প লেখা শেষ হয়। এবং প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটার লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে যায়। লেখকের জনপ্রিয়তা এক নতুন দিগন্তে গিয়ে স্পর্শ করে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প সকলের শোনা আছে, কিন্তু এ তার চেয়েও রোমাঞ্চকর। সাহিত্যের জনপ্রিয়তা যে এমনও হতে পারে এর আগে আর কেউ তা দেখেনি।

ভূমিকাটি পড়ে বইটি পড়বার লোভ আরো তীব্র হয়ে উঠলো।

কিন্তু পড়তে পড়তে অবাক হয়ে গেলাম। এ আর এমন কী গল্প! অতি সাধারণ কাহিনীর এক অতি সাধারণ উপস্থাপন। চিন্তার দিক থেকে কোনও খোরাক দেবার সামর্থ্য নেই লেখকের। আঙ্গিকের নতুন কোন বাহাদুরিও নেই। অল্পে বৃহতের ইঙ্গিত, তাও নেই। নেহাতই সংবাদপত্রের রিপোর্টের মতো মুখরোচক এবং বিয়োগান্ত।

কিন্তু ছবি? শুনেছি ছবি হিসেবে এ নাকি অনবদ্য।

তাহলে কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো? সিনেমা কি সাহিত্যের পরিপূরক? সাহিত্যের ব্যাখ্যায় কি সিনেমা কিছু সাহায্য করে? খারাপ উপন্যাসের সার্থক চিত্রায়ণ যদি সম্ভব হয় তাহলে সার্থক উপন্যাসের সার্থক চিত্রায়ণ কেন সম্ভব হয় না?

যা হয় না তা নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই।

এমন একদিন আসতে পারে যেদিন সিনেমার জন্যেই বিশেষ করে গল্প লেখা হবে। তা হয়ত পড়বার জন্যে নয়, সিনেমায়িত হবার জন্যে। একটা হবে পড়বার-সাহিত্য, আর একটা হবে সিনেমা-সাহিত্য। তা যদি হয় তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন সাহিত্যের তরফে আমার ওকালতি করবার অধিকার রইলই।

এবার আবার আমার পুরোন প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সাহিত্য আমার পেশা বলে নয়, সাহিত্যকে আমি ভালোবাসি বলেই এত কথা বলা। সিনেমা বহুদিন ধরে সাহিত্যকে ভাঙিয়ে অর্থোপার্জন করে আসছে। তা করলেও কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু সাহিত্যের অমর্যাদার কথা ভেবেই আমি বিচলিত হয়ে উঠি। সে আমার রচিত সাহিত্যই হোক, আর অপরের সাহিত্যই হোক।

তাই যখন একদিন সিনেমা-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি এল যে অমুক তারিখে আমার গল্পের চিত্রনাট্য সকলের উপস্থিতিতে পড়া হবে, এবং আমাকেও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে, তখন আমি আশ্বস্তই হলাম। তাহলে তো আমাকে ওঁরা মর্যাদা দিচ্ছেন! সিনেমা-কর্তৃপক্ষ সাহিত্যকে মর্যাদা দেন এটা আমার মতো অভাজনের পক্ষে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা বটে।

যথা নির্দিষ্ট দিনে আমি মিস্টার বি. এন. সরকারের এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম অনেক গণ্যমান্য অতিথি হাজির আছেন। চিত্রনাট্য লেখক নিতাই ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পরিচয়

করিয়ে দিলেন মিস্টার সরকার। আর ছিলেন শিল্প-নির্দেশক সৌরেন সেন। আরও ছিলেন পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। সকলের নাম আজ স্মরণে নেই।

প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল গৃহস্বামীর। খাওয়ার শেষে পড়া আরম্ভ হবে। সৌরেন সেন বললেন—এবার পড়া আরম্ভ হোক—

আমারই গল্প অন্য লোকের কলমে লেখা। অন্য লোকের মুখে শোনা। এও এক অভিজ্ঞতা বৈকি! মিস্টার বি. এন. সরকার সিগারেট ধরালেন। সবাই নিস্তব্ধ। আস্তে আস্তে পড়া আরম্ভ হলো।

সৌরেন সেন ছিলেন তখনকার দিনে কলকাতার সিনেমা-জগতের নাম করা একজন আর্ট-ডাইরেকক্টর। বাঙলাদেশের ছবি দেখলেই বোঝা যায় কী দারিদ্র্য তার সর্বাঙ্গে। বহিরঙ্গের এত দারিদ্র্য আর কোনও ভাষার ছবিতে আছে কিনা সন্দেহ। সেই দারিদ্র্যের দরুন অল্প খরচের মধ্যে কম পয়সায় শিল্প-নির্দেশনা করা সোজা কথা নয়। বিরাট বড়লোকের বিরাটতম প্রাসাদ করতে হবে, অথচ অল্প টাকার মধ্যে! এর মোকাবিলা করতে সৌরেন সেন আছে! বেশি খরচ করবার সাধ্য নেই প্রোডিউসারের অথচ বেশি খরচের ভাঁওতা দিতে হবে। তার জন্যে সৌরেন সেন আছে। বদনাম হলে হবে আর্ট ডাইরেক্টারের।

পরে অবশ্য এই সৌরেন সেনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম। যখন আমি বোম্বাই প্রদেশে ছিলাম কিছুদিনের জন্যে।

কিন্তু সে-কথা পরে বলবো।

আর কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের নাম আমার আগেই শোনা ছিল। সিনেমা-ডাইরেক্টর বলতে যে-চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের চেহারার বা আচরণের কোনও কিছু মেলে না। নেহাতই সাদাসিধে ডাল-ভাত চেহারার মানুষ। দরকার হলে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী হিসেবেও মানিয়ে যায়, আবার র‍্যালি ব্রাদার্সের ক্যাশ-ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হিসেবেও মানিয়ে যায়।

আরো যাঁরা যাঁরা চিত্রনাট্য শুনতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাদাসিধে সাধারণ মানুষ। আমি যে সিনেমা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বসে আছি তা মনে হয়নি।

বিরাট হলঘর। চারদিকে গোল হয়ে ছড়িয়ে বসা। নিতাই ভট্টাচার্যমশাই পাতার পর পাতা তাঁর নিজের লেখা চিত্রনাট্য পড়ে চলেছেন। সবাই চুপ

করে শুনছেন। মিঃ বি. এন. সরকার একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছেন।

হঠাৎ আমার নজর পড়লো আর্ট-ডাইরেক্টর সৌরেন সেনের দিকে। নিঃশব্দে তিনি নাক ডাকাচ্ছেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নিতাই ভট্টাচার্য চিত্রনাট্য পড়ছেন আর এক-একবার মুখ তুলে মিঃ সরকারের দিকে চেয়ে দেখছেন।

কিন্তু মিঃ সরকার নির্বিকার। তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছেন।

রাত যখন সাড়ে ন'টা তখন কে যেন বললেন—এখন আজকের মত থাক—

সঙ্গে সঙ্গে চিত্রনাট্য পড়া বন্ধ হলো। সবাই নড়ে চড়ে বসলেন এবার। সৌরেন সেনও তখন জেগে উঠেছেন। বললেন—হ্যাঁ, আজ এই পর্যন্তই থাক—

থাক তো থাক্‌!

সবাই গাত্রোত্থান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বাড়ি পেরিয়ে রাস্তায় এলগিন রোডে পড়া গেল। তখন একটু একটু করে সকলের মুখেই কথা ফুটলো। উপন্যাস ভালো কি খারাপ সে প্রশ্ন তখন অবান্তর। চিত্রনাট্য ভালো কি মন্দ সেইটেই প্রশ্ন। কিন্তু ভালোমন্দ বিচার তখনই হবে যখন সবটা শুনবো। তার আগে তো মন্তব্য করা যায় না। সুতরাং সবাই বেঁচে গেলেন। আমিও মন্তব্য করার দায় থেকে সেদিন অব্যাহতি পেলাম।

ঠিক হলো পরে আর একটা তারিখ ধার্য করে সব শ্রোতাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

তারপর আমরা যে-যার বাড়ি চলে গেলাম। একদিনের এবং বলতে গেলে কয়েক ঘণ্টার মাত্র পরিচয়। সুতরাং শুকনো বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে আমি চলে এলাম। আর তা ছাড়া কাকে কী বলবো? চিত্রনাট্য ভালো হলো কি মন্দ হলো তা বলারই কী আমার অধিকার আছে?

আমি গল্প লিখি। এবং গল্প-উপন্যাস মোটামুটি বুঝি। কিন্তু চিত্রনাট্য কখনও লিখিনি, এবং শুনিও নি।

গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে চিত্রনাট্যের মূলগত একটা তফাত সেদিনই প্রথম লক্ষ্য করলাম।

গল্পে আমরা (অন্তত আমি) সমস্ত চিত্রটা স্পষ্ট করে ধরে দেবার চেষ্টা করি।

যে ঘটনার কথা লিখি তার পাত্র-পাত্রী পরিবেশ, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে দৃশ্যটা জীবন্ত করবার চেষ্টা করি। তার সঙ্গে সংলাপও জুড়ে দিই প্রয়োজনমত। গল্পের তত্ত্বকথা যাই-ই থাক, ঘটনা-সংস্থাপন আর চরিত্রসৃষ্টি যথাযথ না হলে তত্ত্বটা স্পষ্ট হয় না।

উদাহরণ দিলে জিনিসটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

দেবদাস শরৎচন্দ্রের উপন্যাস। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে চোখের সামনে ছবি দেখতে পাই। সেই গ্রাম, সেই পুকুর-ঘাট, সেই ঘরবাড়ি, সেই দেবদাস, সেই পার্বতী। শরৎচন্দ্র প্রত্যেকটি জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন। যে-টুকুর বর্ণনা দেন নি সেটা আমাদের কল্পনা করে নিতে বাধে না। আমাদের কল্পনার রং-তুলি দিয়ে তা আমরা মনে এঁকে নিই।

কিন্তু চিত্রনাট্য বোধহয় অন্য জিনিস। সেটা হলো আসলে সিনেমার প্রয়োজনে লিখিত খসড়া বিশেষ। ঠাকুর গড়বার আগে যেমন খড়ের কাঠামো। সেই খড়ের কাঠামো দেখে পূজারীর বুঝতে পারার কথা নয় সেই কাঠামোর ওপর মাটি-রং-চোখ বসালে তা কেমন দেখাবে।

আমার অবস্থাও ঠিক তখন তাই।

আমি নিঃশব্দে মুখ বুজে সেদিন বাড়ি চলে এসেছিলাম। এইটুকু মাত্র বুঝেছিলাম যে আমি সেই আংশিক চিত্রনাট্য পড়ে বুঝতে পারিনি তা কতদূর উপন্যাসানুগ হয়েছে।

কিন্তু ও-সব কথা নিয়ে আমার মাথাব্যথার দরকারই বা কী! যারা আমার উপন্যাসের কাহিনীকে সিনেমায়িত করেছেন তারাই সেটা ভাবুন। ধরা যাক যদি চলচ্চিত্ররূপ খারাপই হলো, তাতেই বা কী? তাতে আমার বই-এর ওপর তো আঁচড় পড়ছে না।

আঁচড় অবশ্য পড়তো যদি 'সাহেব বিবি গোলাম' না হয়ে অন্য কোন অল্প-পঠিত উপন্যাস হতো। যে-বই প্রত্যেক সংসারে, প্রত্যেক ড্রয়িংরুমে, প্রত্যেক ক্লাবে, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে, এমন কি প্রত্যেক রান্নাঘরে গিয়ে পৌঁছেছে, তার সিনেমা-রূপ খারাপ হলে প্রযোজকেরই বদনাম হবে। আমার উপন্যাসের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই কিছু। সে-বদনাম আমাকে স্পর্শ করবে না।

কিন্তু স্পর্শ করবে না বললে ঠিক বলা হয় না।

কারণ বাঙলাদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বা কত! যাঁরা মাত্র কোনও রকমে নামসই করতে পারেন তাদের সংখ্যাই এ-দেশে বেশি। নিরক্ষর লোকের

কথা তো ছেড়েই দিলাম। এ-দেশে তাই তো পাঠক সংখ্যার চেয়ে দর্শক সংখ্যা বেশি।

আমি নিজে লেখক বলে আমার ইচ্ছে দর্শকের সংখ্যার চেয়ে পাঠকের সংখ্যা বেশি হোক। তাদের বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা বাড়ুক। বই যে পড়ে তার সিনেমা দেখতে বাধা নেই। যে-দেশে সবাই শিক্ষিত সে-দেশে কি আর সিনেমা চলছে না? বরং বেশি করেই চলছে। তারা একাধারে বইও পড়ে সিনেমাও দেখে।

তার কয়েকদিন পরে নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আর একটি নিমন্ত্রণের চিঠি এল। একটা নির্দিষ্ট তারিখে চিত্রনাট্যটির বাকি অংশ পড়া হবে। আমি যেন সেদিন যথারীতি উপরিলিখিত ঠিকানায় হাজির হই।

চিঠিটা পেয়ে কী করবো বুঝতে পারলাম না আমার যাওয়া উচিত কি উচিত নয়!

অনেক ভাবলাম। সিনেমায় আমার বহুপঠিত, বহুনিন্দিত ও বহুপ্রশংসিত উপন্যাস দেখানো হবে, এটা তো কম আনন্দের কথা নয়। বিশেষ করে আমার মত নতুন লেখকের পক্ষে।

অনেকবার ভাবলাম। ভাবলাম তবে কি আমি সিনেমার জন্যেই সাহিত্য করি? সাহিত্যিকের সার্থকতা কি তার গল্প সিনেমায়িতা হওয়াতে? আমি কি অর্থ-উপার্জন করার জন্যে সাহিত্য রচনা করি? আমি মিতব্যয়ী মানুষ। একমাত্র বই পড়া আর লেখার নেশা ছাড়া আর কোনও নেশাই আমার নেই। নেশাখোর দেখলে সাধারণত আমার মনে ভয় এবং দয়া উদ্রেক হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। তাহলে কেন আমি এত ভাবছি?

ভাবছি কারণ আমি সামাজিক জীব বলে। সমাজকে উপেক্ষা করতে পারিনি বলেই আমার উপন্যাস আমি বাধ্য হয়ে সিনেমায়িত হতে দিয়েছি। গ্রাহাম গ্রীণের যে-কারণ আমি আগে দেখিয়েছি সে-কারণ আমার ওপর প্রযোজ্য নয়।

নির্দিষ্ট দিনে আমি আর গেলাম না। আগের দিনের মতো চিত্রনাট্য নিশ্চয়ই পড়া হয়েছিল, কিন্তু আমি আর তার কোনও খবর রাখলাম না।

এর প্রায় একমাস পরে হঠাৎ একদিন দু'জন ভদ্রলোক আমার বাড়ি এলেন।

আমি দেখেই চিনতে পারলাম। একজন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় আর একজন সৌরেন সেন।

তাঁরা এসে আমার ঘরে বসলেন।

কার্তিক চট্টোপাধ্যায় বললেন—সেদিন গেলেন না কেন ?

কৈফিয়ৎ হিসেবে বললাম—আমি সিনেরিও কিছু বুঝতে পারি না।

কার্তিকবাবু বললেন—ভালোই করেছেন। আপনার না গিয়ে কোনও ক্ষতি হয়নি।

জিজ্ঞেস করলাম—কেমন হলো শেষ পর্যন্ত ?

কার্তিকবাবু বললেন—সেই কথা বলতেই তো আমরা এসেছি আপনার কাছে। সরকারসাহেব আমাকেই ছবিটা পরিচালনা করতে দিয়েছেন—

বললাম—আপনার দু'একখানা ছবি আমি দেখেছি। বিশেষ করে 'মহাপ্রস্থানের পথে', আমার খুব ভালো লেগেছে।

কার্তিক চট্টোপাধ্যায় বললেন—যে থান-ইঁটের মতো বই লিখেছেন, ও কি মশাই আমি ছবি করতে পারবো ?

আমি মার্গারেট মিচেলের 'গন্ উইথ্ দ্য উইন্ড্' বইটার নাম করলাম। ডস্টয়ভস্কির 'ব্রাদারস্ কার্মাজভ্'-এরও নাম করলাম। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড্ পিস'-এরও নাম করলাম। তাঁদের চেয়ে ছোটোখাটো লেখকের আরো অনেক বই-এরও নাম করলাম।

কার্তিক চট্টোপাধ্যায় বললেন—ওদের দেশের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের বাঙলাদেশে তো অত বড় বই নেই। আপনি মশাই না খেয়ে-দেয়ে একেবারে একখানা থান-ইঁট লিখে ফেলেছেন।

বললাম—তা তাও তো গিলে খাচ্ছে সবাই। বলছে আরো বড় হলে ভালো হতো—

কার্তিক চট্টোপাধ্যায় বললেন—আপনি তো লিখে খালাস। আমাকে তো সিনেমায় আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ওটা শেষ করতে হবে—

বললাম—কিন্তু আমি তো আর সিনেমার কথা ভেবে লিখিনি—

এতক্ষণে সৌরেন সেন কথা বললেন। বললেন—আসলে আমরা যে-জন্যে এসেছি সেটা বলি। আপনাকে একটু কলম চালাতে হবে। সিনেরিওটা আপনাকেই করে দিতে হবে—

এতক্ষণে তাদের আসার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হলো। বললাম—কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করেই সে-রকম কন্ট্র্যাক্ট্ করিনি।

কার্তিকবাবু বললেন—আপনার বই, আপনি যদি ঠিক না করে দেন তাতে তো আপনারও বদনাম হবে!

বললাম—আমার বদনাম তো আছেই। 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয়,' আমার হচ্ছে সেই অবস্থা। কাগজে দেখেননি আমার বিরুদ্ধে কত কুৎসা ছাপা হয়েছে। আমি নাকি শিবনাথ শাস্ত্রীর বই থেকে চুরি করেছি গল্পটা—

কার্তিকবাবু বললেন—আমিও কথাটা শুনেছি। ব্যাপারটা কী বলুন তো?

বললাম—নানা রকম গুজব বাজারে ছড়িয়েছে। একটা পত্রিকা লিখেছে বিমল মিত্তির ইন্‌কাম-ট্যাক্স দেয় কি না, সরকার যেন তার খোঁজ করেন—। আমার কাছে ছাপানো নিন্দেগুলোর কাটিং পাঠিয়ে দেয় কাগজওয়ালারা। আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন তার প্রতিবাদ করি—

সৌরেন সেন বললেন—তা আপনি উত্তর দেন না কেন?

বললাম—পাগলে কী-না বলে, ছাগলে কী-না খায়! বাইরে ফরসা জামা-কাপড়পরা সব ভদ্রলোক। ভেতরে ভেতরে সব শয়তান—

সৌরেন সেন বললেন—ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এবার সিনেমা হচ্ছে, এবার দেখুন না আরো কত শত্রু বেড়ে যায়। তারা ছবি তোলা বন্ধ করতে পারবে না, যখন ছবি রিলিজ্ হবে, তখন চুটিয়ে গালাগালি দেবে—

বললাম—তাহলে জেনে-শুনে আপনারা ছবি করছেন কেন?

কার্তিকবাবু বললেন—খবরের কাগজের নিন্দে-প্রশংসার কোনও দাম নেই মশাই। এ-সব আমরা অনেক দেখেছি। পয়সা পেলে আবার ওরাই প্রশংসায় সাত-কাহন লিখে দেবে—

আমার এ-সব জানা ছিল না। অবশ্য এ-সব জানবার কথাও নয়। সাহিত্যের সমালোচনার বেলায় অবশ্য কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। পাঠক-পাঠিকারা সমালোচকের নিন্দে-প্রশংসার ধার ধারে না, সেটা আমার জানা ছিল। বিশেষ করে বাঙলাদেশের পাঠক-পাঠিকার সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা থেকে বলতে পারি, তারা বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ! কিন্তু সিনেমার দর্শকরাও যে তাই তা সেদিন আমি প্রথম শুনলাম।

কার্তিকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা হলে সিনেরিও করে দেবেন?

আমি বললাম—সিনেরিওর কিছুই যে আমি জানি না। জীবনে যে কখনও ও-সব করিওনি—

কার্তিকবাবু বললেন—না-ই বা করলেন। চেষ্টা করতে দোষ কী?

এখন, সাহিত্যিকের জীবনে এ একটা মস্ত সমস্যা। একদিকে আরাম,

আর একদিকে অমানুষিক পরিশ্রম! মনে আছে যখন সিনেরিও পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে তখন শারীরিক বা মানসিক কোনও কষ্টই বোধ করিনি। বেশ গল্প করতে করতে, আড্ডা দিতে দিতে লেখা। এতদিন গল্প-উপন্যাস লিখে এসেছি। তার পরিশ্রমের কথাও মনে আছে। সে-পরিশ্রমের কথা ভাবলেই ভয় হয়েছে। সেই রাতের পর রাত জাগা। একটা সিচুয়েশানের জন্যে প্রাণপাত। কিংবা একটা ডায়ালগের জন্যে মাথার চুল ছেঁড়া। পৃথিবীর সমস্ত লোক যখন ঘুমোচ্ছে তখন আমার চোখে ঘুম নেই। অতন্দ্র প্রহরীর মতো আমি উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা হয়ে চারদিকে নজর রাখছি। কোথাও যেন কোনও খুঁত না থাকে। গল্পের একটা সুতো যদি কোথাও ঝুলে থাকে তো সেটাকেও সামলে নিয়ে তার সামঞ্জস্য-বিধান করতে হবে। অনেকটা যেন খেয়াল বা ঠুংরী গানের মত। রাগ-রাগিণীর একটা বাঁধা পথ তো শাস্ত্রেই লেখা আছে। কিন্তু তাতে প্রাণ সঞ্চার করা কি সহজ? নিজেই গল্পকে জটিল-জালে জড়াতে হবে, আবার নিজেকেই সেই জাল কেটে গল্পকে একটা পরিণতির সুষ্ঠু সমাধানের প্রান্তরে বার করে নিয়ে আসতে হবে। সেখানে সাহায্য করবার কেউ নেই। সমাধান বাত্‌লে দেবার জন্যেও কেউ নেই। তোমার তৈরি মুশকিল তোমাকেই আসান করতে হবে!

কিন্তু সিনেরিও অন্য জিনিস।

সেখানে পরিচালক বসে আছে। আছে তার অ্যাসিস্‌টেন্‌ট্‌। দরকার হলে ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা-অভিনেত্রী, তারাও এসে দুটো পয়েন্ট্‌ বলে দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

সিনেরিও করতে করতে আমার মনে হলো—এই? এর নাম সিনেরিও?

সত্যিই যদি সিনেরিও এত সহজ হয় তাহলে কে আর কষ্ট করে উপন্যাস লিখতে যাবে? এত সহজে যদি অর্থও পাওয়া যায় তাহলে রাত জেগে একলা-ঘরে বসে কেন আমি উপন্যাস লিখতে যাবো?

সিনেমা সকলের মিলিত কাজ বলেই এত সহজ, সাহিত্য একক লেখকের কাজ বলেই এত কষ্টকর। কষ্টকর বটে কিন্তু তা পড়তে কষ্টকর নয়। যে পড়বে তার যেন পড়তে পড়তে মনে হয় লেখক সমস্ত বইটা আনন্দের আবেগে লিখে গেছে। লেখক যে রাত জেগে লিখেছে, সেই রাত জাগার ছাপ যেন কোথাও না লাগে। কত শব্দ কত পঙ্‌ক্তি কেটেছে আর লিখেছে, লিখেছে আর কেটেছে, তার পরিচয় যেন কোথাও না থাকে।

এই সহজ-সাধ্য কাজ বলেই আমি সিনেরিও লেখার মধ্যে কোনও আকর্ষণ বোধ করলাম না।

সেদিন এক সিনে-ক্লাবের একটা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম নিমন্ত্রিত হয়ে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম নায়ক-নায়িকা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এ যেন সাহিত্যকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে শিল্প কোথায়? আজকের সাহিত্যেও যেমন প্লটহীন গল্প, তেমনি সিনেমাও নিরাকার। শিল্পের তকমায় যা-কিছু চালাবো আর তুমি বাহাদুরি দেবে, এ-রকম যুগ আগে ছিল না। গুরুবাদের দিন না-হয় চলেই গেল, তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু শিল্পেরও তো একটা মূল শর্ত থাকে। নেহাত যেমন হাওয়া খেয়ে মানুষ বাঁচে না, শেকড় না থাকলে যেমন গাছ সজীব থাকে না, তেমনি শিল্পও একটা আদিম শর্তকে না মানলে শিল্প হয়ে গড়ে ওঠে না। গান গাইবো, কিন্তু তাতে সুরের স্পর্শ না থাকলে আমি তাকে গান বলে স্বীকারই বা করবো কেন, আর সে-গান আমার শুনতে ভালোই বা লাগবে কেন?

সেদিন রাস্তায় এক পাগলের সঙ্গে দেখা হলো। চেনা ছেলে। কিছুদিন হলো তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখেই পাগল কাছে এল।

বললাম—কেমন আছো?

পাগল ছেলেটা বললে—ভাবছি ব্রেনটা একবার ডাক্তারকে দেখাবো দাদা—

—কেন, ব্রেনে কী হয়েছে?

পাগল বললে—দেখুন না, আমি ইংরিজী বললে কেউ বুঝতে পারছে না।

আমি হাসিটা চেপে জিজ্ঞেস করলাম—বাঙলা বললে?

পাগল বললে—বাঙলা বললে গড়-গড় করে বুঝতে পারছে। শুধু ইংরিজীটা নিয়েই হয়েছে মুশকিল! বোধহয় আধখানা ব্রেন অপারেশন করতে হবে—

সিনে-ক্লাবের ছবি দেখতে দেখতে আমার কেবল তাই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এ-সব ছবির স্রষ্টিকর্তাদের আধখানা ব্রেনে কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?

রোম সাম্রাজ্যের পতন একদিন হয়েছিল নানা কারণে। তার সঙ্গে আর একটা কারণ ছিল। সেটা শিল্পের মৃত্যু। সেই সময়ে এমন কয়েকজন সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল যাঁরা বিকৃত রুচিকেই শিল্প বলে চালাতেন। স্যাফো তাঁদের মধ্যে একজন। যুগে যুগে শিল্পের রীতি-নীতি বদলিয়েছে। কিন্তু মূল

রীতিটি বদলায়নি। সেটা হলো সংযম। যাকে সহজ ভাষায় বলা যায় গ্রহণ-বর্জনের সমন্বয়। জীবনের ক্ষেত্র বিরাট। শিল্পে তার কিছুটা বর্জন করতে হয়, আর কিছুটা করতে হয় গ্রহণ। কতটুকু গ্রহণ করবো আর কতটুকু করবো বর্জন সেটা শিল্পীর নিজস্ব ব্যাপার। তার ক্ষমতার ওপর সেটা নির্ভরশীল। কিন্তু সেই মাপটারও একটা মানদণ্ড আছে। সেই মানদণ্ডটা কে ঠিক করবে? সে-কাজ মহৎ শিল্পীর।

সূর্য প্রতিদিন ভোরবেলা পুবের আকাশে ওঠে।

কেউ যদি বলে—ওহে সূর্য, এবার তোমার যুগ গেছে, এবার তুমি পশ্চিম দিক থেকে ওঠো—

সূর্য বলবে—আমার যুগ যে গেছে তার প্রমাণ কই?

সে বলবে—প্রমাণ এই যে এখন আমরা আরো সভ্য হয়েছি, গরুর গাড়ির যুগ পেরিয়ে আমরা এখন জেট-প্লেনের যুগে এসে পৌঁছেছি, এখন আর আমরা ন্যাংটো হয়ে কিংবা গাছের ছাল পরে বেড়াই না, এখন আমরা ধুতি-শার্ট কোট পাঞ্জাবি পরি, এখন আমরা চাঁদের চারপাশে উড়ি, উপনিষদ-বেদ অতিক্রম করে এখন আমরা মর্ডান নভেল লিখি, পপ্-সং গাই—

সূর্য বলবে—তোমরা মর্ডান হও, কিন্তু আমি আল্ট্রা মর্ডান, তাই আমি বদলাই না। প্রতিদিন আমি নবজন্ম গ্রহণ করি বলেই আমি নতুন। রোজ পূব দিক দিয়ে উঠলেও আমি নতুনই থাকবো, আর তোমরা পপ্-সং গাইলেও আস্তে আস্তে পুরোন হয়ে যাচ্ছো—

রবীন্দ্রনাথ তাই লোকেন পালিতকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—"মানুষের প্রবাহ হু-হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকছে না—কেবল সাহিত্য থাকছে। সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এর জন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্বের সহিত রক্ষা করে।"

কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক। যে-কথা বলছিলাম সেই কথা বলি।

মিস্টার সরকারের এলগিন রোডের বাড়িতে একটা নিরিবিলি ঘরে বসে আমরা দু'জনে সিনেরিও লিখতাম। মিঃ সরকার তখন সপরিবারে শিমুলতলায় ছুটি কাটাতে গেছেন।

একদিন লেখা শেষ হলো।

কার্তিকবাবু বললেন—কাল সরকারসাহেব কলকাতায় আসছেন। কালকেই সিনেরিওটা ওঁকে শুনিয়ে দেব। একটু সকাল সকাল আসবেন—

বললাম—ঠিক আছে—

কার্তিকবাবু তারপর বললেন—আর একটা কথা। সরকারসাহেব যদি জিজ্ঞেস করেন যে সিনেরিওটা আপনার কেমন লেগেছে, আপনি বলবেন—আপনার ভালো লেগেছে—বুঝলেন?

কেমন যেন খারাপ লাগলো কথাটা। যা বুঝিনি, তা বুঝেছি বলতে হবে, এটা ভালো লাগলো না। তবে একটা জিনিস এতে পরিষ্কার হয়ে গেল এই যে আমার মতো একজন আনাড়ি লোকের মতেরও একটা মূল্য আছে। তেরো বছর বয়েস থেকে সাহিত্য করছি, সেই দীর্ঘদিনের পরে মনে হলো যেন আমার একটা কথার দামের মর্যাদা একজন এখন দেবে। আজ সত্যি বলছি সেদিন কথাটা ভেবে আনন্দই হয়েছিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমার একটা শর্ত ছিল। আমি বলে নিয়েছিলাম—এই যে আমি চিত্রনাট্য লিখছি এটা যেন কোথাও উল্লেখ না থাকে—

কার্তিকবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন? আপনি যে চিত্রনাট্যও লিখতে পারেন এটা প্রচার হলে তো আপনারই লাভ!

বললাম—লাভ নয়, আমার লোকসান।

—সে কী মশাই! আমি তো দেখেছি সবাই নাম দেবার জন্যে ছটফট করে। আপনি কি তবে নাম চান না?

বললাম—চিত্রনাট্যকার হিসেবে নাম চাই না। ওটা আমার পক্ষে বদনামের সামিল। তবে চিত্রনাট্যকার হিসেবে কারো নামই দিতে পারবেন না। এটাও আমার একটা অনুরোধ।

দিন পঁচিশেক পরিচালকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কাজ করার সূত্রে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল আমাদের পরিচয়। চিত্রনাট্যের কাজ এমনই যে ঘনিষ্ঠ না হলে ভাল কাজ হওয়া অসম্ভব। পরিচালককে আর চিত্রনাট্য-লেখককে একাত্ম হতে হবে। একাকার হতে হবে। দু'জনে এক ভাবনায় ভাবিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুই জনে।' এও তাই। একজন কলম দিয়ে লিখবে বটে, কিন্তু আর একজন মনে মনে লিখবে। সেই ক'দিনের মধ্যেই আমি কার্তিকবাবুকে পুরোপুরি চিনে

ফেললাম, আর কার্তিকবাবুও আমাকে পুরোপুরি চিনে ফেললেন। আমাদের দু'জনের মধ্যে আর কোনও অপরিচয়ের বা অর্ধ-পরিচয়ের আড়াল রইল না।

প্রতিদিন দুপুরবেলা এলগিন রোডের ফাঁকা বাড়িটায় যাই। মনে আছে সেটা গ্রীষ্মকাল। ঘরটার পাশেই একটা বাগান। অনেকখানি ঘাস বিছোন জমি। ঘরের মধ্যেও রোদ আসে। আমরা দু'জনে সমস্ত পৃথিবী ভুলে গিয়ে ষাট-সত্তর বছর আগের কলকাতায় ফিরে যাই। একদিন নিজের পছন্দমতো করে উপন্যাস লিখেছিলাম। তখন জানতাম না গল্প-লেখার গ্রামার। গল্পের কোন্ সুইচটা টিপলে কোন্ আলোটা জ্বলে, বই পড়তে পড়তে কেন লোকে হাসে-কাঁদে-ভাবে, তার নিয়মগুলোও আমার জানা ছিল না। চিত্রনাট্য করতে করতে আবিষ্কার করলাম সে-সব আইনগুলো! ও, এই জন্যে এটা লিখেছি, এই জন্যে এখানে এই লাইনটা বসিয়েছি। আইন না জেনে যা লিখেছি, আইন জানার পর সে-রকম লিখতে পেরেছি কিনা কে জানে। আইন জানা ভালো কি মন্দ তাও বলতে পারি না। এটা অনেকটা সহজাত ব্যাপারের মতো। ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতাটাও সহজাত। শিক্ষা-সাপেক্ষ নয়। মোটামুটি দেখা গেছে যাদের আমরা অশিক্ষিত বলি তাদের রসবোধ তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের রসবোধের চেয়ে বেশি। রামপ্রসাদের গান যেদিন চাষা-ভূষোদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো সেইদিনই রামপ্রসাদ সঠিক বলে পরিচিত হলেন। কলেজের মাস্টারমশাইরা ক্লাসের ছাত্রদের যা পড়ান সেটা তাদের পরীক্ষা-পাসে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু রসবোধের সহায়ক কখনও হয় না। কোনও খাদ্যবস্তু খেতে ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো তা বোঝবার জন্যে পাক-প্রণালীর বই না পড়লেও চলে। যে ভালো রান্না করতে জানবে, তার রসনাও যে নিখুঁত হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তেমনি যার রসনা নিখুঁত সে যে রন্ধন-বিদ্যেতেও পটু হবে এমন দাবিও অচল। যে লোক ভোজনবিলাসী তার শ্রেষ্ঠ যাচাই হচ্ছে তার জিভ। আর যে লোক রন্ধন-পারদর্শী তার শ্রেষ্ঠ মূলধন হলো তার নিষ্ঠা আর অভিজ্ঞতা।

একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক তাঁর রচনা তাঁর বাড়ির ঝিকে শুনিয়ে জানতে চাইতেন লেখাটা কেমন। সেই ঝি যদি বলতো ভালো, তাহলেই তিনি খুশী হতেন। পণ্ডিতরা পাণ্ডিত্য জানতে পারে। কিন্তু রস তো অন্য জিনিস। রসের গরজ বড় গরজ। সে দেশভেদ মানে না, জাতিভেদ মানে না। ব্রাহ্মণরা লালন-ফকিরের বাড়িতে পাতা পেতে খেতেন না বটে, কিন্তু তার গানের রস

আস্বাদ করতে তাঁদের বাধতো না। পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্না দিয়েও এই রসের ডিগ্রী পাওয়া যায় না।

মাইকেল মধুসূদন যখন 'মেঘনাদ বধ' কাব্য লিখলেন তখন পণ্ডিতসমাজ বিরূপ মন্তব্য করলেন। বিদ্যাসাগরমশাই তো ব্যাকরণের ভুলও ধরলেন। তা মাইকেল তো পাণ্ডিত্যের ফেরিওয়ালা নন, রসের কারবারি। তিনি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও, সুদিনের অপেক্ষায় রইলেন।

একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ বৃষ্টি এল। তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন কাছের একটা মুদিখানার দোকানের চালের তলায়। মুদিখানার ভেতরে তখন একজন কী একটা বই নিয়ে জোরে জোরে পড়ছে, আর কয়েকজন শ্রোতা তা মন দিয়ে শুনছে।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো—ওরা তাঁরই বই পড়ছে, 'মেঘনাদ বধ'।

চমকে উঠলেন মাইকেল। যে বই পণ্ডিতরা নিন্দে করেছে, যে বইএর ব্যাকরণ ভুল বলেছেন বিদ্যাসাগর, সে বই সাধারণ মুদিখানার দোকানে পড়া হচ্ছে, এবং তা সাধারণ লোক মন দিয়ে শুনছে! এ তো এক অভাবনীয় ব্যাপার!

যতক্ষণ তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ততক্ষণ তারা পড়তে লাগলো। উপভোগ করতে লাগলো। তারপর যখন বৃষ্টি থামলো, তখন তিনি আবার রাস্তায় বেরোলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে তাঁর 'মেঘনাদ বধ' সম্বন্ধে আর কোনও ভয় নেই। সাধারণ লোক যখন তাঁর লেখাকে গ্রহণ করেছে তখন পণ্ডিতরা যা ইচ্ছে বলুন তাতে তাঁর কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

এ-রকম ভূরি-ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু মনে হয় উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

অনেকদিন আগের কথা। কিন্তু এখনও মনে আছে। সুদূর বেহারে তখন বাঙালী উচ্ছেদ আন্দোলন চলছে। প্রাদেশিকতার পাপ তখন বেহারে মারাত্মক রূপ নিয়েছে। যারা পুরুষানুক্রমে বেহারের অধিবাসী তাদেরও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিতে হবে, নইলে বেহার ত্যাগ করে বাঙলাদেশে ফিরে আসতে হবে। প্রবাসী বাঙালীরা সেখানকার সরকারী চাকরি পাবে না। সেখানে ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করতে পারবে না। বলতে গেলে এককথায় তখন বেহারের বাঙালী-মহলে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

আমার দাদা বেহারের ডাক্তার। ডাক্তার বিজয়কুমার মিত্রের তখন সমস্তিপুরে খুব নামধাম প্রতিপত্তি। প্রতিদিন ভোর থেকে রোগীদের কিউ লেগে যায়। সব রোগীদের চিকিৎসা করতে রাত দশটা-এগারোটা বাজে। তাতেও রোগী দেখা শেষ হয় না। তারা থেকে যায় সেখানে। তাদের থাকবার, রান্না করবার সুব্যবস্থাও আছে সেখানে।

খবরের কাগজে যখন বাঙালী-বিতাড়নের সংবাদ পড়তাম তখন মনে মনে ভয় হতো দাদার জন্যে। দাদাকেও কি কলকাতায় চলে আসতে হবে ?

একবার কলেজের ছুটিতে গেলাম সেখানে। কিন্তু আশ্চর্য, গিয়ে দেখলাম সেই আগেকার মতোই ডাক্তারখানায় রোগীদের ভিড়। বাঙালী বিদ্বেষ বলে কোনও লক্ষণও দেখা গেল না। রোগীরও কিছু কমতি দেখলাম না। বেশ সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক।

একান্ত হতেই জিজ্ঞেস করলাম—কই, খবরের কাগজে যে বাঙালী বিদ্বেষের কথা পড়েছিলাম, তোমাদের এখানে কিছু তো সে-সব দেখছি না!

দাদা হেসে বললে—আমি তো ডাক্তার, আমার আবার জাত-বিচার কী ?

সত্যিই তাই। সাহিত্য এমনই একটা জিনিস যা দেশ-কাল-জাতি বিভাগের ধার ধারে না। তাই টলস্টয়ের রচনা যখন পড়ি তখন এ-কথা মনে হয় না যে আমি বিদেশীর লেখা পড়ছি। আবার আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের লেখা যখন ইংলণ্ডের পাঠকরা পড়েন তাঁদের মনে হয় না যে তাঁরা বিদেশীর রচনা পড়ছেন।

সম্প্রতি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে খবরের কাগজে।

একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক টলস্টয়ের জীবনী নিয়ে সিনেমা করছেন। ভদ্রলোকের নাম আমাদের কাছে একটু দুর্বোধ্য। Seriojha Yermoluisky.

এত জিনিস থাকতে তিনি টলস্টয়ের জীবনী নিয়ে কেন সিনেমা করছেন তার একটা মজার কাহিনী আছে।

সেই কাহিনীটা বলি :

সাহিত্যের সার্থকতা কীসে তা নিয়ে পৃথিবীতে নানা প্রশ্ন নানা মানুষের মনে উদয় হয়েছে। সাহিত্য কি যশের জন্যে, না অর্থের জন্যে? না কি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে? সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়ে কখনও কোনও পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধ বাধেনি সত্য, কিন্তু সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত

হয়ে তাঁদের আচরণে আর আদর্শে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন।

লেখার মধ্যে যাঁদের সত্ত্বগুণের পরিচয় থাকে, ব্যক্তিগত জীবনে হয়ত তাঁরা তামসিক আচরণ করেন।

জীবন আর জীবিকা কি সকলের এক ?

কিন্তু টলস্টয় বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে এ-ব্যাপারে একক এবং একমাত্র ব্যতিক্রম।

এ নিয়ে অনেক মতভেদ হবে আমি জানি। কিন্তু তবু যেখানে যত সাহিত্যিকের জীবনী আমার হস্তগত হয়েছে তার সবগুলোই পড়েছি। এমন ঘটনা কোথাও পাইনি যেখানে জীবনের সঙ্গে সেই লেখকের লেখার বিরোধ ঘটেছে।

তাই রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন যে প্রত্যেক লেখকের প্রত্যেক গল্পের নায়ক সেই লেখক নিজেই। কথাটা মিথ্যে নয়।

যে ছেলেটি সেই উনিশশো ন'য় সালে চিঠি লিখেছিলো সে এখন প্রবীণ হয়েছে। সে মহামতি জারের রাশিয়া দেখেছে, আবার এখন স্ট্যালিনের রাশিয়াও দেখছে। অনেক বয়েস হয়েছে তার এখন। এখন সারা পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে ইণ্ডিয়াতে।

সেদিন সংবাদ-পত্রের পাতায় দেখলাম সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন —আপনি এত বিষয়-বস্তু থাকতে টলস্টয়ের জীবন নিয়ে সিনেমা করতে চাইছেন কেন ?

ভদ্রলোক বললেন—সারা জীবন আমি কেবল টলস্টয়ের কথাই ভেবেছি, তাঁকেই স্বপ্ন দেখেছি—

বলে তিনি সাংবাদিকদের সেই টলস্টয়ের লেখা চিঠিটা দেখালেন।

সেই ১৯০৯ সালে টলস্টয় নিজের হাতে যে চিঠিটা তাঁকে লিখেছিলেন। অনেক যত্ন করে তিনি সে-চিঠিটা অমূল্য সম্পদের মত নিজের কাছে সঞ্চয় করে রেখেছেন।

তিনি বললেন—আমি লেখক হইনি বা লেখক হতে পারিনি। কিন্তু তার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। কারণ তাঁর চিঠি পড়েই আমি বুঝেছি যে লেখক হওয়া বড় কথা নয়, পৃথিবীতে আরো অনেক বড় কাজ আছে যা চেষ্টা করলে আমি করতে পারি—তাই আমি একটা ছবি পরিচালনা করতে চাই যাতে টলস্টয়ের জীবনের বাণী মূর্তি পাবে—

মনে আছে ম্যাক্সিম গোর্কির কথা। ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে টলস্টয়ের সাক্ষাৎকারের কথা। টলস্টয় তখন ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি আর লিখবেন না। তিনি লেখা ছেড়ে দেবেন। কারণ উপন্যাস গল্প লিখে পৃথিবীর মানুষের তিনি কোনও উপকার সাধন করতে পারছেন না। লাভ হচ্ছে কেবল তাঁর বই-এর প্রকাশকের আর তাঁর নিজেব। তখন তিনি সমুদ্রের ধারে এক আশ্রম তৈরী করে সেখানেই বসবাস করছেন!

ঘোষণাটা শুনে ম্যাকসিম গোর্কির বড দুঃখ হলো। তিনি ভাবলেন যে তিনি টলস্টয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা করে তিনি টলস্টয়কে তাঁর এই সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হতে বলবেন।

তা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি একদিন গেলেন সেই আশ্রমে। শহর থেকে অনেক দূরে, লোকালয়ের বসতির বাইরে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত সেই আশ্রম।

গোর্কি সেখানে গিয়ে শুনলেন টলস্টয় তখন আশ্রমের ঘরে নেই, সমুদ্রের তীরে ধ্যান করছেন। গোর্কি সেই দিকেই গেলেন। গিয়ে দেখলেন খোলা আকাশের তলায় সামনের সমুদ্রের ঢেউ-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বসে আছেন।

গোর্কির কেমন সংকোচ হলো টলস্টয়ের ধ্যান ভঙ্গ করতে। তিনি তাঁর পাশে বসে রইলেন। ভাবলেন যখন টলস্টয়ের ধ্যান শেষ হবে তখন তিনি তাঁর বক্তব্য বলবেন।

কিন্তু আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেল, এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তখনও টলস্টয়ের জ্ঞান নেই। টলস্টয় একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। গোর্কির মনে হলো টলস্টয় এমনই ধ্যান-মগ্ন যে তিনি যদি তখনই আদেশ দেন তো সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ঢেউগুলো পাথরের মত স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে যাবে।

তারপর এক সময়ে দু'ঘণ্টা সময়ও অতিবাহিত হয়ে গেল!

তখন ম্যাক্সিম গোর্কি উঠলেন। তিনি ভাবলেন টলস্টয়ের ধ্যান ভাঙানোর অধিকার তাঁর নেই। তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। আস্তে আস্তে নিজের গৃহের দিকে পা বাড়ালেন।

সেদিনকার সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না, চলে এলাম। কিন্তু আসবার সময় আমার মনে হলো যে যতদিন টলস্টয় এই পৃথিবীতে বেঁচে আছেন ততদিন আমি পিতৃ-মাতৃহীন নই। As long as Tolstoy is alive under the sun I am no orphan."

এরই নাম সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের প্রভাব।

সাহিত্যের ইতিহাসে বা সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসেবে এর চেয়ে মহৎ বাণী আর কী হতে পারে তা আমাদের জানা নেই। সাহিত্য খ্যাতি-অর্জনের জন্যে নয়, অর্থ উপার্জনের জন্যেও নয়, এমন কি প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কোনও কিছুর জন্যেই নয়। সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করা। যে সাহিত্যিক তা করতে পেরেছেন তাঁরাই জগতে জগদ্বরেণ্য হয়ে আছেন। সেই বেদব্যাস বাল্মীকি থেকে শুরু করে সেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সেই একই উদ্দেশ্যে কলম ধরেছিলেন। যেখানেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে সেখানেই জনসাধারণ বিস্মৃতি দিয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষ তাঁকে কখনও ক্ষমা করেনি।

সাহিত্য সম্বন্ধে যে-কথা সত্যি, সিনেমা সম্বন্ধে সে-কথা আরো সত্যি। সিনেমা আরো প্রত্যক্ষ শিল্প। আপামর জনসাধারণের কল্যাণ সাধন সিনেমা দিয়ে যেভাবে সম্ভব হয়, আর কিছু দিয়ে তা সম্ভব হয় না।

তাই সিনেমা সম্বন্ধে চিত্র-নির্মাতাদের আরো সতর্ক হতে হয়। আমার-আপনার-আরো দশজনের ভালোলাগা মন্দলাগার প্রশ্ন নয়। আজ-কাল-পরশুর ভালো-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্নও নয়। বৃহত্তর সমাজের সর্বাঙ্গীণ ভালো-মন্দের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

তা যখন পরের দিন মিস্টার বি. এন. সরকারের সামনে চিত্রনাট্য পড়বার প্রশ্ন উঠলো তখন আমি এই কথাগুলোই চিন্তা করতে লাগলাম। আমি তো সিনেমার কথা ভেবে আমার বই লিখিনি। শিল্পের শর্ত মেনে চিরকালের মানুষ-সমাজের কথা ভেবেই লিখেছি। কিন্তু সিনেমার ছবি করতে গিয়ে যদি তা না হয়? যদি তার শর্তগুলো পুরোপুরি পালিত হবার পথে বাধা পড়ে?

যা হোক ; পরের দিন যথারীতি আমি যথা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়েছি।

কার্তিকবাবুও যথাসময়ে হাজির হয়েছেন।

মোটামুটি চিত্রনাট্যটার জায়গায় জায়গায় ঘষা-মাজার দরকার ছিল। সেটা সেরে নিলাম। প্রায় শ'দেড়েক পাতার পরিশ্রম। দু'জনের অক্লান্ত অভিনিবেশের ফল। এতদিন এত লোকের কাছে এত কথা শোনা গেছে।

কেউ বলেছে—এ বই কী করে সিনেমা হবে?

কেউ বলেছে—সেই আরশোলার দৃশ্যটা থাকবে তো?

কিংবা কেউ আবার বলেছে—আর সেই পায়রা ওড়ানো?

আবার কেউ বা জিজ্ঞেস করেছে—গোরাদের অত্যাচারটা দেখানো হবে তো?

মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। সবাই উৎসুক। সবাই উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এদের সকলের দাবী কি মেটানো যাবে? উপন্যাসের বিক্রি যে কমবে সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। আমার প্রকাশক আগে থেকেই সে বিষয়ে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তো আর কোনও উপায় নেই। তাহলে কলকাতা শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! সুতরাং ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই আমাকে হাড়িকাঠে মাথা দিতে হয়েছে। আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি তখন। উপন্যাস চুলোয় যাক, ছবির যেন নিন্দে না হয়। লাভ-লোকসানের প্রশ্ন নেই আমার, কিন্তু সুনাম-দুর্নামের প্রশ্ন আছে।

সন্ধ্যে হলো।

মিস্টার সরকার ঘরে এলেন।

বললেন—হলো?

সেই হাসি-হাসি গম্ভীর মুখ। আঙুলে সিগারেট।

কার্তিকবাবু বললেন—হ্যাঁ—এখন শুনবেন?

—বলুন, শুনি!

বড় হলঘরটায় যাওয়া হলো। যে-যার জায়গায় বসলাম। মিস্টার সরকার আর একটা নতুন সিগারেট ধরালেন। আমার হাসি পেতে লাগলো। এ-ও এক পরীক্ষা। ছোটবেলা থেকে সারাজীবন কত না পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার নামেই আমার জ্বর আসে বরাবর। কিন্তু পরীক্ষার হাত থেকে আর জীবনে মুক্তি পেলাম না। ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো সেদিন আমি আর আমার এক বন্ধু দু'জনে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে এসেছিলাম। বলে-ছিলাম—এবার পরীক্ষা থেকে চির-জীবনের মতো মুক্তি পেলাম।

কিন্তু তার পরেও যে কত পরীক্ষা দিচ্ছি! এখনও এক-একখানা মোটা মোটা বই লিখি, শেষ করে ভাবি এই-ই শেষ। আর পরীক্ষা নয়। কিন্তু আবার পরীক্ষা দিতে হয়। এখন মনে হয় যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আর পরীক্ষার হাত থেকে বোধহয় মুক্তি পাবো না।

কার্তিকবাবু একটার পর একটা পাতা পড়ে চলেছেন। আর মিস্টার সরকার একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশেষ করছেন।

আমি শ্রোতাও বটে, লেখকও বটে, আবার দর্শকও বটে।

একসময়ে পড়া শেষ হলো। পড়া শেষ করে কার্তিকবাবু উৎসুক চোখে মিস্টার সরকারের দিকে চাইলেন।

মিস্টার সরকার নতুন একটা সিগারেট ধরালেন।

তারপর বললেন—এ যে মেজবাবুর গল্প হয়েছে···

শুধু ওইটুকু। আর কিছু নয়। কথাটা বলে সিগারেটে একটা টান দিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়লেন।

কার্তিকবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। আমি বুঝলাম আমি ফেল করেছি—

মনে আছে সেদিন সরকারসাহেবের কথা শুনে আমার মনে প্রথমে কষ্ট হলেও পরে বুঝেছিলাম তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি যদি ও-কথা না বলতেন তাহলে হয়ত চিত্রনাট্য নিয়ে আর আমরা মাথা ঘামাতাম না। ও নিয়ে আমরা আর চিন্তাও করতাম না।

কিন্তু একটা জিনিস ভেবে আমার খুব আনন্দ হলো এই ভেবে যে সরকার সাহেব খুব মন দিয়ে আমার বইটা পড়েছেন। শুধু পড়েননি, বইটার মর্মকথা-বস্তুরও সন্ধান রেখেছেন।

সিনেমার ব্যবসা অনেকেই করেন। কারণ বহু লোকের ওটি একটি উপজীবিকাও বটে। কয়েকজন নামকরা ফিল্ম-স্টার আর একখানা নামকরা উপন্যাস পেলেই হলো। তাই ভাঙিয়েই পয়সা উপার্জন করা যায়। এবং যাঁদের কাছে পয়সাটাই সব, তাঁরা তা করেও থাকেন। এবং হামেশাই করে থাকেন।

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সামান্য পরিচয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে নিউ থিয়েটার্সের মিস্টার বি. এন. সরকার তার বিরল ব্যতিক্রম।

আমি সিনেমা সম্বন্ধে আনাড়িই বলতে গেলে। উনিশ শো চুয়ান্ন সালের আমির সঙ্গে আজকের আমির অনেক তফাত। তখন আমার বয়েস কতই বা। সেই বয়েসে সিনেমার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানবার সুযোগ আমার এতটুকু ছিল না বলাই ভালো। আমার অভিভাবকদের অনিচ্ছার দরুন সিনেমা দেখার নেশাও আমার হয়নি। তা ছাড়া, আমি যে-যুগে জন্মেছি সে-যুগে সিনেমা দেখাটা এখনকার মতো অপরিহার্য হয়নি। তাই তখনকার দিনে যাঁদের শিল্পকলা সম্বন্ধে একটু উৎসাহ ছিল, তাঁরা হয় গান-বাজনার চর্চা করতেন, আর নয়তো সাহিত্য করতেন।

তখনকার দিনে সাহিত্য করা ছিল সত্যিই পুরোপুরি শখের ব্যাপার। একেবারে নির্ভেজাল শখ!

কিন্তু সংসারে এমন এক-একজন মানুষ থাকে যারা সেই নির্ভেজাল শখের জন্যেই জীবন উৎসর্গ করে। তারা হিসেব করে না সাহিত্য করে তাদের বাস্তব-পৃথিবীর সুখ-ঐশ্বর্য কতখানি এল, আর কতখানি বা এল না।

এমন অনেক লোককে আমি এখনও জানি যারা পনেরো-ষোলটি দীর্ঘ উপন্যাস লিখে ফেলেছে। আরো উপন্যাস একটার পর একটা লিখে চলেছে। সে-বই কোনও পত্রিকায় ছাপা হয় না, ছাপা হবেও না কোনওদিন। কিন্তু তারা তাতে নিরুৎসাহ হয় না। একটু অবসর পেলেই তারা খাতা-কলম নিয়ে রাত কাবার করে দেয়।

এমন একজন অবজ্ঞাত লেখকের সন্ধান পেয়েছি।

বহুদিন আগে দেশে গিয়েছিলাম। দেশে মানে এক অজগর গ্রাম। সে এমন এক জনপদ যেখানে আধুনিক সভ্যতার কোনও উপকরণই পৌঁছোয়নি। পাকিস্তানের বর্ডার। আর ইণ্ডিয়ার শেষ। ইলেট্রিক-আলো নেই, ড্রেন নেই, কলের জল নেই। টিউব-ওয়েল আছে, কিন্তু সে মাত্র কয়েকটা। খবরের কাগজের মুখ কেউ দেখতে পায় না সেখানে। যদি কেউ খবরের কাগজ নিয়ে যান সেখানে, তাহলে সেই বাসি খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। পড়বার জন্যে টানাটানি নয়, মোড়ক হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে টানাটানি। ডাক্তার, ওষুধ, পোস্টাপিস, কিছুই সেখানে নেই। হাট-বারে সপ্তাহে একদিন পোস্ট্‌ম্যান আসে। তাও যদি গ্রামের কোনও লোকের চিঠি-পত্র থাকে। না থাকলে আসে না। চিঠিও বিলি করে, আবার প্রয়োজন থাকলে স্ট্যাম্প-খাম-পোস্ট্‌কার্ডও বিক্রি করে।

এ হেন গ্রামের এক কামারশালায় এক সাহিত্যিকের সন্ধান পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বৃদ্ধ লোক। বলতে গেলে ষাট কি সত্তর বছর বয়েস উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তার। তবু এখনও দুর্বল হাতে বাটালি-করাত নিয়ে গরুর গাড়ির চাকা তৈরি করে। আমার পরিচয় পেয়ে বড় খুশী হলো ভদ্রলোক। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একবার আমাকে একলা পেয়ে বললে—জানেন বিমলবাবু, আমিও লিখি—

বললাম—কী লেখেন?

ভদ্রলোক বললে—উপন্যাস।

আমি ঠিক যেন ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। সত্যিই বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। গাঁয়ের পথের ধারে ছোট কামারশালা। ভদ্রলোকের হাতে আধ-সমাপ্ত গরুর গাড়ির চাকা। আর একহাতে ধারালো বাটালি। বেলা বারোটা বেজে গেছে আমার হাত-ঘড়িতে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—উপন্যাস?

ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে বললে—হ্যাঁ, উপন্যাস।

বলেই ভদ্রলোকের যেন কেমন অহেতুক লজ্জা হলো। বললে—আপনাদের মতন উপন্যাস অবিশ্যি নয়, এমনি সাধারণ উপন্যাস।

বললাম—সাধারণ উপন্যাস মানে?

ভদ্রলোক বললে—মানে আপনার 'সাহেব বিবি গোলামে'র মতো উপন্যাস নয়। এমনি সামাজিক উপন্যাস আর কি—!

বললাম—সামাজিক উপন্যাস মানে কী?

ভদ্রলোক বললে—এই মানিক ভট্টাচার্যের উপন্যাস পড়েছেন আপনি? 'হীরার হার', 'চন্দ্র-সূর্য', 'যৌবনের লহরী'! ওই ধরনের উপন্যাস সব!

বললাম—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনও উপন্যাস পড়েছেন আপনি?

ভদ্রলোক বললে—আমি তো বললুম আপনাকে, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস কিছুই পড়িনি! অত বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নেই।

বললাম—শরৎচন্দ্রের নামটা তো অন্তত শুনেছেন?

ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললে—তিনি কী-কী বই লিখেছেন একবার বলুন তো! একটা দু'টো বইএর নাম করুন, তাহলে হয়ত বলতে পারবো তার বই পড়েছি কি না—

বুঝলাম আমি অপাত্রে আমার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছি।

ভদ্রলোক বললে—সব বুঝতেই তো পারছেন। আমরা গাঁয়ে থাকি, আপনাদের মতন লোকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও পাইনে। কী রকম করে বই লিখতে হয় তাও কারো কাছে হাতে-কলমে শেখবার সুযোগ পাইনি। অনাদি মৌলিকমশাইএর পাঠশালায় কিছুদিন পড়েছিলুম, এইটুকু মাত্তোর বিদ্যে আমার। তাতে আর ও-সব বড় বড় লেখকের লেখা বই পড়বো কী করে, আর বই পাবোই বা কোথায়? এ-গাঁয়ে তো কোনও লাইবেরি নেই—বললাম—তাহলে মানিক ভট্টাচার্যের 'হীরার হার', 'যৌবনের লহরী', ও-সব বই কোথায় পেলেন?

ভদ্রলোক বললে—আমাদের দেশে-গাঁয়ে ছেলে-ছোকরাদের বিয়েতে বই-টই সব উপহার পায় তো, তাই-ই চেয়ে-চিন্তে নিয়ে এসে মাঝে মাঝে পড়ি—আর তাই পড়ে পড়েই শিখি—

ইতিমধ্যে একজন চাষীশ্রেণীর খদ্দের এসে গেল দোকানে।

বললে—কাকা, আমার চাকার কদ্দূর ?

ভদ্রলোক সেদিকে একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাইলে। বললে—তোমার চাকা হয়ে গেচে, পরে দেব—

চাষীটির বোধহয় জরুরী দরকার ছিল চাকাটার। চাকার অভাবে তার কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে তাও সবিনয়ে জানালে।

কিন্তু ভদ্রলোকের সেদিকে কান নেই।

বললে—তুমি এখন যাও তো মদন। বরং কাল সকালে একবার এসো, এখন আমি কাজে ব্যস্ত। দেখছো একজন ভদ্দরলোকের সঙ্গে কথা বলছি। একে চেনো তো ?

চাষীটি বললে—আজ্ঞে, ইনি তো মিত্তিরবাড়ির ছোটবাবু—ওঁরা তো আর দেশে-গাঁয়ে আসেন না—

ভদ্রলোক রেগে গেলো মদনের কথা শুনে। বললে—দূর, তুমি ছাই জানো, বলি 'সাহেব বিবি গোলাম' বায়েস্কোপ দেখেছো ?

মদন কিছুই বুঝতে পারলে না।

বললে—বায়েস্কোপ ? বায়েস্কোপ কেমন করে দেখবো ?

ভদ্রলোক বললে—তুমি এখন এসো মদন, আমার কাজ-কর্ম আছে এঁর সঙ্গে, তুমি এখন এসো ভাই—

মদন আর কী করে, অগত্যা উঠে গেল।

মদন চলে যাওয়াতে যেন বেঁচে গেল ভদ্রলোক। হাতের কাঠটা পাশে রেখে দিয়ে বললে—আপনার সময় আছে হাতে এখন ?

বললাম—কেন, কীসের জন্যে ?

ভদ্রলোক বললে—তাহলে আপনাকে একটু দেখাতাম আমার উপন্যাসটা ?

আমার যেন কেমন শ্রদ্ধা হলো অহেতুক। এই অজ গ্রামে এত দারিদ্র্য আর ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়েও তো উপন্যাস লিখেছে ভদ্রলোক। আমি অবাক-বিস্ময়ে ভদ্রলোকের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগলাম। এও কি শিল্পী ? গরুর গাড়ির চাকা তৈরি করছে, আর উপন্যাস লিখছে ! কোথা থেকে এত

উৎসাহ আসে এর। কে একে এত রসের যোগান দেয়? কে সেই অদৃশ্য মহা উপন্যাস-লেখক? কোথায় থাকেন তিনি? যিনি আমাকে লেখক বানিয়েছেন, তিনি কি একেও লেখক করেছেন? এতে আর আমাতে তফাত কোথায়?

ভদ্রলোক হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো।

বললে—ক্ষিরি—

ডাক শুনেই ভেতর থেকে একটা মেয়ে ছেঁড়া-ময়লা ফ্রক্ পরে বাইরে এল।

ভদ্রলোক বললে—মা, আমার সেই খাতাগুলো নিয়ে এসো তো মা—

মেয়ে দৌড়ে চলে গেল ভেতরে। তারপরেই একগোছা খাতা নিয়ে এসে সামনে রাখলে। তা প্রায় পঁচিশ-তিরিশটা খাতা হবে মোট।

আমি বললাম—আপনি এতগুলো উপন্যাস লিখেছেন?

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ—

বড় কৃতার্থের হাসি হাসলো ভদ্রলোক।

বললে—পড়বো একটু?

ভদ্রলোকের সামনে বসে বসে আমি তখন সেই সব দিনের কথা ভাবছিলাম। যখন সরকারসাহেবের বাড়িতে বসে আবার নতুন করে 'সাহেব-বিবি-গোলাম'এর চিত্রনাট্য লিখছিলাম।

কার্তিকবাবু একদিন বলেছিলেন—এবার কেমন হলো?

আমি বলেছিলাম—এবারও ভালো লাগছে না কার্তিকবাবু।

কার্তিকবাবু বলেছিলেন—কেন?

আমি বলেছিলাম—মনে হচ্ছে ঠিক যেন সব কথা বলা হলো না। বাবুদের পায়রা ওড়ানোর সিন্‌টা দিলে ভালো হতো—

কার্তিকবাবু বললেন—এ আপনাদের উপন্যাস নয় মশাই; এ হলো সিনেমা। এখানে দর্শকদের অত ধৈর্য নেই। আপনাদের উপন্যাসে যত ইচ্ছে লিখুন না, খোলা মাঠ পড়ে আছে। কেউ বারণ করবে না। কিন্তু সিনেমাতে তো সে সব সুবিধে নেই। উপন্যাসে আপনারা দিস্তে-দিস্তে কাগজ কিনবেন আর পাতা ভর্তি করে যাবেন—

ভদ্রলোকের সামনে বসে আমার সেই সব কথাগুলো মনে পড়ে যেতে লাগলো।

ভদ্রলোক লিখেছে প্রচুর। দিস্তে দিস্তে কাগজ কিনেছে আর বসে বসে লিখেছে। কে পড়বে আর কে ছাপাবে তার হিসেব রাখেনি। এক একটা বই লিখেছে আর জমিয়ে রেখেছে আলমারিতে।

ভদ্রলোকের কথায় আমার ধ্যান ভাঙলো।

জিজ্ঞেস করলে—কেমন লাগছে বলুন? কিছু হয়েছে?

যেদিন চিত্রনাট্য লেখা শেষ হলো, সেদিন মনে আছে আমিও ওই একই প্রশ্ন করেছিলাম সরকারসাহেবকে—কেমন লাগছে বলুন? এবার হয়েছে?

একেই বলে পরীক্ষা দেওয়া। পরীক্ষা আমরা প্রতি দিনই দিই। সারা জীবনভোরই আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়। শুধু জীবদ্দশার কালই নয়, আমার মতে আগামীকালের জন্যেও আমাদের পরীক্ষা অনিবার্য। 'আজি হতে শত-বর্ষ পরে'ও পরীক্ষায় পাস-ফেলের দুর্ভাবনায় দিন কাটাতে হয় আমাদের। শেক-স্পীয়র কালিদাসকে এতদিন পরেও এ-যুগের পাঠকদের কাছে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কারণ দেখেছি এখনও সারা পৃথিবীর গবেষকবৃন্দ তাঁদের নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করছেন।

তবে আমার বেলায় এ-পরীক্ষা ততটা সঙ্কটজনক নয়। কারণ সিনেমা-শিল্পটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। ও বিদ্যেটিতে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের কাছে পরীক্ষা দিতে আমার লজ্জা বা সঙ্কোচ হবার কোনও কারণই নেই। গল্প লিখতে পারলেই যে তাকে আবার অঙ্ক কষতেও পারতে হবে এমন কোনও কড়ার নেই কারো কাছে।

মিস্টার সরকার বার দুই সিগারেট টানলেন, তারপর একটা ঝাপসা উত্তর দিলেন। বললেন—না, এবার মন্দ হয়নি—

কার্তিকবাবু পাশেই বসে ছিলেন। তিনি খুশী হলেন। এখন থেকে তাঁর কাজ আরম্ভ হওয়ার পালা। আসলে প্রথম পরীক্ষায় পাস করলেন। এটা হলো হিট্। এর পরে আছে সেমি-ফাইন্যাল। সেমি-ফাইন্যাল মানে সেন্সর বোর্ড। তারপরে আসল ফাইন্যাল। মানে দর্শকদের রায়।

আমার কিন্তু ও-সব বালাই নেই। নেহাত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে বইটা আমার লেখা বলে, এবং পছন্দ অনুযায়ী চিত্রনাট্য হয়নি বলে আমাকে কলম

ধরতে হয়েছিল। এর জন্যে যদিও আমি একটি পয়সাও গ্রহণ করিনি, কিন্তু স্থনাম-হানির হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই আমার কলম ধরা।

সেদিন বাড়ি আসবার পথে কার্তিকবাবুকে বলেছিলাম—দেখবেন কার্তিক-বাবু, চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমার নাম যেন দিয়ে দেবেন না ছবিতে—

গ্রামের সেই কর্মকার ভদ্রলোক যখন আমাকে তার উপন্যাস পড়িয়ে শোনাচ্ছিল আমার কান তখন সেদিকে ছিল না। আমি তখন সেই সব দিনের কথাই ভাবছি, সেই চিত্রনাট্য লেখবার সময়কার ঘটনার কথাগুলো।

—আর এককাপ চা দেব আপনাকে ?

আমি যেন আবার সশরীরে মর্ত্যে ফিরে এলাম।

বললাম—কতদিন থেকে এই সব লেখার অভ্যেস আপনার ?

ভদ্রলোক বললে—কাউকে বলিনি এ-সব কথা, আপনাকেই বলি। আপনি সমঝদার লোক, আপনি বুঝবেন। এ অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকেই। সেই যখন আমার ষোল সতেরো বছর বয়েস—

বলেই আবার ভেতর দিকে চেয়ে ডাকলে—ক্ষিরি—

বুঝলাম খুশীতে আর এককাপ চা আমাকে খাওয়াবেই।

বোধহয় আগে আমার মতো শ্রোতা আর কাউকে পায়নি।

বললাম—আগে কাউকে শুনিয়েছেন আপনি ?

ভদ্রলোক বললে—কাকে আর শোনাবো বলুন, এখানে তো কোনও ভদ্দর-লোক নেই আমাদের গাঁয়ে। তবে একজন শুনে খুব তারিফ করেছিল—

—কে ?

ভদ্রলোক বললে—আমার বেয়াই। আমার মেয়ের শ্বশুর। তিনি বাঙ্গা-লোরে বড় গেজেটেড্ অফিসার, প্রায় হাজার টাকা মাইনে পান। তিনি শুনে বলেছিলেন খুব ভালো—

বললাম—কখনও বই ছাপাবার ইচ্ছে হয়নি আপনার ?

ভদ্রলোক বললে—না, আমার লিখতেই ভালো লাগে।

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ভদ্রলোকের দিকে সামান্য শিক্ষিত গ্রামের কর্ম-কার মানুষ। অল্পবিত্ত খেটেখাওয়া মানুষ। কিন্তু তার কথা শুনে তাকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হলো।

আমি প্রণামই করলাম ভদ্রলোককে। বললাম—আপনাকে আমি প্রণাম করছি কর্মকারমশাই।

ভদ্রলোক বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ আমার হাতদুটো চেপে ধরে নিজেই আমাকে বার বার প্রণাম করতে লাগলো।

বলতে লাগলো—ছি ছি, আমার মহাপাপ হলো। আপনি শহরের শিক্ষিত লোক, আপনাদের কাছে আমি কতটুকু, আমি কিছুই না—আপনি কেন আমায় প্রণাম করলেন—

বললাম—না কর্মকারমশাই, আপনি মহৎ। আপনি আমাদের এ-যুগের শহরের লোকদের হারিয়ে দিয়েছেন। আপনি নাম চান না, খ্যাতি চান না, অর্থও চান না, শুধু নিজের কাজের মধ্যে থেকেই আনন্দের উপকরণ খুঁজে পান, এটা কি কম কথা! আপনার তুলনায় আমরা কিছুই না। আমরা প্রতিষ্ঠা চাই, খ্যাতি চাই, অর্থ চাই, সারা পৃথিবী করায়ত্ত করতে চাই—

আর একটা কথা মনে পড়লো। সে ১৯৬০ সাল। আজ থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে। বোম্বাই থেকে যাচ্ছি লোনাভ্‌লা। রাত দশটা বেজে গেছে তখন। একটা গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছি আমি আর শচীন দেববর্মন। ১৯৩২-৩৩ সাল থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। তখন শচীন দেববর্মনের এত খ্যাতি প্রতিষ্ঠা কিছুই হয়নি। সবে তখন তাঁর এক-একটা গানের রেকর্ড বাজারে বেরোচ্ছে আর হুড়-হুড় করে বিক্রি হচ্ছে। বহুকাল পরে আবার যখন বোম্বাইতে দেখা তখন স্বভাবতই পুরোন বন্ধুত্ব নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া গেল।

দলে অনেকগুলো গাড়ি ছিল। শচীনদা বললে—বিমল, তুমি আমার গাড়িতে এসো, একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাই—

গল্প মানে সেই সব পুরোন দিনের স্মৃতিমন্থন। তখন বিখ্যাত গায়ক কুন্দন লাল সায়গল বাঙলাদেশে হঠাৎ উদয় হয়ে শহর মাত্‌ করছে। তার গানে বাজার গম্‌গম্ করছে। সায়গল, শচীন দেববর্মন, পঙ্কজ মল্লিক, অনুপম ঘটক তখন বাজারের সেরা গাইয়ে। আমি তখনও সামান্য মানুষ, এখনও তাই। গান গাই না, তবে গান লিখি। কলেজে বি-এ পড়ি আর ছুটির পরই চলে আসি ছ' নম্বর অক্রূর দত্ত লেনের হিন্দুস্থান স্টুডিওতে। সেইখানেই কেটে যায় রাত দশটা এগারোটা, বারোটা একটা পর্যন্ত। তখন যুদ্ধ-পূর্ব কলকাতা। রাত তিনটে-চারটে পর্যন্ত বাস চলে। কখনও কখনও কার্জন পার্কে ঘাসের ওপর বসে আড্ডা চলে।

তা শচীনদাকে পেয়ে সেই সব দিনের কথা উঠলো। অন্য গাড়িতে ছিল

সিনেমার ডাইরেক্টার, স্টোরি-রাইটার, ডায়ালগ্-রাইটার, প্রেস-রিপোর্টাররা। সবাই যার-যার গাড়িতে।

যখন লোনাভ্লা দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ শচীনদা বললে—ওই বাঁদিকে চেয়ে দেখ বিমল, যে পাহাড়টা দেখছো, ওখানে একটা জায়গা আছে তার নাম 'কারলা-কেভ্স'—

'কারলা-কেভ্স' কথাটা আমার কাছে তখন নতুন।

—তুমি কখনও কারলা-কেভ্স্ দেখেছ?

বললাম—না—

—ওই পাহাড়ের গুহার ভেতরে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত শিল্প-কাজ আছে। বিদেশী টুরিস্টরা প্রায় রোজই এই গুহার শিল্প-কর্ম দেখতে আসে।

গাড়ি চলছে। আর আমি শচীনদার গল্প শুনছি।

হঠাৎ শচীনদা প্রসঙ্গ বদলে বললে—আর দেখ, এই তো তোমার 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবি করছে গুরু। এই ছবির জন্যে গুরু কয়েক লাখ টাকা খরচ করবে। এ-ছবির যে নায়ক হবে তার নাম পোস্টারে বড় বড় ছাপাতে হবে। না ছাপালে সে শুটিং বয়কট্ করবে। তারপরে ধরো মীনাকুমারী হবে এ ছবির নায়িকা। তার নাম যদি সকলের মাথায় না ছাপা হয় তো সে-ও শুটিং করবে না। তারপর আমি। আমি যদি এ-ছবির মিউজিক-ডিরেক্টার হই তো আমিও চাইবো আমার নামটাও পোস্টারে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হোক। তারপর ছোট-ছোট অ্যাকটর, অ্যাকট্রেস। তারাও তাদের নাম পোস্টারে দেখতে চাইবে। টাকা তো চাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে নামও চাইবে। আর বাকী রইলে তুমি। তোমার গল্প নিয়েই ছবি। কিন্তু গল্প নিয়ে কে মাথা ঘামায়? তোমার নাম গুরু পোস্টারে দিতেও পারে, আর না-দিলেও কিছু বলবার নেই! লেখকের নাম নিয়ে পৃথিবীতে কেউই মাথা ঘামায় না। কিন্তু এরা? এই সব গুহার শিল্পীরা?

গাড়ি হু-হু বেগে চলেছে। শচীনদা কথা বলতে বলতে যেন বিবশ হয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—এখানে ঢুকে একদিন গুহা-চিত্রগুলো দেখো তুমি। দেখবে কী অপূর্ব সব ছবি। কতদিন ধরে কত নিষ্ঠায় কত আন্তরিকতার সঙ্গে সে-ছবি তাঁরা এঁকে গেছেন! অথচ তাঁরা কে, কী তাঁদের পরিচয়, কী তাঁদের নাম, তার কোনও চিহ্ন তাঁরা কোথাও রেখে যাননি। গ্রেট্, গ্রেট্,—তাঁরা সব মহাপুরুষ! আর আমরা?

মনে আছে শচীনদার সেইদিনকার কথা শুনে আমি অনেকক্ষণ কিছু কথা বলতে পারিনি। আমার মুখে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! সত্যিই তো, কীসের জন্যে আমরা লিখি? শুধু কি টাকা? শুধু কি নাম? খ্যাতি? প্রতিষ্ঠা? মনের এককোণেও কি কখনও মানুষের কল্যাণ-কামনার এককণা আকাঙ্ক্ষাও লুকিয়ে থাকে না? আমরা কি নিছক আত্মপ্রকাশের তাগিদেই লিখি? আর কিছু নয়? শুধুই অমর হবার বাসনা?

তাহলে এত জিনিস থাকতে লিখি কেন?

এ-প্রশ্ন আমি নিজেকে অনেকবার করেছি। শুধু আর পাঁচজনের মত খেয়ে পরে ফুর্তি করে তাস খেলে জীবন কাটিয়ে দিলেই তো হতো! যেমন আমার পূর্ব-পুরুষরা করেছে!

মনে আছে একবার রবীন্দ্রনাথের একটা কথায় খুব শান্তি আর সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন মানুষ আর পশুতে তফাত কোথায়? এই যে আমরা পৃথিবীর অনেক কিছু বিনামূল্যে ভোগ করি, এ ভোগ মানুষও করে, পশুও করে। এই চাঁদের আলো, এই বাতাস, এই রোদ, এই বৃষ্টি। এর জন্যে কাউকেই কোনও মূল্য বা ট্যাক্স দিতে হয় না। পশুরা তা নির্বিবাদেই ভোগ করে। তাতে তাদের কোনও দায় নেই। কিন্তু দায় আছে মানুষের। মানুষকে সেই ঋণ শোধ করতে হয়। শোধ করতে হয় নানাভাবে। কেউ ঋণ শোধ করে শিল্প সৃষ্টি করে, কেউ বা গান গেয়ে, কেউ বা ঈশ্বরের নাম করে, আবার কেউ বা সমাজসেবা করে। আসলে মানুষই একমাত্র জীব যার ঋণ শোধ করবার দায় থাকে, পশুর সে দায় নেই।

কিন্তু ঋণ শোধ করতে গিয়ে নিজের নামের প্রচার কেন চাইবো?

আসলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, তারা সবাই আত্মকেন্দ্রিক। যে প্রাপ্য দেবতার তাতেও আমরা স্বার্থের ভাগ বসাতে চাই। আমরা পুরুত হয়ে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করি। আমরা নিজেদেরও প্রবঞ্চিত করি, প্রবঞ্চনা করি আমাদের দেবতাকেও। তাই-ই আমরা কড়ায় গণ্ডায় নিজের পাওনা মিটিয়ে নিতে পারলেই খুশী। যেটা আমার নয়, সেটা পাবার জন্যে আমরা দৌড়ঝাঁপ করে মরি।

এই ব্যাপারে আর একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলি।

বোম্বাইএর এক সুবিখ্যাত অবাঙালী ফিল্ম-স্টার এবার কলকাতায় এসেছিল। কলকাতায় আসা ওদের একটা ফ্যাশান। এখানে এসে কিছু টাকা উড়িয়ে কিছু আনন্দ পান ওঁরা।

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গেলাম সৌজন্য-সাক্ষাৎ করতে তার হোটেলে। অনেকদিন পরে দেখা, সবাই খুশী। ফিলম্-স্টার বছরখানেক হলো 'পদ্মশ্রী' হয়েছে। আমার অবাঙালী বন্ধু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ইয়ার, 'পদ্মশ্রী' হতে কত খরচ পড়লো তোমার ?

ফিলম্-স্টার বন্ধুটি অকপটে বললে—তিন লাখ—

আবার অবাঙালী বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—ঝুট্ বাত, পদ্মশ্রী তিন লাখে হয় না। আজকাল রেট বেড়ে গেছে। পাঁচ লাখ দর উঠেছে—

শেষকালে তর্ক শুরু হয়ে গেল। ফিলম্-স্টারও স্বীকার করবে না তিন লাখের বেশি লেগেছে, আমার অবাঙালী বন্ধুও স্বীকার করবে না পাঁচ লাখের কমে 'পদ্মশ্রী' কেউ পেতে পারে।

আমি নিরীহ দর্শক। আমার কাছে পাঁচ লাখও যা, তিন লাখও তাই। কারণ আমার কাছে পদ্মশ্রীরই কোনও দাম নেই। আর শুধু 'পদ্মশ্রী' কেন, পদ্মভূষণ, ভারত-রত্নেরও কোন দাম নেই। মানুষের কল্যাণে যা না লাগে তারই কোনও দাম নেই। আর তা ছাড়া আমার কাছে নামেরই কোনও দাম নেই। আমি দাম দিই একমাত্র কাজকে। অর্থাৎ কর্মকে। আমার কাছে কর্মই মানুষ, মানুষই কর্ম। কর্মের দ্বারাই আমি মানুষকে বিচার করি, পদবী বা উপাধি দিয়ে নয়।

তাই যখন সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হলাম তখন একটু অবাক লাগলো দেখে। শুধু সিনেমার সম্বন্ধে বললে ভুল হবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন এলাম, তখনও তাই। সব জায়গাতেই এই একই দাবী। নাম চাই, টাকা চাই, উপাধি চাই। আরো অনেক কিছুই চাই। কিন্তু যাতে মানুষের মঙ্গল হয় তা চাই না, যাতে মনকে মালিন্য থেকে মুক্ত করতে পারি, তা চাই না।

আমার আর এক বাল্যবন্ধুর কথা শুনে আমি একদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম বহু যুগ পরে একদিন আমার বাড়িতে তার আবির্ভাব।

এসেই বললে—কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্—তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ভাই—

আমি তো অবাক। বললাম—হঠাৎ ? কেন ? কী করলুম আমি ?

বন্ধু বললে—তোমার নাম হয়েছে—

আমি আরো অবাক। বাল্যবন্ধুর কাছে আবার নাম-অনামের প্রশ্ন কী !

বললাম—আমার বই তুমি পড়েছো নাকি ?

বন্ধু বললে—না, তোমার বই আমি পড়তে যাবো কোন্ দুঃখে। বই ভালো

লিখেছ কি খারাপ লিখেছ তা আমার দেখার দরকার নেই, তোমার নাম হয়েছে এইতেই তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—

শচীনদার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমার সেই সব কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সেই 'কার্‌লা-কেভ্‌স' আর তার সেই মহান শিল্পীরা। তারা অর্থ চায়নি, 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' কিছুই চায়নি। আজকালকার পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কাম্য বস্তু নামও চায়নি। শুধু বছরের পর বছর ধরে নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে শিল্প-সৃষ্টি করে গেছে।

গাড়ি তখনও চলছিল। আমি সেই চলন্ত গাড়িতে বসেই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে তাঁদের উদ্দেশে আমার নিঃশব্দ প্রণাম পেশ করলাম। জানি না সেদিন আমার মত বিংশ-শতাব্দীর কামনা-বাসনা জড়িত নগণ্য মানুষের প্রণাম তারা গ্রহণ করলেন কি না।

—কেমন লাগলো?

হঠাৎ ধ্যান ভাঙলো যেন। দেখি কর্মকারমশাই আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম—অপূর্ব!

কর্মকারমশাই বললে—কী যে বলেন আপনি। আমার এক বেয়াই ছাড়া আর কেউই ভালো বলেনি। অবশ্য আর কাউকে পড়াইওনি। কাকেই বা আর পড়াবো বলুন! এ-গাঁয়ে তো আর তেমন লোক নেই কেউ—

বললাম—না, বিশ্বাস করুন আপনি মহৎ—

কর্মকারমশাই বললে—সত্যিই বলছেন?

বললাম—বিশ্বাস করুন, সত্যি—

কর্মকারমশাই বললে—লোকের তাহলে ভালো লাগবে?

বললাম—দেখুন, লোকের ভালো লাগবে কিনা তা আমি ভাবছি না। আমি আপনার উপন্যাস নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছি না। কিন্তু এই যে আপনি নিষ্কাম নির্লোভ নির্লিপ্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, এ আজকের পৃথিবীতে এক বিস্ময়কর ঘটনা। মানুষ হিসেবে আপনি মহৎ। আমি নিজে যা পারিনি, আপনি তা পেরেছেন। আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন কর্মকারমশাই—

মিস্টার সরকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কার্তিকবাবু বললেন—মিস্টার সরকারের স্ক্রিপ্ট্‌ ভালো লেগেছে।

বললাম—কীসে বুঝলেন?

কার্তিকবাবু বললেন—ওই যে কিছু না বলে শুধু সিগারেট খেতে লাগলেন। ওইটেই ওঁর ভালো লাগবার লক্ষণ!

ট্রাম থেকে নেমে কার্তিকবাবু তাঁর বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আমি ট্রামে বসে রইলাম। ভাবলাম এ কি হলো! আমিই কি নিজের মৃত্যু-বাণ তৈরি করলাম। আমি কি নিজের সৃষ্টি নিয়ে ব্যবসা শুরু করলাম। চোদ্দ বছর ধরে যে কাহিনীকে নিজের মনের গোপনে অতি সন্তর্পণে লালন-পালন করেছিলাম, তাকে একবার বই করে ছাপিয়ে ব্যবসা করেছি, অর্থ উপার্জন করেছি। এবার সিনেমার পর্দায় নামিয়ে কি আরো বড় ব্যবসাদারি করলাম? কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই। তখন নিজের জালেই আমি জড়িয়ে গিয়েছি। আর মুক্তি নেই আমার।

আমার নিজের মধ্যেই কোথায় বোধহয় একটা গোলমাল আছে। নইলে যে-ক্ষেত্রে সিনেমা হওয়ার দরুন আমার আনন্দ হওয়ার কথা, সে-ক্ষেত্রে এই আতঙ্ক কেন হলো? সবাই তো চায় অর্থ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি। আর আমিও তো অন্য সকলের মত তাই-ই চেয়ে এসেছি বরাবর। তবে যখন তা হাতের মুঠোয় এল তখন তা গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করছি কেন?

এই 'কেন'র উত্তর বহুবার নিজের মনের মধ্যে খুঁজেছি।

ছোটবেলা থেকে বার বার মনের গোপনে একটা ইচ্ছেই সজাগ হয়ে আমাকে পীড়ন করেছে। সে ইচ্ছেটা হলো এই যে আমার কথা কেউ ভাবুক, আমাকে কেউ চিনুক, আমার মনকে কেউ জানুক। নিজেকে জানানোর ইচ্ছে কি অপরাধ?

আসলে মনের কোণে সেই ইচ্ছেটা ছোটবেলা থেকে লালন করে এসেছি বলেই একদিন সব ছেড়ে সকলের চোখের আড়ালে লিখতে শুরু করেছিলাম। লিখতে শুরু করেছিলাম মানে নিজের কথাগুলোকে নিজের ভাবনা আর কল্পনাগুলোকে নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই দেখতে চাওয়াটার বাসনা একদিন ক্রমে-ক্রমে এতই প্রবল হয়ে উঠলো যে ইচ্ছে হলো বাইরের লোকদেরও তা দেখাই। আমার ভাবনাগুলোকে শুধু আমিই দেখবো না, সবাই দেখবে। সবাই দেখলে সবার ভালো লাগলেই তবে তা সার্থক হবে।

আমাদের বাঙলাদেশে বিশেষ করে ছোটবেলা থেকে সবাই-ই লেখক হতে চায়। কেউ কবিতা, কেউ গল্প, কেউ প্রবন্ধ—এমনি সব কিছু। সে-লেখা

একটু বয়েস হলেই থেমে যায়। তখন কেউ হয় ডাক্তার, কেউ কেরানী, কেউ উকিল আবার কেউ বা ব্যবসাদার। আর বড়জোর কেউ-কেউ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-মুন্‌সেফ। কিংবা মাস্টারি।

এই-ই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের দেশের ছেলেদের আকাঙ্ক্ষা। লেখা নিয়ে থাকে না। লেখাটা ছাত্রবয়সেই ছেড়ে দিয়ে জীবন-যুদ্ধে নামে।

কিন্তু আমার মত কিছু বখাটে ছেলে থাকে যারা কারোর কথাই শোনে না, কাব্যের উপদেশেই কান দেয় না। তারা যা করবে ভাবে তা করে। কোনও বাধাই তাদের কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারে না।

তবে এ-বিষয়ে একটা কথা আজকের তরুণ লেখকদের মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। জীবন আর সাহিত্য আলাদা জিনিস নয়। যে-লেখকের কাছে ও দু'টো জিনিস আলাদা তারা আসলে লেখক পদবাচ্য নয়। আমি লিখবো সৎ প্রসঙ্গ, আর নিজের জীবনে অসৎ প্রসঙ্গে সময় কাটাবো তা হয় না। লেখা মানেই আচরণ। যেমন কথা লিখবো, জীবনেও তেমনি আচরণ করবো। তবেই বলবো তাকে লেখক। এই সব লেখকদের লক্ষ্য করেই জন্ স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন—"দি রাইটিংস বাই হুইচ্ এ ম্যান ক্যান লিভ আর নট্ দোজ খ্যাট দেমসেলভস্ লিভ।"

যদি কোনও লেখক নিজের লেখার সঙ্গে নিজের জীবনের আচরণের মেল--বন্ধন ঘটিয়ে দিতে পারেন তবে আর তার কোনও ভয় নেই। তিনি টিকে গেলেন। তাঁর খাওয়া-পরা সংসার-যাত্রা পরিচালনার ভার পাঠকেই নেবে।

আর একজনের কথা বলি।

তাঁর নাম সিরিল কনোলী।

এই সিরিল কনোলী এই কথাটাই আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

"দি মোর বুকস উই রিড্, দি ক্লিয়ারার ইট্ বিকামস খ্যাট দি ট্রু ফাংশান অব এ রাইটার ইজ টু প্রোডিউস এ মাস্টারপীস অ্যাণ্ড খ্যাট নো আদার টাস্ক ইজ অব এনি কনসিকোয়েন্স···এভরি এক্সকারশন ইনটু জার্নালিজম, ব্রডকাস্টিং, প্রোপাগাণ্ডা অ্যাণ্ড রাইটিং ফর ফিল্মস, হাউএভার গ্রানডোইস, উইল বী ডুমড্ টু ডিসঅ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। টু পুট্ আওয়ার বেস্ট ইনটু দিজ ইজ অ্যানাদার ফলি, সিনস্ দেয়ারবাই উই কনডেমন গুড আইডিয়াজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাড টু ওবলিভিয়ান।"

কথাগুলো বহুদিন আগে পড়েছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল যে সব লেখাই

লেখা বটে, কিন্তু সব লেখাই প্রীতির লেখা নয়। খবরের কাগজের ফিচার বা রেডিওর বক্তৃতা বা সিনেমার চিত্রনাট্যকে আমরা চলিত অর্থে লেখাই বলি। সেই লেখা লিখেও আমাদের জীবিকা উপার্জন হয়। আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। কিন্তু ওটা হলো নগদ পাওনা। নগদ পাওনার দোষ এই যে ওটা পেলেই পাওয়া ফুরিয়ে যায়। সেই জন্যেই সাহিত্যের মূল্য বিচারে ওর দাম কানাকড়ি!

কিন্তু আবার এমন পাওনাও আছে যা শুধু আজকের নগদ প্রয়োজনই মেটায় না, আখেরের প্রয়োজনও মেটায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নগদ পাওনাটা হলো "খোরাকি," আর আখেরের পাওনাটা হলো "বেতন"। খোরাকিটা লোকে নগদ-নগদ খরচ করে ফেলে। কারণ খরচ করবার জন্যেই সেটা দেওয়া হয়। কিন্তু বেতন?

ওই বেতনটা কিন্তু মাস-কাবার না হলে পাওয়ার নিয়ম নেই। নিজের জীবদ্দশায় সেটা পেতেও নেই। ওর হিসেবটা চিত্রগুপ্তের খাতায় যথাযথ লেখা থাকে।

কনোলীসাহেব 'মাস্টারপীস্' বলতে সেই লেখাকেই বুঝিয়েছেন যার বেতন ইহজীবনে তো পাওয়া যায়ই, পরজীবনেও যা থেকে লেখক বঞ্চিত হন না।

ঘটনাচক্রে আমি সিনেমার সঙ্গে ব্যবসাগতভাবে মাঝে-মাঝে জড়িত হয়ে পড়ি। আর সিনেমা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাটুকু সেই কারণেই ব্যক্তিগত। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ই বলতে গেলে আমার প্রথম পরিচিত ফিলম্-ডাইরেক্টর, এবং চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে কার্তিকবাবুর কাছেই আমার প্রথম হাতে-খড়ি।

ওদিকে ছবির তোড়জোড় চলতে লাগলো। যাঁরা ছবির জন্যে টাকা খরচ করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন ছবির ব্যবসাগত দিকটার জন্যে। আর আমি? আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম আমার নিজের কথা ভেবে! আমি ভাবছিলাম কেন এ ছবি করবার অনুমতি দিলাম? কেন ক'টা টাকার বিনিময়ে এমন দাসখতে সই করলাম।

মানুষের মন বড় অদ্ভুত বস্তু। মন বলতে লাগলো—হোক্ না ছবি, তুমি অত ভাবছো কেন? বাঙলাদেশের অধিকাংশই তো নিরক্ষর লোক। তারা তো লিখতে পড়তে জানে না। তারা তো তোমার বই পড়েনি, এবার ছবি দেখে

তারা তোমার গল্পটা জানতে পারবে! দেয়ালে দেয়ালে তোমার বইএর পোস্টার আঁটা হবে। চারদিকে তোমার নাম ছড়াবে, তোমার খ্যাতি হবে!

যা হোক, আমার যা করণীয় তা আমি করে দিয়েছি। এখন প্রোডিউসার আর পরিচালকের কাজ! তারা তাদের দায়িত্ব পালন করুক।

হঠাৎ একদিন নজরে পড়লো আনন্দবাজারপত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে। দর্শকদের কাছ থেকে মন্তব্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে 'সাহেব বিবি গোলামে'র ভূমিকা-লিপি সম্বন্ধে। কোন্ ভূমিকায় কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তাঁরা দেখতে চান সেই আবেদন। পত্র লিখে তাঁরা যেন তার উত্তর জানান।

খবরটাতে আমি কোনও গা করিনি।

কিন্তু দেখলাম কয়েকজন ঘন-ঘন আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করছেন। তাঁদের আমি জীবনে কখনও আগে দেখিনি। চিনিও না তাদের। আবার এমন লোক আসতে লাগলেন যাঁরা আমার পরিচিত।

সকলেরই আবেদন—আমি যেন তাদের একটা চান্স দিই—

এ এক ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। বই লিখে যে-নাড়া দিতে পারনি, ছবি হওয়ার খবরে যেন তার চেয়ে বেশি নাড়া দিতে পেরেছি। যেন বইটা কিছুই নয়, ছবিটাই সব। আসলে যেন বই লেখাতে আমারকোনও বাহাদুরি নেই, ছবি হওয়াতেই যেন আমার মহা কৃতিত্ব।

সেইদিন থেকে বহু আত্মীয়-স্বজন আমার সংবাদ নিতে লাগলেন। আমার শরীর কেমন আছে তা জানবার জন্যেও তাঁদের আগ্রহ হলো। শুধু বাইরের আত্মীয়-স্বজনই নয়, বাড়ির ভেতরের আত্মীয়-স্বজনরাও গুজ্-গুজ্ ফিস্-ফিস্ শুরু করতে লাগলেন। সকলের ধারণা হতে লাগলো আমি বোধহয় অনেক টাকার মালিক হয়ে গিয়েছি। লাখ তো বটেই কিন্তু কত লাখ সেই বিষয়েই তাঁরা শুধু সঠিক ধারণা করতে পারলেন না।

এতদিনে সমস্ত রহস্যের সমাধান হলো।

একজন স্পষ্টই জিজ্ঞেস করে বসলেন—বইটার জন্যে কত টাকা আপনি পেলেন?

জিজ্ঞেস করলাম—বইটা আপনি পড়েছেন?

তিনি বললেন—বই তো একটা আমাকে দিলেনও না যে পড়ি—

তারপর একটু থেমে বললেন—তা বই আর পড়বো কী, নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে, নইলে অত বিক্রিই বা হলো কী করে। আর সিনেমা-কোম্পানীরা

তো আর বোকা নয় যে মিছিমিছি অত টাকা খরচ করে ছবির জন্যে বাজে বই কিনবে—

যারা অভিনয়ের চান্সের জন্যে আসে তারাও তেমনি।

বলে—দেখুন, আমি ষোল বচ্ছর এই লাইনে আছি, ছ'টা মেডেল পেয়েছি, কিন্তু মুরব্বি নেই বলে সিনেমায় নামতে পারছি না—

আমি বলি—কোন্ পার্টটা আপনি চান, বলুন ?

তারা বলে—যে কোনও রোল্ হলেই চলবে।

—তবু একটা নাম করুন, শুনি।

তারা বলে—বইটা ঠিক এখনও পড়া হয়নি—লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসে পড়ে নেব—

এদের আমি কী জবাব দেব ! এই জন্যেই সিনেমার ওপর আমার এত অনীহা। সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' পড়বো না, 'হ্যামলেট' সিনেমা দেখে বলবো 'হ্যামলেট' পড়েছি। আজকালকার ক'জন টলস্টয়, ডস্টয়ভ্স্কি পড়েছে জানি না, কিন্তু তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা 'রেজারেকশান' বা 'ব্রাদারস্ কারমাজভ্'-এর গল্পটা গড় গড় করে বলে দেবে।

সেই জন্যেই আমার মতে ভালো উপন্যাসের সিনেমা-স্বত্ব প্রথমদিকে বিক্রি করতে নেই। তাতে আসল বই লোকে পড়বার কষ্ট স্বীকার করে। অন্তত কিছু লোক তো পড়ে ! ভালোভাবে প্রচার হবার আগে যদি সিনেমা-স্বত্ব বিক্রি করা হয় তাহলে লেখকের আর্থিক এবং আত্মিক উভয় ক্ষতি তো বটেই, প্রকাশকেরও আর্থিক ক্ষতি কম হয় না।

এদিকে শুনতে পেলাম ছবি তোলা চলছে রীতিমত। স্টুডিওর কিছু কিছু লোক আমার কাছে আসতো।

তারা জিজ্ঞেস করতো—আপনার ছবি কতদূর ?

আমি বলতাম—ছবি তো আমার নয়—

তারা অবাক হয়ে যেত। বলতো—সে কি, আপনি স্টুডিওতে যান না ?

বলতাম—না—

—কেন ? ওরা আপনাকে যেতে বলেনি বুঝি ?

বলতাম—যেতে তো বলেছে, কিন্তু আমি যাবো কেন ? ছবির ব্যাপারে আমার চেয়ে তারা তো বেশি বোঝে ! আমার কাজ তো করে দিয়েছি আমি —আর তো আমার করণীয় কিছু নেই—

তারা বলতো—কিন্তু সব সাহিত্যিকই তো যায়।

বলে কয়েকজন সাহিত্যিকের নামও উল্লেখ করলে তারা। আরো শুনে অবাক হলাম যারা শুধু সিনেমার গান লেখে তারাও নাকি স্টুডিওতে ছবি তৈরি হওয়ার সময় যায়।

বলতাম—কিন্তু যারা গান লেখে তাদের কি যাওয়ার দরকার হয়?

তারা বলতো—না।

—তবে?

তারা হাসতো। বলতো—শুধু যে যায় তা নয়। আউটডোর শুটিং-এর সময়ও দলের সঙ্গে বাইরে যায়—

—সেখানে তারা যায় কী করতে?

এ-প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারতো না। মুখ টিপে হাসতো!

কিন্তু স্টুডিওতে না গেলেও খবর আমার কানে আসতো সবই। নন্দন পিক্‌চার্সের হারুবাবুর (সবাই তাঁকে হারুদা বলেই ডাকতো) সঙ্গে একদিন দেখা।

বললেন—বিমলবাবু মার খাবার জন্যে তৈরি থাকুন—

আমি তো অবাক। বললাম—কেন?

তিনি বললেন—লোকে তো আমাকে পাগল করে মারছে মশাই। আমি তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—

—কেন?

হারুদা বললেন—কী এক বই লিখেছিলেন মশাই আপনি, লোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে সেই গোরাদের মারামারির সিনটা আছে তো, কিংবা সেই তেলেভাজাওয়ালার সিনটা আছে তো? আর সেই আরসোলার দৃশ্যটা আছে কি না, তারপর আছে পায়রা ওড়ানোর সিন—পায়রা-ওড়ানোর সিন আমি কী করে দেখাই বলুন তো! কলকাতায় তো টেলি-ফোটো ক্যামরা পাওয়া যাবে না—

বললাম—তা দিন না সব জুড়ে—

হারুদা বললেন—জুড়ে দিতে বললেই কি আর দেওয়া যায়? কত ঘটনা জুড়বো? লোকে তো আপনার বইখানা মুখস্থ করে ফেলেছে। তারা চায় আপনার পুরো বইখানা সিনেমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিই। তা কি কখনও দেওয়া যায়? লেঙ্‌থের কথা ভাবতে হবে না? আপনি তো একখানা থান-ইট্ লিখে খালাস। কিন্তু আমি তো তা পারবো না—

জিজ্ঞেস করলাম—ভূতনাথের পার্ট কে করছেন ?

হারুদা বললেন—কাউকে ঠিক করিনি এখনও, কিন্তু উত্তমকুমার বড্ড ধরেছে—

বললাম—তা দিন না ওঁকে—

হারুদা বললেন—পারবে কি না বুঝতে পারছি না। বরাবর তো রোমাণ্টিক প্রেমিকের রোল করে, এই টাইপ-পার্ট কি পারবে। অথচ আমি ভাত খেতে বসেছি তখন এসে আমার স্ত্রীকে দিয়ে ধরেছে—

তারপর একটু থেমে বললেন—তবে হ্যাঁ 'চাঁপাডাঙার বউ'তে টাইপ-রোল মন্দ করেনি। আপনি চাঁপাডাঙার বউ' দেখেছেন ?

বললাম—না—

হারুদা জানতেন না যে জীবনে কখনও আমার সিনেমা দেখার বাতিক ছিল না। নিজের পয়সায় টিকেট কেটে কখনও সিনেমা দেখতে গিয়েছি এমন ঘটনা আমার মনেও পড়ে না। আর তা ছাড়া আমার গল্পতে কে নায়কের রোল করলো তা নিয়েও আমার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কারণ উত্তম-কুমার ভালো অভিনেতা কি খারাপ অভিনেতা তাও আমি তখন জানতাম না।

শুধু একটা কথা মনে আছে মিস্টার বি-এন-সরকারের সঙ্গে যখন এই প্রসঙ্গে শেষ দেখা হয়, তিনি বলেছিলেন—পটেশ্বরী বৌঠানের রোল্ কাকে দিলে ভাল হয় বলুন তো ?

আমি বলেছিলাম—অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারবো না—

মিস্টার সরকার বলেছিলেন—মিসেস সুচিত্রা সেন ছ'হাজার টাকা চাইছেন নায়িকার রোল করবার জন্যে—কিন্তু আমি ন'হাজার টাকায় সুমিত্রা দেবীকে পাচ্ছি, তাই ভাবছি সুমিত্রা দেবীকেই রোলটা দেব। আপনার কী মনে হয় ?

আমার যে কিছুই মনে হয় না সেদিন সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে আমি চলে এসে-ছিলাম—তারপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

কিন্তু সেদিন কাউকেই বোঝাতে পারিনি, এমন কি বলতেও পারিনি যে আমার তখন ভয় হয়েছিল। কেন যে ভয় হয়েছিল তা কি আজই বুঝিয়ে বলতে পারবো ? ওই যে কনোলীসাহেব! ওই কনোলীসাহেবই যে লিখে গিয়েছেন—দি ট্রু ফাংশান অব এ রাইটার ইজ্ টু প্রোডিউস এ মাস্টারপীস্ অ্যাণ্ড ছাট নো আদার টাস্ক ইজ অব এনি কনসিকোয়েন্স।

নাটক ও চিত্র নিয়েই চিত্রনাট্য

দশচক্রে একদিন ভগবানকেও ভূত হতে হয়েছিল—এ-রকম একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। আর আমি? আমি তো অতি তুচ্ছ একজন লেখক, কিন্তু সেই আমাকেও কিনা ঘটনাচক্রে চিত্রনাট্য লিখতে হয়েছিল। এও এক আশ্চর্য ঘটনা বই কি! কারণ জীবনে উপন্যাস লিখবো গল্প লিখবো এ আমার আবাল্য আকাঙ্ক্ষা হলেও চিত্রনাট্য লিখবো এ কল্পনা আমি কখনও করিনি।

ইংরেজী সাহিত্যের একজন সুবিখ্যাত সমালোচক হলেন সিরিল কনোলী। সাহেব বহুদিন আগে একটা কথা লিখে গিয়েছিলেন সেটা মুখস্থ করেছিলাম তখন। তিনি লিখেছিলেন :—"The more books we read the clearer it becomes that the true function of a writer is to produce a masterpiece and that no other task is of any consequence...Every excursion into journalism, broadcasting, propaganda and writing for the films however grandiose will be doomed to disappointment. To put our best into these is another folly, since thereby we condemn good ideas as well as bad into oblivion."

কথাগুলো বহুদিন আগে পড়া। তখনই মনে হয়েছিল যে সব লেখাই লেখা বটে, কিন্তু কিছু লেখা প্রয়োজনের আর কিছু লেখা প্রীতির। যেমন দরখাস্ত। তা যত ভালো কাগজে আর যত যত্ন করেই লেখা হোক সে প্রয়োজন মেটানো ছাড়া আর কোনও দাবী মেটায় না। খবরের কাগজের ফিচার বা রেডিওর বক্তৃতা বা সিনেমার চিত্রনাট্য লেখাটাকে আমরা চলিত অর্থে লেখাই বলি। এবং সেই লেখা লিখেও আমাদের জীবিকা অর্জন হয়, আমাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয়। কিন্তু ওটা হলো নগদ পাওনা। নগদ পাওনার একটা মস্ত দোষ এই যে, ওটা পেলেই পাওয়াটা ফুরিয়ে যায়। সেইজন্যেই সাহিত্যের মূল্য-বিচারে ওর দাম কানাকড়ি।

কিন্তু আবার এমন আর এক রকমের পাওনাও আছে যা শুধু আজকের নগদ প্রয়োজনই মেটায় না, চিরকালের প্রীতির সংস্থানও করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ওই নগদ পাওনাটা হলো 'খোরাকি' আর আখেরের প্রীতির সংস্থানটা হলো 'বেতন'। খোরাকিটা লোকে নগদ-নগদ খরচ করে ফেলে, কারণ খরচ করার জন্যেই সেটা দেওয়া হয়। কিন্তু বেতন?

ওই সাহিত্যের বেতনটা পেতে গেলে লেখককে শুধু রক্ত বা পরমায়ু নয়, সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ জিনিস যেটা সেই আন্তরিক ভক্তি আর নিষ্ঠাও দিতে হয়। আর সেটা মাসকাবার না হলে পাওয়ার নিয়ম নেই। নিজের জীবদ্দশায় সেটা পেতেও নেই। ওর হিসেবটা চিত্রগুপ্তের খাতায় যথাযথ লেখা থাকে। সেখানে হিসেবের ভুল কখনও হয় না।

কনোলী সাহেব ওই 'মাস্টারপিস' বলতে সেই লেখাকেই বুঝিয়েছেন যার বেতন ইহজীবনে তো পাওয়া যায়ই, আর ইহজীবনে পাওয়া না গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ পরজীবনেও লেখক তা থেকে বঞ্চিত হন না। একেবারে ডিভিডেণ্ড সমেত একদিন সমস্ত পাওনা উসুল হয়ে যায়।

আমার সঙ্গে চিত্রনাট্যের যোগসূত্র প্রথম স্থাপিত হলো ১৯৫৪ সালে। সেও এক ঘটনাচক্র। আমি তখন একটা বই লিখেছিলাম তার নাম 'সাহেব বিবি গোলাম'। বইটা ভালো কি মন্দ সে-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। কিন্তু সেই বইটাকে কেন্দ্র করে আমার বিরুদ্ধপক্ষ এমন কুৎসা-কটূক্তি করতে শুরু করলেন যার ফলে বইটা রাতারাতি সুবিখ্যাত হয়ে পড়লো। যারা কস্মিন্‌কালেও বইখানা পড়তো না তারাও গালাগালির চোটে পড়তে লাগলো। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে, বইটা রাতারাতি হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। হাটে-মাঠে-বাজারে তখন কেবল একটিই কথা, তা হলো 'সাহেব বিবি গোলাম'। কয়েক বছর ধরে লোকে বলাবলি করতে শুরু করেছিল যে, উপন্যাসের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন এসেছে রম্যরচনার যুগ, উপন্যাস আর চলবে না। কিন্তু 'সাহেব বিবি গোলামে'র অস্বাভাবিক নিন্দের দরুন লোকে আবার উপন্যাস পড়তে শুরু করলো। প্রচলিত ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিলে। এ-সব কথা আজ ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে গেছে। সুতরাং এখানে এর পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক।

এখন হলো কি, একটা বিয়ে বাড়িতে এক সিনেমা প্রযোজক নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখেন যে বাড়ির নববধূ সাতাশখানা "সাহেব বিবি গোলাম" উপহার পেয়েছে।

তিনি কৌতূহলী হলেন—কী বই? লেখক কে?

শুনলেন লেখকের নাম—বিমল মিত্তির।

আমাদের দেশে কোনও লেখকের বই বেশি বিক্রি হওয়া একটা পাপবিশেষ। সমালোচকরা তাতে ক্ষুব্ধ হয়। তারা বলে—আমরা সার্টিফিকেট দিলুম না অথচ বইটা বিক্রি হচ্ছে, এ তো ভালো কথা নয়। পাঠকরা কি আমাদের চেয়েও বেশি বোঝে?

সুতরাং ওকে নিন্দে করো, গালাগালি দিয়ে লেখকের ভবিষ্যতের সমাধি রচনা করো।

ফলে চারদিকে কাগজে-কাগজে ছাপা নিন্দে বেরুতে লাগলো। সে-সব অনেক কুৎসা-কাহিনী। আমি নাকি শিবনাথ শাস্ত্রীর বই থেকে প্যাসেজ-কে-প্যাসেজ আত্মসাৎ করেছি, আমার নামে নাকি চুরির অপরাধে হাইকোর্টে মামলা রুজু করা হয়েছে, ইত্যাদি-ইত্যাদি অনেক কথা।

কিন্তু আমি তখন নির্বিকার। প্রতিদিন 'দেশ' পত্রিকার ঠিকানায় আমার নামে অসংখ্য চিঠি আসছে। কেউ করছে ভূয়সী প্রশংসা, কেউ নিন্দে। মনে আছে একজন আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন—'আপনি কেন এর প্রতিবাদ করছেন না?' উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম যে, 'যদি দশ বছর পরেও এই অভিযোগ টেঁকে তো তখন আমি এর জবাব দেব।'

কিন্তু মনে মনে আমি তখন চাইছি যে, নিন্দেটা আরো চলুক। মনু-সংহিতাতেই তো পড়েছিলুম যে, 'নিন্দাকে অমৃত জ্ঞান করিবে, প্রশংসাকে বিষ'। ভর্তৃহরি ছিলেন একজন সম্রাট আবার সন্ন্যাসীও বটে। তিনি বলেছিলেন —'কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ, আবার কেউ বলবে দানব, তুমি কোনওদিকে না তাকিয়ে নিজের পথে চলতে থাকো, কাউকে ভয় কোর না—'

কথাগুলো যে সত্যি তার প্রমাণও পেলাম। অত কুৎসা-গালাগালির ফলে আমার হলো লক্ষ্মীলাভ। আমি তার ফলে চিরকালের জন্যে দাসত্ব-বৃত্তি থেকে মুক্তি পেলাম। আর আমার প্রকাশক পেলেন অভাবনীয় অর্থ।

তা সে-কথা যাক্, আসল প্রসঙ্গ হলো সিনেমা। বিয়েবাড়িতে একজন নববিবাহিতার সাতাশখানা একই বই উপহার প্রাপ্তি প্রযোজকদের ব্যবসা-বুদ্ধি জাগিয়ে তুললো। যে বই এত জনপ্রিয় তার প্রত্যেকটি পাঠক-পাঠিকা যদি একবার করেও সিনেমাটি দেখে তাহলেই প্রচুর টাকা আমদানির সম্ভাবনা।

হিসেব কষে দেখা গেল নিট প্রফিট কয়েক লক্ষ্য টাকা। তখন খোঁজ পড়ল আমার।

তিনজন প্রযোজক আমার সন্ধান করতে লেগে গেলেন। তিনটে কোম্পানির প্রতিনিধিই আমার বাড়িতে আসেন, কিন্তু আমাকে পান না। তখন আমার নিজের টেলিফোনও নেই। আমি তখন তাঁদের এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পালিয়ে বেড়াচ্ছি এই জন্যে যে, আমার বই সিনেমা করতে দিলে তা খারাপ হবে এবং আমার বই বিক্রির হারও কমে যাবে। তা'ছাড়া বেশি দাম দিয়ে কে বই কিনবে, যখন দশ-আনা পয়সায় গল্পের আসল মজাটা সিনেমায় দেখে পুরো উপভোগ করা যাবে! আসলে বই আর সিনেমা কি এক! আমার নিজের মত হলো, সিনেমা মানুষকে মজা দেয় বটে, কিন্তু তাকে চিন্তাহীন করে; আর সাহিত্য করে মানুষকে চিন্তাশীল। আমি অত যত্ন করে অত রাত জেগে জেগে অত বই ঘেঁটে ঘেঁটে সংগ্রহ করে যে-সব শব্দ গল্পের আবরণে প্রতি লাইনে লাইনে ঢেলে দিয়েছি তা কি সিনেমায় দু'ঘণ্টার মধ্যে চিত্রায়িত করা সম্ভব!

কিন্তু ওই যে বলেছি দশচক্রে ভগবান ভূত। আমারও সেই দশা হলো। বাদ সাধলেন এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স-এর শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার। একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে কলেজ স্ট্রীটে তাঁর দোকানে বসে আছি, হঠাৎ একজন ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললেন—'এই যে নন্তবাবু, আপনি যাঁকে খুঁজছিলেন, এই সেই বিমল মিত্র—'

আমি তখন ঠিক সাপ দেখে ভয়ে পিছিয়ে এসেছি।

কিন্তু নন্তবাবু এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়লেন না। বললেন—আরে আপনিই? আসুন আসুন, আমার সঙ্গে আসুন—

বলে টানতে টানতে একেবারে শ্যামবাজারে রূপবাণীর দোতলায় নিয়ে গিয়ে তুললেন। কোথা থেকে ভালো ভালো সন্দেশ আনালেন। তিনি ভাবলেন, খেতে পেয়ে আমি গলে যাবো।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমি গলেই গিয়েছিলাম। গলে না গেলে ছবি হলোই বা কী করে! শেষে কী কৌশলে আমাকে তিনি কব্জাগত করলেন তার বিশদ বিবরণ দিতে গেলে এখানে জায়গায় কুলোবে না। সুতরাং সে-প্রসঙ্গ এখানে উহ্য থাক। এইটুকু শুধু বলা ভালো যে, একদিন ধর্মতলা স্ট্রীটে নিয়ে গিয়ে আমাকে তোলা হলো। অন্য দু'জন প্রযোজক তখন নিউ থিয়েটার্সের কলা-কৌশলে পরাজয় স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করেছেন।

চুক্তির মধ্যে একটা শর্ত এই লেখা ছিল যে, চিত্রনাট্য রচনায় আমি সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবো। অর্থাৎ লিটারারি কোলেবোরেশান করবো।

বললাম—এই শর্তটা কেটে দিতে হবে—

নন্তবাবু নিউ থিয়েটার্সের ল'-অফিসার। তিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—আপনার নিজের গল্প আপনি চিত্রনাট্য দেখে দেবেন, এটা তো আপনারই স্বার্থ—

আমি বললাম—না, শেষকালে শর্তের চোরাগলি দিয়ে আপনারা আমাকে দিয়ে যদি গোটা চিত্রনাট্যটাই লিখিয়ে নেন—

তা মিস্টার বি. এন. সরকার হলেন নিউ থিয়েটার্সের মালিক। আমার পীড়াপীড়িতে তিনি শর্তটা কেটে দিলেন। তার বদলে লেখা হলো যে, চিত্র-নাট্য যাঁকে দিয়ে তৈরি করাই হোক, সেটি আমার মনোনয়নসাপেক্ষ হওয়া চাই।

সই-সাবুদ তো হয়ে গেল। শেষে মিস্টার সরকার জিজ্ঞেস করলেন—কাকে পরিচালনার ভার দেওয়া যায় বলুন তো ?

আমি কোনও পরিচালকের নাম জানি না তখন। হেমচন্দ্রের নাম উঠলো, চিত্ত বোসের নাম উঠলো। আমি কোনও সমর্থন জানাতে পারলাম না, কারণ আমি কারও কাজ তখনও দেখিনি।

তারপর উঠলো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম। সে-সম্বন্ধেও আমি কোনও সাহায্য করতে পারলাম না।

শেষকালে উঠলো চিত্রনাট্যের কথা। ঠিক হলো নিতাই ভট্টাচার্যের নাম।

আমি চেক নিয়ে চলে এলাম।

এর মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পেলাম। সে-চিঠিতে আগামী অমুক তারিখে অমুক সময়ে মিস্টার বি. এন. সরকারের বাড়িতে আমাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সেদিন চিত্রনাট্য শোনার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। আপনি এলে বাধিত হবো। ইতি!

সে এক অভিজ্ঞতা বটে। নিতাই ভট্টাচার্য মশাই চিত্রনাট্য পড়তে শুরু করলেন। বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি তা শুনতে লাগলেন। এলাহি জলযোগের ব্যবস্থা। উপস্থিতদের মধ্যে একজনের নাম কার্তিক চট্টোপাধ্যায় আর একজনের নাম সৌরীন সেন। নিউ থিয়েটার্সের আর্ট-ডাইরেক্টর।

পড়তে পড়তে নিতাই ভট্টাচার্য এক ফাঁকে আমার দিকে চেয়ে বললেন—চিত্রনাট্য হচ্ছে পালক-ছড়ানো মুরগী—

কথাটা শুনে আমি মাথা নাড়ালাম। যেন আমি কথাটার মর্মার্থ বুঝেছি। আসলে যে আমি চিত্রনাট্যের ব্যাপারে আনাড়ি, সেই ভাবটাই আমার চোখে-মুখে প্রকাশ করলাম।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সৌরীন সেনের নাক ডাকছে, তিনি তাঁর চেয়ারে বসে বসেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবং সে ঘুম এত সশব্দ যে কারো সজাগ কান তা এড়ায়নি।

তারপর এক সময়ে সেদিনকার মত পড়া শেষ হলো, বাকিটা অন্য একদিন পড়া হবে, সেই রকম সাব্যস্ত হয়ে রইল। সৌরীন সেনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তিনি চোখ-মুখ মুছে সোজা হয়ে বসলেন।

নিতাই ভট্টাচার্য আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনার গল্প এতটুকু বদলাইনি, নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে—দেখবেন—

আমরা সদলবলে যে-যার বাড়ি ফিরে এলাম। কিছু দিন পরে চিত্রনাট্যের দ্বিতীয় কিস্তি শোনবার জন্যে আবার চিঠি এল। কিন্তু সেদিন বিরক্তি-উৎপাদনের ভয়ে আমি আর গেলাম না। যা-হয় হোক, আমি কেন সিনেমার ব্যাপারে মাথা ঘামাই।

এর পরেই কার্তিক চট্টোপাধ্যায় আর সৌরীন সেন একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির। কী সংবাদ? না আপনাকে 'সাহেব বিবি গোলামে'র চিত্রনাট্য করে দিতে হবে।

আমি তো অবাক। চিত্রনাট্যের আমি কী বুঝি?

ওঁরা বললেন—চিত্রনাট্য করা খুব সোজা, আপনি গল্প লিখতে যখন পারেন তখন এক মিনিট লাগবে শিখতে, তা ছাড়া আমরাও দেখিয়ে দেব। আপনি আর আপত্তি করবেন না—

আপত্তি করে তখন লাভও ছিল না। কারণ চিত্রনাট্যের সাফল্যের ওপর আমার ছবির সুনাম-দুর্নাম জড়িত। সুতরাং রাজি হতে হলো। দশ দিন ধরে রোজ পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পরিশ্রমের ক্লান্তি। চিত্রনাট্য কাকে বলে জানি না। তার ওপর সিনেমা, বলতে গেলে কালে-ভদ্রে দেখি। কালে-ভদ্রে যদি বা সিনেমা দেখেছি তো ছবির গল্প নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, ক্যামেরা, পরিচালনা অভিনয়, চিত্রনাট্য ও-সব কোনও কিছু নিয়েই কখনও ভাবিনি। আর উপন্যাস লিখতে গিয়ে যে কখনও আমাকে চিত্রনাট্য লিখতে হবে তাও কল্পনা করিনি।

জর্জ বার্নার্ড শ' যখন তাঁর ছবির চিত্রনাট্য করতে হলিউডে গিয়েছিলেন,

তখনই নাকি তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর লেখার কী কী গুণ, এবং কী তাঁর লেখার আঙ্গিক। লেখার সময় তিনি কোনও নিয়ম না জেনেই গল্প লিখে গেছেন, কিন্তু চিত্রনাট্য করবার সময়েই প্রথম তিনি জানতে পারলেন যে, গল্প লেখার সব আইনই তিনি মেনেছেন।

কার্তিক চট্টোপাধায় চিত্রনাট্য লেখবার সময় আমার সামনে বসে থাকতেন, আর আমি আলোচনা করে করে হাতে-কলমে তা লিখতাম। আমি কোনও ব্যাপারে আপত্তি করলে কার্তিকবাবু বলতেন—এ আপনার উপন্যাস লেখা নয় মশাই, এ হলো গিয়ে চিত্রনাট্য, এ আলাদা জিনিস—

কিন্তু আমি দেখতাম আমার উপন্যাস আর চিত্রনাট্য, আসলে একই। লেখকদের মধ্যে কেউ-কেউ বর্ণনা-ধর্মী কাহিনী লেখে। যেমন ধরুন লেখক লিখলেন—'রামবাবুর খুব ফর্সা চেহারা।'

আমার লেখার ধরনটা হলো আলাদা। আমি একটি ঘটনার সৃষ্টি করলাম। রামবাবুকে একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে আনলাম। পাশ দিয়ে দু'জন বন্ধু হাঁটছিল, একজন আর একজনকে রামবাবুকে দেখিয়ে বললে—ওই দেখ্, ওই লোকটার নাম রামবাবু, গায়ের রং কী রকম ফর্সা দেখেছিস—

প্রথমটি হলো বর্ণনাত্মক, আর দ্বিতীয়টি হলো চিত্র-ধর্মী।

যেটা ছিল বর্ণনা সেটা চিত্রে রূপান্তরিত হলো।

যে ঔপন্যাসিকের স্টাইল চিত্রধর্মী তাঁর লেখা তত জনপ্রিয়। পড়তে পড়তে পাঠক শুধু কাহিনী শোনে না, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর ছবিটাও দেখতে পায়। ছবি যত মনকে টানে, বর্ণনা ততটা টানে না বলেই সেই ছবির মধ্যে পাঠকের মন যত তৃপ্তি পায়, চোখ তৃপ্তি পায় তার চেয়ে আরো বেশি। আর চলচ্চিত্র পুরোপুরি চোখ-কানের ব্যাপার বলে চিত্রনাট্যকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেয়ে ঘটনার আশ্রয় নিয়ে চরিত্রের স্ফুটনের দিকে বেশি নজর দেন। সেই কারণেই যাঁরা বর্ণনাধর্মী লেখক তাঁদের চেয়ে যাঁরা চিত্রধর্মী লেখক তাঁরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে বেশি সফল।

শরৎচন্দ্র ছিলেন এমনি একজন চিত্রধর্মী লেখক। সেই জন্যেই শরৎ-কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনায় চিত্রনাট্যকারের বেশি পরিশ্রম করবার দরকার হয় না।

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিত্রনাট্য লিখতে লিখতে আরো বুঝতে পারলাম যে, চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলেই ঘটনার আশ্রয় নিতে হবে। নায়ক

যদি সৎ হয় তো তার সততার উদাহরণ হিসেবে কয়েকটা ঘটনার আবিষ্কার করতে হবে, যাতে প্রমাণ হয় যে, সে সৎ। সাহিত্যকার 'সৎ' শব্দটা ব্যবহার করেই খালাস, কিন্তু চিত্রনাট্যকারের কাজ অত সহজ নয়, তাঁকে মাথা খাটিয়ে কয়েকটা সততা প্রমাণের ঘটনা আবিষ্কার করতে হবে। যে-সব লেখক তাঁদের উপন্যাসে এই সব ঘটনা সবিস্তারে দিয়ে লেখেন তাঁদের গল্পের চিত্রনাট্য করতে চিত্রনাট্যকারের বেশি বেগ পেতে হয় না। এই ঘটনা বা situation আবিষ্কারের মৌলিকতার ওপরেই উপন্যাসকার এবং চিত্রনাট্যকারের সাফল্য নির্ভর করে। ডিকেন্স, বালজাক, টলস্টয়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখক ছিলেন এই ঘটনা-আবিষ্কারের ওস্তাদ-কারিগর।

তা সে যা হোক, আমারই লেখা গল্প, আমিই তার চিত্রনাট্য তৈরি করছি, সুতরাং মিস্টার সরকারের কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি আমাদের দু'জনকে কাজে বসিয়ে দিয়ে তখন শিমুলতলায় গিয়ে বিশ্রাম করছেন। গরমের ছুটি। ফিরে যখন এলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন—কেমন হলো ?

কার্তিকবাবু আমাকে আগে থেকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যদি সরকার সাহেব জিজ্ঞেস করেন চিত্রনাট্য কেমন হলো তো আপনি বলবেন—ভালো—

আমিও তাঁর শেখানো কথামত বললাম—ভালো—

তখন শোনানোর পালা। মিস্টার সরকার অল্পভাষী লোক। আমার চেয়েও অল্পভাষী। কার্তিক চট্টোপাধ্যায় চিত্রনাট্য পড়তে লাগলেন আর আমরা দু'জন শ্রোতা। এক সময়ে পড়া শেষ হলো।

মিস্টার সরকার সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন—এ তো মেজবাবুর গল্প হয়ে গেছে মনে হচ্ছে—

ওই একটি মাত্র কথা। কিন্তু ওই একটি মাত্র কথাতেই যা তাঁর বলবার তা বলা হয়ে গেল। অর্থাৎ গল্পের কেন্দ্র ভুল জায়গায় স্থাপিত করা হয়েছে। তার মানে কিছুই হয়নি। শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং স্ক্রিপ্ট্ নিয়ে আবার বসতে হলো। কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করে গল্পের কেন্দ্রটি আবার যথাস্থানে স্থাপিত করতেই তখন সঠিক হলো। অর্থাৎ মেজবাবুর গল্প না হয়ে ছোটবাবুর গল্প হলো—যিনি 'সাহেব বিবি গোলামে'র মূল, যাঁকে কেন্দ্র করে সমস্ত কাহিনী গড়ে উঠেছে, তার গল্পই হলো।

এই কেন্দ্র-নির্বাচনের ব্যাপারে উপন্যাস বা চিত্রনাট্যের মূল সত্যটি একই। কেন্দ্রটি একটু এ-দিক ও-দিক সরে গেলেই সমস্ত কাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।

ফলে ছবিতেও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। তখন দোষ হয় কাহিনীকারের, দোষ হয় পরিচালকের, ক্যামেরাম্যানের, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সকলের। ভালো কাহিনীকার আর খারাপ কাহিনীকারের মধ্যে তফাত ওই কেন্দ্র নির্বাচন নিয়েই। পৃথিবীর পক্ষে যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপরিহার্য, চিত্রনাট্যের পক্ষে তেমনি অপরিহার্য হলো গল্পের কেন্দ্র নির্বাচন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবীর যে দশা হবে, চিত্রনাট্যে গল্পের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটলে ছবিরও ঠিক সেই একই দশা হয়। যেমন ধরা যাক গল্পের কেন্দ্র রাজা। কিন্তু চিত্রনাট্যকারের দোষে যদি রাজার বদলে সেনাপতি প্রধান হয়ে ওঠে তাহলেই গেল। ছবি রসাতলে যাবে।

'সাহেব বিবি গোলাম'-এর চিত্রনাট্যের ব্যাপারে এই ভুলটা আমি নিজে গল্পকার হয়েও ধরতে পারিনি, ধরলেন মিস্টার বি. এন. সরকার। তিনি বহু চলচ্চিত্র-নির্মাতা। সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতার কাছে আমাকে মাথা নোওয়াতে হলো। আগে আগে উপন্যাস লিখতাম, কিন্তু লেখার আইন জানতাম না, এবার তা জানলাম

এই হলো বলতে গেলে আমার চিত্রনাট্য রচনার হাতে-খড়ি।

ভেবেছিলাম এই চিত্রনাট্য রচনা আমার হাতে-খড়িতেই আরম্ভ আর হাতে-খড়িতেই শেষ হোক।

কিন্তু না, তা হলো না। চিত্রনাট্য ভালো হলো বলেই যে 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবি হিসেবে সুনাম অর্জন করলো তা নয়, চিত্রনাট্য হলো ছবি ভালো হওয়ার একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। সেটা জানতে পারলাম পরে। জীবন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় 'যৌতুক' ছবির সময়ে।

'যৌতুক' ছবির চিত্রনাট্যও একদিন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো এক বিশেষ কারণে। আমি চিত্রনাট্য রচনা করতে রাজি হলে নাকি পরিচালক সেই ছবি পরিচালনার দায়িত্ব পাবেন। অন্যথা তাঁকে চিরকাল সহকারী পরিচালক হয়েই থাকতে হবে।

'যৌতুক' ছবির কাহিনীকার হলেন স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির প্রযোজক শচীন বারিক মশাই আমাকে বার-বার বললেন—ছবি ভালো করবার জন্যে আপনি গল্পের যা-ইচ্ছে অদল-বদল করতে পারেন, গল্পকারের সঙ্গে আমার সেই রকম চুক্তিই আছে—।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জীবিত। আমি তাতে রাজি হইনি। কারণ

কাহিনীকার আমার পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজ। তাঁর গল্পের অদল-বদল চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে অপরিহার্য হলেও আমার পক্ষে তা করা উচিত নয় বলেই করিনি। উপেন্দ্রনাথের বিনা অনুমতিতে তা করা অন্যায় বলেই করিনি। অবশ্য ছবিটি ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়েছিল।

কিন্তু অনেক সময় তা করতেও হয়। পরিবর্তন না করলেই বরং খারাপ হয়। কোনও সুবিখ্যাত লেখকের গল্পের চিত্রনাট্য করার বেলাতেই সাধারণতঃ এই বিপদ ঘটে। অনেক পরিচালকও বিখ্যাত গল্পকে পরিবর্তন করে চলচ্চিত্রোপযোগী করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। সেই পরিবর্তন না-করার দরুন বদনাম হয় পরিচালকের, চিত্রনাট্যকারের এবং সেই ছবির সঙ্গে যুক্ত অন্য সকলেরই।

চিত্রনাট্য রচনার আর একটা বিপদের কথা বলি।

এ-বিপদ ঘটেছিল 'তানসেন' ছবির চিত্রনাট্য রচনার সময়। নীরেন লাহিড়ী মশাই একবার আমার কাছে এসেছিলেন চিত্রনাট্য করে দেবার প্রস্তাব নিয়ে। আমি 'তানসেন'-এর জীবনের কী-ই বা জানি, আর সঙ্গীত সম্বন্ধেই বা আমার কতটুকু জ্ঞান। তাছাড়া চিত্র্যনাট্য করার অভিজ্ঞতাই বা আমার কী?

কিন্তু কেন জানি না, 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবির সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে একে একে অনেকে এসে তখন আমাকে চিত্রনাট্য করে দেবার প্রস্তাব দিচ্ছেন। তবে নীরেন লাহিড়ী বড় মজলিসী মানুষ। তাঁর মজলিসী কথার ভঙ্গিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করলে। তাঁর কথাগুলো সাজালেই চিত্রনাট্য হয়ে যায় এমন ভালো কথক তিনি। আমি তাঁর কথায় ভুললাম। তাঁর সঙ্গে মাসখানেক আড্ডা দিয়ে আমি যে কত গল্প-উপন্যাসের খোরাক পেয়েছি তার ঠিক নেই। সেইটেই আমার আসল লাভ। লোকসানের মধ্যে কেবল ওই ছবি। ছবিটির ব্যবসায়িক সাফল্য হলো না। সে দোষ আমার নয়। ছবি করার সময়ে যদি শিল্প-সৃষ্টির আড়ালে আর কোনও দুষ্ট মতলব থাকে তাহলে কিছুতেই তাতে সাফল্য আসতে পারে না। নায়িকা নির্বাচনের ব্যাপারেই সে-রহস্যটি প্রকাশ হয়ে পড়লো। এর বেশি কিছু না-বলাই ভালো।

এর পর আর এক বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম আবার। বিপদই বৈকি! আমি উপন্যাস লিখবো, গল্প লিখবো, তার মধ্যে চিত্রনাট্য রচনাকার হিসেবে সস্তা-জনপ্রিয়তার প্রলোভন তো আমি চাইনি। উপন্যাস রচনা একটি সৃষ্টি। তাতে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু সে-যন্ত্রণা আনন্দের যন্ত্রণা। তাতে অর্থ না থাকলেও

সে যন্ত্রণা প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষেই কাম্য। কারণ সেটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্প। কিন্তু চিত্রনাট্য সিনেমার-শিল্পের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। তাতে যেমন দায়িত্ব কম, তেমনি যন্ত্রণাও কম। আনন্দহীন যন্ত্রণা যান্ত্রিক যন্ত্রণা। সে-যন্ত্রণায় স্রষ্টা আনন্দ পেলে বুঝতে হবে তিনি শিল্পী নন্, অন্য কিছু।

এ-ঘটনা ঘটেছিল 'নীলাচলে মহাপ্রভু' ছবির বেলায়। স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন, কিন্তু প্রযোজকের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি এ-কাজ ত্যাগ করেছিলেন।

আমি সবিনয়ে বললাম—নৃপেনবাবুর চিত্রনাট্যে আমি কলম ছোঁয়াবো এমন দুঃসাহস আমার নেই।

কিন্তু প্রযোজক মোহন মজুমদার মশাই আমাকে নৃপেনবাবুর চিঠি দেখালেন। দেখলাম তাতে নৃপেনবাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর চিত্রনাট্য যতটুকু লিখেছেন সমস্ত তিনি সেই চিঠিতে অস্বীকার করেছেন।

যখন দেখলাম প্রযোজক ছবির পেছনে ইতিমধ্যেই অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন এবং ছবি করতে বদ্ধপরিকর তখন আমাকে রাজি হতে হলো। চিত্রনাট্য লিখলাম। যখন সে-ছবি তৈরি শেষ হলো তখন নৃপেনবাবু আবার চিঠি লিখলেন যেন ছবিতে চিত্রনাট্যকার হিসাবে তাঁর নাম থাকে!

এমন ঘটনা ঘটবে জানলে আমি ও-চিত্রনাট্য লিখতামই না। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ছবিতে চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমাদের দু'জনের নামই ছিল এবং ছবিও প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই সময় 'এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'কে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখবার ইচ্ছে হয়েছিল আমার। 'এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' সম্বন্ধে ইতিহাসে কিছুই পাওয়া যায় না। আশি ভাগ কল্পনা আর মাত্র বিশ ভাগ সত্য তথ্য নিয়ে একটা গল্পের কাঠামো মনে মনে তৈরি করেছিলাম। কথাটা কী ভাবে অভিনেত্রী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে গিয়ে পৌছোয়। তাঁর স্বামী একদিন এসে হাজির হলেন ওই গল্প নিয়ে ছবি করবার জন্যে।

আমি বললাম—ও-গল্প তো এখনও লিখিনি—।

সুধীরবাবু বললেন—তাহলে লিখুন এখন।

লিখলাম। এক মাস সময় লাগলো লিখতে। এ-সম্বন্ধে পুরনো পুঁথি আর মাসিক পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ আমার খুব কাজে লেগেছিল। নায়িকার নাম সাধারণত 'সৌদামিনী' বলেই সবাই জানে। কিন্তু আমি নায়িকার নাম দিলাম

'নিরুপমা'। ইতিহাস থেকেই আমি ওই নাম পেয়েছিলাম। গল্পটা আগাগোড়া আমার কল্পিত। কোথাও কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি তার নেই। প্রকাশিত অন্য কোনও কাহিনীর সঙ্গে তার মিল নেই।

কিন্তু ছবি যখন হলো তখন শুনলাম ছবিতে কোথাও কাহিনী বা চিত্রনাট্যকারের নাকি কোনও নাম নেই। তবে তাতে আমার কিছু আশ্চর্য লাগলো না, কারণ ততদিনে আমি চলচ্চিত্র-জগতের অনেক কিছু কূট-কৌশলের নিদর্শন পেয়ে গিয়েছি।

এই সময়ে আমার সিরিল কনোলী সাহেবের কথাটা কেবল মনে পড়লো! ভাবলাম আর নয়—আমার কাজ উপন্যাস-গল্প লেখা। 'সাহেব বিবি গোলামে'র পরে সিনেমা জগতের সুধীজনরা আমাকে এমনভাবে চেপে ধরেছিলেন যে, আমি তাঁদের হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছিলাম না। এর পর থেকে যাঁরাই চিত্রনাট্যের জন্যে এসেছেন, তাঁদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। বলেছি—আর নয়, এবার আমি পরের কাজ আর করবো না, এবার আমাকে নিজের কাজ করতে দিন—আসলে আমি চিত্রনাট্য লিখতে জানি না।

তাঁদের হাত এড়াবার জন্যে তখন আবার 'দেশ' পত্রিকায় একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে লাগলাম। নাম দিলাম 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। তখন চিত্রনাট্যের প্রস্তাব এলেই বলি—এখন সময় নেই, এখন উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত—।

সেটা ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস। হঠাৎ তার তিন মাস পরে ১৮ই মার্চ তারিখে একজন অবাঙালী ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—আপনার 'সাহেব বিবি গোলামে'র হিন্দী ছবির স্বত্ব কি বিক্রি হয়ে গেছে?

বললাম—না, হয়নি, কিন্তু কে কিনতে চাইছে? কোন্ কোম্পানী?

ভদ্রলোক বললেন—গুরু দত্ত।

বললাম—আপনারা তো তিন বছর আগে একবার এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, এসেছিলাম; তখন eternal right কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি বেচতে চাননি, এবার আপনার শর্তেই কিনতে চাই। গুরু দত্ত আমাকে আবার আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনি কাল বোম্বাই যেতে পারবেন?

বললাম—না, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমিও যাবো না, তিনিও না-ছোড়-বান্দা। কলকাতা ছেড়ে যাবার পক্ষে আমার সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে আমার লেখা। প্রতি সপ্তাহে লেখা পাঠাতে হয় কাগজে, তারপর আছে প্রুফ দেখা। লেখা মানে আমার কাছে 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন'। আর হিন্দী সিনেমা হওয়া মানে তো আমার দিক থেকে মাত্র কয়েক হাজার টাকা উপার্জন, কিন্তু লেখা? লেখা মানে তো আমার অস্তিত্ব। শুধু শারীরিক অস্তিত্ব নয়, আত্মিক অস্তিত্ব। টাকার প্রয়োজন অবশ্য অস্বীকার করবার নয়, কিন্তু আত্মার প্রয়োজন কি টাকা মেটাতে পারে? আমি বললাম—আমি বোম্বাই যেতে পারবো না, তারা আসুক কলকাতায়।

তিনি বললেন—তারা কলকাতায় এলে অনেক খরচ, তার চেয়ে আপনি একদিনের জন্যে চলুন—

তবু বললাম—না, আগে আমার উপন্যাস, তারপরে সিনেমা।

ভদ্রলোক বললেন—অত তাড়াতাড়ি 'না' বলবেন না, আপনি বিকেল চারটে পর্যন্ত ভাবুন, তখন টেলিফোনে জানাবেন 'হ্যাঁ' কি 'না'।

তা মন্দ নয়। তাই-ই হবে। ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি বিকেল চারটের সময় তাঁকে টেলিফোনে জানালুম যে—না, আমার যাওয়া হবে না।

ভদ্রলোক বললেন—দেখুন, আমি কালকের সকালের প্লেনের টিকিটটা কেটে ফেলি, তারপর রাত্রে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে আপনি গুরু দত্তর সঙ্গে কথা বলুন—।

প্রস্তাবটা আমার খারাপ লাগলো না। রাত্রে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে গুরু দত্তর সঙ্গে কথা বলে অবাক হয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম গুরু দত্ত পাঞ্জাবী ভাষী, কিন্তু না, দেখলাম পরিষ্কার বাঙালীর মত বাঙলা ভাষায় কথা বলছেন। গুরু দত্ত বললেন—আপনি চলে আসুন বিমলবাবু, কোনও অসুবিধে হবে না, আপনি ইচ্ছে হলে সই করবেন, না হলে সই করবেন না।

সুতরাং রাজি হতে হলো। পরের দিন সকালবেলা দমদম থেকে প্লেন ছাড়লো। নতুন অচেনা জায়গায় যাচ্ছি, কী হবে বুঝতে পারছি না। সিনেমার লোকদের ওপর আমার বরাবর ভয়। সেখানে গিয়ে যদি আমাকে বাগে পেয়ে কোনও অন্যায় চুক্তিতে সই করিয়ে নেয়!

কিন্তু সেখানে গিয়ে দু'দিনের মধ্যেই আমার ধারণা বদলে গেল। দেখি আসলে কংকনী ভাষার মানুষ হলেও সংস্কৃতিতে গুরু দত্ত খাঁটি বাঙালী। ঘরে-ঘরে কেবল বই। বই-এর পাহাড়। যেখানেই বিছানা, তার পাশেই বই-এর

লাইব্রেরী। আর সাধারণ বই নয়, সবই ক্লাসিক সাহিত্য। ডিকেন্স, সলোকভ্‌, বালজাক, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র কে নেই? আর শুধু শোভার জন্য নয় বইগুলো, রীতিমত পড়ে। কোর্টে যাচ্ছে সাক্ষী হয়ে, সঙ্গে বই, স্টুডিওতেও বই-এর আলমারি। রাত্রে শুতে যাবার আগে একটা বই চাই। বাংলা, হিন্দী, ইংরিজী আরো কত ভাষার বই যে তার ঠিক নেই। চাপরাশি যখন সঙ্গে যাবে তার কাছেও ব্যাগের মধ্যে সিগারেট, দেশলাই, চশমার খাপ, টাকা-পয়সার সঙ্গে বইও আছে। এ এক অদ্ভুত বই-পাগলা মানুষ গুরু দত্ত। শুনলাম গুরু দত্ত নাকি অনেক ছবি করেছে, সবগুলোই প্রচুর সাফল্য দিয়েছে ব্যবসায়িক দিক থেকে। তিনদিন হয়তো দাড়িই কামালে না, অথচ মাইনে করা নাপিত রয়েছে স্টুডিওর। স্টুডিওতে যাচ্ছে, পরনে লুঙ্গি আর সাধারণ মোটা কাপড়ের একটা পাঞ্জাবী গায়ে। পাঞ্জাবীর পকেটে একটা ফুটো পয়সাও থাকে না, সব থাকে চাপরাশির ব্যাগের মধ্যে। চাপরাশির ব্যাগের মধ্যে কী থাকে না থাকে তা গুরু দত্ত নিজেও জানে না। দু'দিনের মধ্যে আমি সব কিছু লক্ষ্য করলাম। প্রতিদিন রাত তিনটে-চারটে পর্যন্ত আড্ডা চলতে লাগলো। শুধু সাহিত্য নিয়ে আড্ডা। এতদিন পরে মনের মতন আড্ডা দেবার লোক পেয়ে যেন বেঁচে গেলাম।

তৃতীয় দিনে অনেক কাটা-ছেঁড়ার পর চুক্তি সই হয়ে গেল।

আমি বললাম—এবার তাহলে যাই?

গুরু দত্ত বললে—আর একটা দিন থাকুন, কাল জার্নালিস্টরা আসবে, প্রেস-কন্‌ফারেন্স ডেকেছি। তার পরে যাবেন।

হলো প্রেস-কন্‌ফারেন্স। আমাকে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। তারপরে আমাদের দু'জনের একসঙ্গে ছবি তোলা হলো।

পরের দিন বললাম—এবার আমাকে ছেড়ে দিন।

গুরু দত্ত বললে—আপনিই এর চিত্রনাট্যটা করে দিন না বিমলবাবু।

বললাম—আমি যে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছি—

গুরু দত্ত বললে—তা লিখলেই বা, উপন্যাস লিখলে কি আর চিত্রনাট্য লেখা যায় না?

বললাম—তা হয়তো লেখা যায়। কিন্তু এই 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' আমার একটা চ্যালেঞ্জ। চিত্রনাট্য করলে এ বই লেখা যায় না—

বলে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বললাম। কেন চ্যালেঞ্জ তাও বুঝিয়ে

দিলাম। বাঙলাদেশে জন্মে জনপ্রিয় উপন্যাস লেখা যে কী পাপ তাও বললাম। তারপরে বললাম—আমার বন্ধু নবেন্দু ঘোষ এখানে আছে, সেও তো চিত্রনাট্য লেখে, তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিন্ না!

মনে আছে পরের দিন নবেন্দু ঘোষকে ডেকে পাঠানোও হলো। কিন্তু সে চলে যাবার পর গুরু দত্ত বললে—না বিমলবাবু, আপনি এ-বই-এর লেখক; খোদ লেখক থাকতে কেন অন্য লেখককে দিয়ে লেখাবো? তার চেয়ে আপনি বরং কলকাতায় চলে যান, তারপরে সাতদিন পরে চলে আসুন, আমরা বোম্বাই শহর ছেড়ে দু'জনে মিলে লোনাভ্লার পাহাড়ের ওপর নিরিবিলিতে বসে চিত্রনাট্যটা লিখে ফেলবো।

বললাম—কিন্তু ভোর থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্ত যদি আমাকে আমার উপন্যাস লিখতে সময় দেন তাহলে আমি তার পর থেকে যত রাত পর্যন্ত বলেন, তত রাত পর্যন্ত আপনার চিত্রনাট্য লিখতে পারি।

তথাস্তু! আমি চলে এলাম। এসে সাত দিন পরে আবার বোম্বাই যাত্রা। 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষ বলে দিলেন—আপনি কিছু ভাববেন না, ওখানে আমাদের অফিস আছে, সেখান থেকে আপনার উপন্যাসের কিস্তি আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবো।

বোম্বাইতে গিয়ে দেখি একজন বাঙালী সহকারী রাখা হয়েছে আমার জন্যে। আমি বলে যাবো আর সে লিখবে।

বোম্বাই থেকে নব্বই মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর একটা বাঙলো। সেখানে গিয়ে উঠলাম। দু'জন খানশামা, একজন বাবুর্চি, একজন অবাঙালী মহিলা স্টেনোগ্রাফার, একজন হিন্দী সংলাপ লেখক—তারাও গিয়ে হাজির হলো। কোথায় নিরিবিলিতে বসে লিখবো, তা নয়,-এ কী!

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এত ভিড়ের মধ্যে আমার উপন্যাসের কিস্তিই বা লিখবো কী করে আর চিত্রনাট্যই বা কী করে লিখবো। এর আগে যতবার চিত্রনাট্য লিখেছি সে ছিল নিরিবিলি জায়গা। কিন্তু এ যে হাট!

কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই অপরিচয়ের আড়ষ্টতা কেটে গেল। আমার উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলামে'র জন্যে যখন লক্ষ-লক্ষ পাঠক একদিকে হাঁ করে বসে থাকে, আমি তখন সকালবেলা একমনে সেই লেখা লিখি। আর দুপুর দু'টোর সময় সকলের সঙ্গে বসি 'সাহেব বিবি গোলামে'র চিত্রনাট্য নিয়ে। সকাল-

বেলা দীপঙ্কর, সতী, লক্ষ্মী ওরা—আর বিকেলের পর ভূতনাথ-পটেশ্বরী-জবা। রীতিমত বিরুদ্ধ চিন্তার টাগ্-অব-ওয়ার।

সময়টা গ্রীষ্মকাল। এপ্রিল মাস। আলোচনা করি গুরু দত্তর সঙ্গে, তারপর লিখি। এক-একটা দৃশ্য লিখি আর স্টেনোগ্রাফার মহিলা সেটি টাইপ করে ফেলেন। সংলাপগুলোর অনুবাদ হয় ইংরেজীতে। আর এক দিকে হিন্দী সংলাপ লেখক আব্রার আল্‌ভি সেটা হিন্দীতে অনুবাদ করে। আর বাঙলার জন্যে তো লোক রয়েছেই। সে আমার ডিক্‌টেশান নেয়।

কোথা দিয়ে সে সময় কেটে যায় বুঝতে পারতুম না। কাজ করতে করতে যখন নেশা লেগে যায় তখন দৃশ্যটা শেষ না করে আর উঠতে পারি না। অনেক চিত্রনাট্য করে করে এইটুকু বুঝেছিলুম যে, চিত্রনাট্যে গল্পের কেন্দ্রটা ঠিক রাখতে হবে। উপন্যাসে যেমন রাজার চেয়ে প্রজা যাতে বেশি বড় না হয়ে যায়, সেই ব্যালেন্স-বোধটা সব সময়ে মনে রাখতে হয়, চিত্রনাট্যেও ঠিক তাই। উপন্যাসে যেমন যে-দৃশ্যের পর যে-দৃশ্য থাকবে তার একটা নিয়ম মানতে হয়, চিত্রনাট্যেও তেমনি। তফাত শুধু একটা। সেটা হচ্ছে চিত্রনাট্যে চিন্তার কোনও অবকাশ নেই। গল্পের প্রয়োজনে যদি চিন্তার দরকার হয় তো তার জন্যে ক্যামেরা আছে। ক্যামেরা দিয়ে সে-কাজ না হলে স্বর আছে। বা যাকে বলে মিউজিক তাই আছে। আর তাতেও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় তো শেষ পর্যন্ত আছে সংলাপ। ভালো চিত্রনাট্যকাররা সংলাপের সাহায্য না নিয়ে বেশির ভাগ সময়েই action-এর সাহায্য নেন। সব মিলিয়ে চিত্রনাট্যের আসল কথাই হলো নাটক। বাকিটা হলো চিত্র।

কাজ করতে করতে আমার মনে হলো গুরু দত্ত যদি সিনেমার দিকে না ঝুঁকতো তো সে একজন ভালো গল্প-লেখক হতে পারতো। কিন্তু শুধু চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তা হতে পারেনি, বা হতে চায়নি। ভালো বা মন্দ যে-স্বভাবের জন্যেই হোক গুরু দত্ত এক জায়গায় বেশিক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারতো না। হঠাৎ যদি ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি এসে গেল তো তাকে তখন চুপ করিয়ে ঘরের ভেতরে বসিয়ে রাখা দায়। সে তখন আমাদের কাজ-কর্ম সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে বলবে—চলুন, চলুন, বেরিয়ে পড়ি।

সেই ঝম্-ঝম্ বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি চালিয়ে নিরুদ্দেশে উধাও হয়ে যাবে আমাদের নিয়ে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই কোথাও নেমে পড়ে কোনও বাড়ির খড়ের চালের তলায় দাঁড়িয়ে তার মুড়ি খাবার বেয়াড়া ইচ্ছে হবে।

এ-রকম লোককে নিয়ে এক মাসে কাজ শেষ করাও মুশকিল। বড় ছট্‌ফটে, বড় চঞ্চল। একেবারে শিশুর মতন। অথচ যখন চিত্রনাট্য নিয়ে সে ভাববে, তখন কী গভীর মনোযোগ। কিন্তু বেশিক্ষণ সে মনোযোগ স্থায়ী হবে না। চিত্রনাট্যের গতি যখন এক-একবার আটকে যায় তখন তা উপন্যাস লেখার মতই অসাধ্য সাধন ব্যাপার। তখন ভেবে ভেবে মাথার শির ছিঁড়ে ফেললেও কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। এমন ঘটনা আমার জীবনে কত-বার ঘটেছে তার ঠিক নেই। উপন্যাস লেখককে একলাই সে-সমস্যার সমাধান করতে হয়। কিন্তু চিত্রনাট্যকারের সুবিধে এই যে, তার পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শ করার সুবিধে থাকে।

এই সব ক্ষেত্রে গুরু দত্ত ছিল ভীষণ অসহিষ্ণু।

একদিন এমনি হলো। কিছুতেই একটা দৃশ্যের আর জট ছাড়াতে পারি না। যতবার একটা সমাধান-দিই গুরু দত্ত বলে—না, পছন্দ হচ্ছে না। গুরু দত্তও যত সমাধান দেয় আমিও তত বলি—না, পছন্দ হচ্ছে না।

তখন গুরু দত্ত বলতো—না, এখানে ঘরে বসে হবে না, চলুন বাইরে কোথাও চলে যাই।

কোথাও যাই মানে কোনও নদীর ধারে, কিংবা কোনও মাঠের মধ্যে, কিংবা ফাঁকা নীল আকাশের তলায়। কিংবা কোনও হোটেলের ঘর ভাড়া করেই সমস্ত দিন কাটিয়ে দিলাম। গল্পের জট আর কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। কিংবা হয়তো তখন চলে গেলুম পাওয়াই লেকে মাছ ধরতে।

একবার বললে—কাশ্মীর যাবেন?

আমি অবাক হয়ে যেতাম। যেন কাশ্মীরে গেলে গল্পের জট খুলবে!

চিত্রনাট্য করতে করতে এত ছট্‌ফটানি আমি আর কখনও দেখিনি। অথচ মানুষটা শিল্পগতপ্রাণ। রাত একটা-দু'টো-তিনটে-চারটে বেজে গেছে, খেয়াল নেই। তখনও কেবল গল্পের চিন্তা। আর কী নাটক-জ্ঞান!

চিত্রনাট্য যেদিন শেষ হয়েছিল, সেদিন গুরু দত্ত বলেছিল—জীবনে এই-ই প্রথম পুরো চিত্রনাট্য করে ছবি আরম্ভ করছি, দেখা যাক কী হয়।

তার আগে নাকি চিত্রনাট্যও একটু-একটু করে লেখা হয়েছে, আর ওদিকে শুটিংও চলেছে। এইটেই শুনলাম বোম্বাই চিত্র-জগতের নিয়ম।

ছবি যখন শেষ হয়-হয় সেই সময় চারদিকের ডিস্ট্রিবিউটাররা ছবির নমুনা দেখতে এল। ছবিটা আংশিক দেখে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল সকলের।

বললে—নাচ কই ছবিতে? ছবিতে নাচ নেই?

তারা তো অবাক। নাচ না থাকলে ছবি চলবে কী করে!

গুরু দত্ত বললে—গল্পের নায়িকা যে নাচতে জানে না, নাচ দেব কেন?

তারা বললে—কিন্তু গল্পের নায়িকা নাচ না জানুক ওয়াহিদা রেহমান তো নাচতে জানে—ওয়াহিদা রেহমানকে ছবিতে নিলেন অথচ তাকে দিয়ে নাচালেন না?

গুরু দত্ত আমাকে বললে—দেখছেন তো এদের কাণ্ড? আমি হিন্দী ছবিকে যত লজিক্যাল করবার চেষ্টা করছি, এরা তত তাকে হাল্লা-গুল্লা করে দিচ্ছে। এদের জন্যেই আজ হিন্দী ছবির এই দশা।

একদিন গুরু দত্ত বলেছিল—জানেন আমার ডিস্ট্রিবিউটাররা সবাইকে কী বলে? বলে—Don't give logic in your picture, logic is a slow process, give some convincing nonsense—

ছবিটা আমিও একদিন প্রোজাকশানে দেখলুম। সবাই-ই দেখলে। দেখি এক জায়গায় নায়িকা একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে গান গাইছে।

আমি তো অবাক। এ-গান তো চিত্রনাট্যে ছিল না! এ গান কোত্থেকে এল?

ওয়াহিদা রেহমান বললে—এ সিনটা কেটে দিন গুরুজী, আমার বড় লজ্জা করছে—

গুরু দত্ত বললে—তোমার লজ্জা করুক, টিকিট-ঘরের দিকে আমার নজর দিতেই হবে, ডিস্ট্রিবিউটারদের স্বার্থ দেখতেই হবে আমাকে।

ছবি তৈরি শেষ হয়ে গেল।

এর পরে আর এক দুর্যোগ ঘটলো। একদিন ডাক এল বোম্বাই যাবার। ছবির প্রথম প্রিমিয়ার।

ছবি আরম্ভ হলো শহরের এক নামকরা চিত্রগৃহে। এক সময়ে শেষও হলো। যখন শেষ হলো তখন রাত বারোটা। সকলের মুখই গম্ভীর। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। গাড়ি গিয়ে উঠলো শ্রী কে আসিফের বাড়ি। সেখানে তারাও তখন ছবি দেখে ফিরে এসেছে। তাদের মুখও গম্ভীর। এ ছবি চলবে না। টাকা লোকসান যাবে তাদের যারা টাকা লগ্নী করেছে এ-ছবিতে।

অনেক আলোচনা চললো। কে আসিফ সাহেব বললে—এক কাজ করো গুরু, শেষকালে মিলন দেখিয়ে দাও। ট্র্যাজেডির বদলে কমেডি করো—

—কাদের মিলন?

—স্বামী-স্ত্রীর মিলন। এখনও সময় আছে। চিত্রনাট্য বদলাও। আবার শুটিং করো।

—কী শুটিং করবো?

—শেষ করো এইভাবে: ছোটি বহু মদ ছেড়ে দিলো, সুস্থ হয়ে উঠলো। ছোটবাবু আর ছোটিবহুতে মিলন হয়ে গেল। তারা সুখে ঘর-করনা করতে লাগলো।

কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হলো সকলেরই। হ্যাঁ, আসিফ সাহেব ঠিক বাতই বলেছে। আগে আর্ট না আগে টাকা!

এই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চললো। শেষে যখন রাত তিনটে তখন আবার পালি-হিলে গুরু দত্তর বাড়িতে চলে এলাম সবাই। সে-রাতটুকুর মত বিশ্রাম! কিন্তু মাথায় যখন উদ্বেগ তখন কি ঘুম হয়। ভোর হতে-না হতেই সবাই উঠে পড়েছি।

গুরু দত্ত আমাকে বললে—কী করা যায় বিমলবাবু, আপনার কী মত?

আমি বললাম—আপনার টাকা লোকসান হোক এটা আমি চাই না। আমার 'সাহেব বিবি গোলাম' গল্প এখন সব বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে, আপনার ছবির গল্প যা-ই হোক, আমার বই-এর কোনও ক্ষতি হবে না—এ-গল্প ভারতবর্ষের সব ভাষার সব মানুষের মুখে-মুখে, সুতরাং আপনি যা-ইচ্ছে বদলাতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই। বদনাম হলে আপনারই হবে—

গুরু দত্ত বললে—তাহলে শেষ সিন্‌টার নতুন করে চিত্র-নাট্য লিখুন।

ঠিক আছে। আমিও তৈরি হয়ে নিলাম। আব্‌রার আল্‌ভিকে ডেকে পাঠানো হলো। আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসা হলো। গল্পের শেষের দিকে ছোটবাবু ছোটিবহুর মিলন হবে, সেই ইঙ্গিত দিয়ে ছবি শেষ হবে ঠিক হলো।

গুরু দত্ত বাড়ির ভেতরে ঘুমোতে চলে গেল।

আমি কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে লাগলাম। কিন্তু কী লিখবো? আমি আমার নিজের গড়া চরিত্রকে এমনি করে হত্যা করবো? এত রাত জেগে, এত রক্তপাত করে, এত গালাগালি, এত প্রশংসা, এত সাফল্য, এত অভিসম্পাত, এর পর আমি কিনা নিজেকেই হত্যা করবো? যে-গল্প লিখতে চৌদ্দ বছর

লেগেছে, একটা কলমের আঁচড়ে তা নিঃশেষে মুছে ফেলবো? এরই নাম কি সিনেমা, এরই নাম কি হিন্দী সিনেমা?

পাশের দিকে চেয়ে দেখি আব্‌রার আল্‌ভি ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে কখন আমারই বিছানার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি কাগজ-কলম নিয়ে তখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে বসে আছি। কলম মোটে চলছে না।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে গুরু দত্ত ঘরে ঢুকেছে। আব্‌রার আল্‌ভিও গুরু দত্তর সাড়া পেয়ে উঠে বসলো।

গুরু দত্ত বললে—না বিমলবাবু, ও আমি বদলাবো না। ছবি যা আছে তাই-ই থাকবে, আসিফ যা বলুক, ছবির লোকসান হয় হোক, আমি সর্বস্বান্ত হই, তবু আমার ছবি যেমন আছে তেমন থাকবে। বদলাবোই যদি তাহলে 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর গল্প ছবি করতে গেলাম কেন? অন্য গল্প করলেই পারতুম—না, ও যেমন আছে তেমনি থাক।

আসবার দিন গুরু দত্ত বললে—বিমলবাবু, চলে যাবার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করবো, আপনি জীবনে কখনও সিনেমার গল্প লিখবেন না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন? ও-কথা বলছেন কেন? আমি কি সিনেমার গল্প লিখি?

গুরু দত্ত বললে—না, সে-জন্যে বলছি না, সিনেমার গল্প লেখার কলম আপনার নয়, আপনার কলম উপন্যাস লেখার, সিনেমার গল্প লিখলে আপনার কলম খারাপ হয়ে যাবে।

এ-কথার একজন সাক্ষীই ছিল। সে হচ্ছে গুরু দত্তর স্ত্রী গীতা দত্ত। আজ সে-ও আর নেই। থাকলে সাক্ষ্য দিতে পারতো।

কথাটা শুনে বুঝলাম গুরু দত্ত বোধহয় নিজের সাফল্যে খুবই খুশী হয়েছে।

এর মধ্যে আমার আর একটি গল্পের ছবি হয়ে গেছে। 'বেনারসী' 'বেনারসী আমার একমাত্র গল্প যার ছবির চিত্রনাট্য আমি করিনি বা যা নিয়ে পরিচালক আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি। বা করা প্রয়োজন মনে করেননি।

ইচ্ছে করেই চুক্তি-পত্রে তেমন কোনও শর্ত রাখিনি।

আর চিত্রনাট্য করেছি রবীন্দ্রনাথের গল্প 'কঙ্কালে'র। বিশ্বভারতীর চারু

ভট্টাচার্যের বিশেষ অনুরোধে সে চিত্রনাট্য করতে হয়েছিল। কারণ আগে যিনি চিত্রনাট্য করেছিলেন তা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি বলেই কাজটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল।

১৯৬৫ সালে মুক্তি পেল 'গুলমোহর'। এখানেও ঘটলো সেই শিল্পীবিভ্রাট। 'তানসেনে'র ব্যাপারে যা ঘটেছিল।

এবার এসেছে আমার লেখা-কাহিনীর ছবি "স্ত্রী"। এই "স্ত্রী" ছবি হওয়ার পেছনে একটা কারণ আছে। উত্তমকুমার বহুদিন ধরে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' গল্পটি ছবি করতে চাইছিলেন। আমি একটি বিশেষ কারণে তাঁর সে-অনুরোধ রাখতে পারিনি। আমি সবিনয়ে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, বইটি বেশ মোটা। সকলের এখনও পড়া হয়নি। সিনেমা হলে লোকে পঁচাত্তর পয়সার টিকিট কেটে আড়াই ঘণ্টায় গল্পের সারাংশ জেনে ফেলবে, বইটি পড়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। তাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো। 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবি হওয়ায় পাঠক এবং আমি দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। লাভ হয়েছে কেবল ছবির প্রযোজকের। সেবারে যে-ভুল করেছি এবার আর সে-ভুল করবো না। অগত্যা তখন তিনি এই 'স্ত্রী' গল্পটির জন্যে অনুরোধ জানান।

আরো একটা চিত্রনাট্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে সম্প্রতি ছুটি পেয়েছি। সে ছবি এখনও মুক্তি পায়নি। তার নাম 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন'। আমারই লেখা উপন্যাস। এ-কাহিনীর চিত্রনাট্য করার যে কী দায়িত্ব তা,আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি। ছবির আর্থিক-সাফল্য হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে রসিক মহলের প্রশংসাও পাবে, এই-দুইয়ের সমন্বয় সাধন করতে পারা কি সোজা? একটা ক্লাসিক উপন্যাস লেখা এবং একাধারে তা জনপ্রিয় করার মতই দুঃসাধ্য! এই দুটি চিত্রনাট্য করা সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু না, এখানেই থামা ভালো। এমনিতেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেছে।

আমি লেখক নই

প্রতি বছরই দিল্লীর কালিবাড়ির বন্ধুরা দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন, প্রতিবারই তাঁদের বার্ষিক স্মরণী-পত্রিকার জন্য রচনা চেয়ে পাঠান। আমার নিজেরও প্রতি বছর একটা সং ইচ্ছে থাকে যে দিল্লী যাই, কিংবা একটা বিশেষ কিছু মৌলিক রচনা তাঁদের পত্রিকার জন্যে লিখে পাঠাই। কিন্তু প্রতি বছরই সে সংকল্প শুধু মাত্র সংকল্পই থেকে যায়, সেটা আর কাজে কখনও পরিণত হয় না। এমন কি তাঁদের চিঠির যে একটা জবাব পাঠাবো তাও হয়ে ওঠে না।

চিঠির জবাব না দেওয়া যে একটা অমার্জনীয় অপরাধ তা অন্য সকলের মত আমিও বুঝি। তবু সেই অপরাধই আমি রোজ করি এবং মনে মনে আবার তার জন্যে অনুতাপও করি। কেন যে এ অপরাধ করি তা দূরের বন্ধুদের কখনও জানানোর সুযোগ হয়নি। সেই কারণে তাঁরাও আমাকে মনে মনে দোষারোপ করেন, হয়ত বা অহঙ্কারী বা অর্থলোভী বলে একটা ধারণাও পোষণ করে থাকেন।

কিন্তু সংসারের যে 'কুঁড়ে' বলে এক ধরনের মানুষ থাকে তা জানতে বাকি নেই। আমিও সেই জাতীয় একজন মানুষ। এবং আমি যে সেই 'কুঁড়ে' মানুষদের একজন বাদশাপ্রতিম তা বোধ হয় আমার বাবাই প্রথম আবিষ্কার করেন।

ছোটবেলায় আমার বাবা প্রায়ই বলতেন—এ ছেলেটা একেবারে কুঁড়ের বাদশা, এর দ্বারা কিছু হবে না—

বাবার যে কত দূরদৃষ্টি ছিল আজও তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কারণ বাবার প্রত্যেকটা ভবিষ্যদ্বাণী আজ বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে।

বাবা আরো বলতেন—এত মুখচোরা হলে তুমি জীবনে উন্নতি করবে কী করে ?

উন্নতি যে আমি করতে চাই না, এটা বাবাকে আমি সেদিন বোঝাতে পারিনি। উন্নতি বলতে বাবা বুঝতেন একটা মোটা মাইনের সরকারী

চাকরি, কলকাতায় একটি বাড়ি, তার সঙ্গে একটা গাড়ি। আর সবচেয়ে যেটা উন্নতির বড় লক্ষণ সেটা হলো মোটা রকমের একটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। এই ধরনের উন্নতি না করতে চাওয়াটা ছিল বাবার কাছে একটা মস্ত অপরাধ। আর শুধু আমার বাবাই বা কেন, পৃথিবীর সব বাবারাই বোধহয় ছেলেদের এই ধরনের উন্নতি দেখতে চান।

আমার বাবা আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে সত্যিই আজ আমার এই পরিণতি দেখে মনে মনে খুবই কষ্ট পেতেন। কারণ সত্যিই আমার উন্নতি হয়নি।

প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন আমি বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাস করে আসি। তাঁর এক ছেলে ডাক্তার, এক ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে, আর ছোট ছেলেটা ব্যারিস্টার হোক। এই কথা লোককে বলতেও ভালো, শুনতেও ভালো। কিন্তু আমি তাঁর সেই প্রথম আশাতেই ছাই দিয়েছিলাম। কারণ আমি স্পষ্ট ভাষাতেই সেদিন জানিয়ে দিয়েছিলাম যে উকিল-মোক্তার-ব্যারিস্টার হলেই মিথ্যে ভাষণ করতে। সুতরাং ওটা হওয়া আমার দ্বারা হবে না। বাবা আমার যুক্তি শুনে হতবাক হয়েছিলেন, হতাশায় ক্ষোভে দুঃখে তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—তাহলে তুমি চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্-টেন্সি পড়ো, ও লাইনেও তো শুনেছি অনেক টাকা হয়—

বাবা আমার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাই তাঁকেও বেশি দোষ দেওয়া যায় না। কারণ টাকাটাই যে এ সংসারের বড় হওয়ার সব চেয়ে বড় মাপকাঠি তা তিনি অন্য বাবাদের মত ভালো করেই বুঝতেন। আমি যখন বলেছিলাম যে ও লাইনটাও এক রকমের হিসেবের কারচুপি করে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কায়দা শেখবার কারবার তখন মনে আছে তিনি মনে মনে খুব রেগে গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—তাহলে তুমি বড় হয়ে করবেটা কী?

আমি বলেছিলাম—আমি বাঙলায় এম-এ পড়বো—

—বাঙলায় এম-এ পড়ে কী হবে? ইস্কুল-মাস্টার?

আমি বলেছিলাম—না, আমি লেখক হবো—

বাবা বলেছিলেন—লেখক হবে মানে? লেখক হলেও তো তোমাকে দিনের বেলা একটা বাঁধা মাইনের চাকরি করতে হবে?

আমি বলেছিলাম—না। লেখক মানে লেখক। হোল-টাইমের লেখক,

সেণ্ট্ পার্সেণ্ট লেখক। আমি চাকরি করা পার্ট-টাইমের স্লেভ্-লেখক হতে চাই না।

বাবা আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়েছিলেন। লেখকদের কি লিখে টাকা হয়? লিখে কেউ টাকা করেছে? শরৎ চাটুজ্যের কত টাকা ছিল ব্যাঙ্কে? মাইকেল মধুসূদন তো টাকার অভাবে হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন, তা জানো?

বাবার মুখের ওপর সেদিন আমি এ-কথার সোজা জবাব দিতে পারিনি। বলতে পারিনি যে ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্ক দেখে আমি মানুষের বিচার করি না। ব্যাঙ্কে তো অনেকেরই টাকা থাকে। তারা কি সবাই মানুষ? আর হাসপাতালে মরা? মরতে তো একদিন হবেই, সুতরাং হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় না মরে নিজের বাড়িতে ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে মরার যন্ত্রণা কি কিছু কম?

আজ এতদিন পরে সেই সব পুরোন দিনের কথাগুলো ভাবছি। সত্যিই, বাবার কী দূরদৃষ্টিই না ছিল!

বাবা নিজের যুক্তিকে জোবদার করবার জন্যে প্রায়ই বলতেন—সংসারে বড় হতে গেলে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে হয়, পদস্থ লোকের মনস্তুষ্টি-সাধন করতে হয়। অসত্য হলেও সকলের প্রিয় কথা বলতে হয়, দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করে দশের একজন হয়ে দল বাঁধতে হয়, তবে তো মানুষ বড হয়। তুমি মুখচোরা হলে ও-সব করবে কী করে? তুমি লেখক হবে বলছো, তা ও-লাইনেও নিশ্চয়ই দলাদলি আছে, তোমাকে সম্পাদকের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে হবে, প্রকাশকদের দরজায় ধনা দিতে হবে, যারা প্রাইজ দেয় তাদের বাড়িতে গিয়ে স্তাবকতা করতে হবে—তদ্বির-তদারক ছাড়া নোবেল-প্রাইজও পাওয়া যায় না, তোমার মত মুখচোরা মানুষ কি ওসব পারবে?

আমি বলেছিলাম—আমি ও-সব চাই না—আমি শুধু নিজের বাড়িতে বসে লিখবো—

বাবা বলেছিলেন—তাহলে তোমার কিছুই হবে না—

দিল্লীর বন্ধুরা জানেন কিনা জানি না, যদি না জেনে থাকেন তো তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই যে, সত্যিই আমার কিছুই হয়নি। কোনও দলে যোগ দেওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকায় দলে থাকার সুবিধে থেকে যেমন আমি বঞ্চিত হয়েছি তেমনি দলের বাইরে থাকার অসুবিধেটাও আমি পুরো মাত্রায়

ভোগ করে আসছি। কিন্তু আত্মাভিমান প্রকাশের আশঙ্কা থাকলেও এ-কথা জানানো ভালো যে পাঠক-পাঠিকার চাহিদার যোগান দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের যে পথটি প্রত্যেক সাহিত্যিকের সামনে উন্মুক্ত থাকে, নিজের প্রতিষ্ঠার খাতিরে বা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সেই সহজতম পথটি বেছে নেবার ভুল আমি কখনও করিনি। কিংবা জনপ্রিয়তা বজায় রাখবার জন্যে সত্যভাষণের ছদ্মবেশ পরে অপ্রিয় ভাষণের দায় কখনও সুকৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও করিনি।

আর একটা কথা। আজ যা আধুনিক কাল তা প্রাচীন। আবার কাল যা আধুনিক পরশু তা প্রাচীন। কিন্তু শাশ্বতের দৃষ্টিতে আধুনিক-প্রাচীন সব সংজ্ঞাই অর্থহীন। শাশ্বত কথাটি বড় গোলমেলে। বহু-ব্যবহারে এখন ওর আসল সংজ্ঞাটি ভোঁতা হয়ে এসেছে। আধুনিক আকাশ, আধুনিক সমুদ্রের মত আধুনিক সাহিত্য কথাটাও কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতই অবাস্তব। আরো সহজ করে বললে বলতে হয় যে আধুনিকের বড়াই যতটা না গুণবাচক তার চেয়ে বেশি কালবাচক। যে-বস্তু ক্ষণভঙ্গুর তা নিয়ে মহাকালের মাথাব্যথা নেই। আমি তাই আমার লেখায় সেই ক্ষণকালটার বদলে চিরকালকেই বরাবর বন্দনা করে এসেছি।

তবে যে চারদিকের এত পত্র-পত্রিকায় আমার এত রাশি-রাশি লেখা দেখতে পান তার কারণ এই নয় যে আমি লেখক। তার একমাত্র কারণ হলো আমার লেখা ছাপালে-পত্র পত্রিকার বিক্রি বাড়ে। আর বিক্রি বাড়লেই তাঁদের অর্থাগম। প্রকাশকদের বেলাতেও তাই। প্রকাশকরা যে আমার বই ছাপাবার জন্যে এত কাড়াকাড়ি এত হুড়োহুড়ি করেন তার কারণও ওই। আমার বই ছাপলে প্রকাশকদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বাড়ে। সেইজন্যেই সুদূর কেরল, মহীশূর, ওড়িষ্যা, এলাহাবাদ, বোম্বাই, জয়পুর, দিল্লী থেকে প্রকাশকরা এসে নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে আমার বই প্রকাশ করবার অনুমতি নিয়ে যান। উদ্দেশ্য সেই একই, পয়সা কামানো। কিন্তু লেখক বলে তাঁরা কি আমাকে কেউ স্বীকার করেন?

আমার লেখক জীবনে আমিই তাই আমার চরমতম শত্রু। আর সেই শত্রুতার শ্রেষ্ঠ সহায়ক হলো আমার জনপ্রিয়তা। এত জনপ্রিয় না হলে হয়ত এতদিনে আমি লেখক পদবাচ্য হতাম।

এখন তাই ভাবি বাবা যে বলতেন আমার মতো মুখচোরা মানুষের কিছুই হবে না তা ঠিকই বলতেন। সত্যিই আমার কিছু হয়নি। অবশ্য তা নিয়ে

লেখককে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু মনে হয় অনুকূল পরিবেশের চেয়ে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই বোধকরি আমার একাগ্রতার তীব্রতা বৃদ্ধি লাভ করে। মনে আছে উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হবার কালে যখন "দেশ" পত্রিকার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো তখন পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকেও এই মর্মে চিঠি আসতে লাগলো যেন এই উপন্যাস কখনও কোনওকালে শেষ না হয়। অর্থাৎ তাঁদের ভালো লাগায় যেন কখনও ছেদ না ঘটে! বইটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার সময়েই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের অনুমতির জন্যে অনুরোধ আসতে থাকে। ভারতের বাইরে পাকিস্তানে উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ ত্রৈমাসিক লাহোরের "নুকুশ' পত্রিকায়, এবং ভারতের ভেতরে মালয়ালাম ভাষায় কেরালার "জনযুগম্" সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দী ভাষায় গ্রন্থটি দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়ে অভূতপূর্ব আন্দোলনের আকার ধারণ করে। তখনকার দিনে যে-কোনও ভাষার পক্ষে যে-কোনও একটি উপন্যাস-এর দাম ৪২ টাকা ৫০ পয়সা দুর্মূল্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দী ভাষা-ভাষীদের কাছে বইটি অভূতপূর্ব সমাদর অর্জন করে। মনে আছে সেই সময়ে অনেক অপরিচিত পাঠক সশরীরে আমার বাড়িতে এসে খবর নিতেন আমি দিনে-রাত্রে কখনও ঘুমোই কি না। এ হেন গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হলো তখন পাঠক সাধারণের মধ্যে অন্তহীন কৌতূহলের সঙ্গে একটি প্রশ্নই ধ্বনিত হতে লাগলো—সেটা এই যে এই ব্যস্ততার যুগেও এমন এপিক উপন্যাস লেখা সম্ভব হলো কেমন করে! প্রকাশক "মিত্র ও ঘোষ" পাঠক-সাধারণের সেই কৌতূহল নিরসনকল্পে একটি বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং সেই পুস্তিকাটি দশ সহস্র কপি ছাপিয়ে পাঠকদের কাছে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। এই উপন্যাস আয়তনের দিক দিয়ে যে-কোন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে বৃহত্তম। পরে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Amrita Bazar Patrika, Puja special—1964-এ "Recent Trends in Bengali Literature" শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেন—"...Bimal Mitra's encyclopaedic novel "Karhi Diye Kinlam" (1962) sums up the complexities and unsolved riddles of modern life in a representative individual character and studies life against the background of an ever-widening environment. This is truly a novel with

a third dimension that packs up the meaning of the lives of all classes of people and events of far-reaching magnitude into the life of a single individual···This is a book which has an intellectual appeal not exhausted at the first reading of the story. With this novel, modern Bengali fiction may be said to have stepped into a new sense of life-values or a new world of cosmic proportions···"। এই তো গেল সমালোচকের কথা। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমার নিজের কথা এখন বলি। বলি, কেন এবং কেমন করে এ-বই লিখেছিলাম। তবে স্বামী স্ত্রী দু'জন জীবিত থাকতে যেমন তাঁদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে সত্য কথা বলা বিপজ্জনক, লেখকের নিজের লেখা সম্বন্ধেও ঠিক তাই। লেখকের জীবিতাবস্থায় তাঁর লেখা ভাল কিংবা মন্দ বলা চলে কিন্তু সে-সম্বন্ধে সত্য কথা বলা চলে না। আজ পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে তা কখনো ঘটে নি। সুতরাং সে চেষ্টা করবো না। তবে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' লেখাকালীন যে-সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা এখন এই তেরো বছর পরে বললে বোধ-করি অন্যায় হবে না। আমার অবর্তমানে অন্য কেউ সে চেষ্টা করলে তা অনুমান বলে গ্রাহ্য হতে পারে কিন্তু কোনওদিনই তা প্রমাণ বলে স্বীকৃত হবে না। তাই আমি এখানে এই গ্রন্থ রচনার উৎস ও রচনাকালীন যন্ত্রণা এবং তার আনুষঙ্গিক ইতিবৃত্তের অবতারণা করি।

সতেরো শ উননব্বই সালে কবে একদিন ফ্রান্সে এক বিপ্লব হয়েছিল। তার স্মৃতি যেন লোকে তখন ভুলতে বসেছে। টাটকা মনে আছে উনিশ'শ চৌদ্দ সালের বিশ্বযুদ্ধটার কথা। কিন্তু তখনও লুই-দ্য ফোর্টিন্থ্ আর ম্যাডাম-দু-ব্যারিরা পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি। তাদের কেউ বসেছে ইংলণ্ডের সিংহাসনে, কেউ জার্মানীতে, কেউ আমেরিকায়, আর কেউ বা ফ্রান্স-এ। সেই Liberty, Equality আর Fraternity-র বাণী তখন আর কারো কানে ঢোকে না। কে একজন বলেছিল—That government is best which governs not at all. সেকথাও আর তখন কানে ঢুকছে না কারো। দেখতে দেখতে পৃথিবীর কুরুক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে একদিন শেষও হয়ে গেল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অপমৃত্যু দিয়েও মানুষ তাদের চাওয়া গভর্নমেন্ট পেলে না। শ্রমিকেরা তাদের শৃঙ্খল ভাঙতে পারে নি তখনও। মানুষের সংসারের লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ঘর থেকে। ইণ্ডিয়ার

টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, আমেরিকার ডলার, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জার্মানীর মার্ক, রাশিয়ার রুবল, ইটালীর লীরা, জাপানের ইয়েন, সকলকে ট্যারিফ বোর্ডের চাবি দিয়ে সেফডিপোজিট্ ভল্টে আটকে রাখবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তবু কোথাও স্ট্রাইক বন্ধ হচ্ছে না, হরতাল বন্ধ হচ্ছে না, অসন্তোষ থামছে না। দিন দিন সায়েন্স আর ইন্ডাষ্ট্রি কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে আর মানুষের সমাজ স্থাণুর মত হতভম্ব হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাই দেখছে আর বাঁচবার পথ খুঁজে মাথা কুটে মরছে।

ঠিক এই সময়ে মানুষের ঘরে একটা নতুন নাম জন্মাল। সে দীপঙ্কর। জন্ম তো হলো। কিন্তু তার পর?

তারপর আমার কথা বলি।

তারপর পলে-পলে অপমান, অত্যাচার আর অপমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি বড় হতে লাগলাম। দেখলাম আমার চারদিকে শুধু ঘৃণা, শুধু লজ্জা, শুধু কলঙ্ক, শুধু ভয়। দেখলাম অঘোরদাদুকে, চন্নুনীকে, লক্ষ্মকে, লোটনকে, ছিটেফোঁটাকে, ভুনিকাকাকে, আর তাদের মত অসংখ্য মানুষকে, যারা ন্যায়-অন্যায়ের বালাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। যারা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয় সত্যকে, ধর্মকে আর সুন্দরকে। যারা এক ফুঁ-এ চিরকালের সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে দিয়ে মহা-আরামে দিন কাটিয়ে দেয়। অথচ এই সংসারে তাদেরই পাশাপাশি দেখলাম প্রাণমথবাবুকে, সতীকে, দাতারবাবুকে। দেখলাম আরো অনেকের সঙ্গে সনাতনবাবুকেও। কিন্তু মানুষের লেখা পুঁথির সঙ্গে সেই সব মানুষদের জীবনকে যাচাই করতে গিয়ে মুশকিলে পড়লাম। ১৭৮৯ সালের ফরাসী দেশেও ঠিক এমনি অবস্থা ছিল একদিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই পৃথিবীতে যন্ত্র-সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও আর এক নতুন সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল। সেদিন সেখানকার অবস্থাও ছিল ঠিক এখানকার মত। সেখানকার অঘোর-দাদুরাও ঠিক এমনি করে ঠাকুরের নৈবেদ্য চুরি করে যজমান ঠকাতো। সেখানকার চন্নুনীরাও লেখাপড়া শিখতে না পেরে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে জীবন কাটাত। সেখানেও ছিল ভুনিকাকা, সেখানেও দিল পঞ্চাদা, ছোনেদা, মধুসূদনের বড়দা। সেখানে সেই ফরাসীদেশেও ছিল কালীঘাটের মতন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন। সেখানকার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনেও রোদ ঢুকত না, শিক্ষা ঢুকত না, সভ্যতা ঢুকত না সেদিন। সি-আর-দাস মারা যাবার দিন সেখানেও সবাই নির্বিকার হয়ে আড্ডা দিত। হুজুগের দিন চরকা কাটত আবার হুজুগ চলে

গেলে চরকা ফেলে দিত। সেখানেও লক্ষ্মীদের মত মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে দীপঙ্করের মত ছোট ছেলেদের ধরে চকোলেট দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শম্ভুদের কাছে প্রেম-পত্র পাঠাত। সেখানেও কিরণরা রাস্তায় রাস্তায় হাতে-কাটা পৈতে বিক্রি করত আর দীপঙ্করের মায়েরা পরের বাড়িতে রান্না করত আর ছেলে মানুষ করার স্বপ্ন দেখত। আর সেখানেও যারা বড়লোক, যারা ব্যারিস্টার পালিতের মতন বড়লোক, যারা অঘোরদাদুর যজমানদের মত বড়লোক, সেই 'লথার মাঠে'র একাদশী বাঁড়ুজ্জে আর চাউলপটির শশধর চাটুজ্জের দল কড়ি দিয়ে সব কিনে ফেলত—পাপ কিনত, পুণ্য কিনত, ধর্ম কিনত, অধর্ম কিনত। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যশ সম্মান কীর্তি অমরত্ব সব কিনে ফেলত!

এই সব পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যেত দীপঙ্কর। কোথাও কোনও নিয়ম পেত না, কোথাও কোনও ফরমূলা পেত না। চিরকাল কি এমনিই চলবে? এমনি অনাচার আর এমনি অরাজকতা? তিন শো বছর আগেকার লেখা বই-এর পাতাতেও দেখলাম Babeuf (বাবাফ্) লিখছেন, "When I see the poor without the clothing and without the shoes which they themselves are engaged in making, and contemplate the small minority who do not work and yet want for nothing, I am convinced that Goverment is still the old conspiracy of the few against the many, only it takes a new form."

সেদিন হাজরা রোডের মোড়ে হঠাৎ অমলবাবুর সঙ্গে দেখা।

আশুতোষ কলেজের হিস্ট্রির প্রফেসর অমল রায়চৌধুরী। লম্বা-চওড়া চেহারা। হিস্ট্রিও যে উপন্যাসের মত উপাদেয় হতে পারে তা অমলবাবুর লেক্‌চার শুনেই বুঝেছিলাম। নানা কলেজের ছাত্ররা আশুতোষ কলেজে আসত তাঁর লেক্‌চার শুনতে। কিন্তু আমাকে তিনি চিনতে পারলেন না।

বললেন—তুমি কে? কোন্ ইয়ারে পড়? তোমার নাম কী?

সব বললাম। তারপরে বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার?

বললেন—কী?

শেষ পর্যন্ত কথাটা বলেই ফেললাম। কয়েকদিন আগের কথা। ক্লাসে সোক্রেটিসের কথা পড়াচ্ছিলেন। পড়াতে পড়াতে বললেন সোক্রেটিসের একটা কথা। সোক্রেটিস বলেছিলেন—Be hopeful then, gentlemen of the jury, as to death; and this one thing hold fast that to a

good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being. কথাটার মানে সেদিন ক্লাসে বুঝতে পারিনি। দাঁড়িয়ে উঠে মানে জিজ্ঞেস করতেও পারিনি সঙ্কোচে। ক্লাসের অন্য সবাই কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছিল কিনা তাও জানি না। তাই রাস্তায় দেখা হতেই সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম—কথাটার মানে কী? অর্থাৎ কথাটা কতদূর সত্যি?

অমলবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় থাকো তুমি? ম্যাট্রিকে রেজাল্ট কী হয়েছিল তোমার?

সব প্রশ্নেরই তাঁর উত্তর দিলাম। তারপর বললাম—আপনি হয়তো এখন খুব ব্যস্ত আছেন স্যার, আমি পরে আর একদিন দেখা করব!

বলে চলে আসছিলাম। কিন্তু অমলবাবু থামিয়ে দিলেন। বললেন—না, দাঁড়াও, তুমি একটা কাজ করো, আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে একবার দেখা কোর।

—কখন স্যার?

—যখন ইচ্ছে—বলে অমলবাবু চলে যাচ্ছিলেন। আমিও চলে আসছিলাম।

হঠাৎ যেতে যেতে অমলবাবু আবাব ফিরলেন। বললেন—দেখা কোর ঠিক, বুঝলে?

বললাম—করব স্যার।

কিন্তু যাব-যাব করেও আর বহুদিন অমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সাহস হয়নি। ক্লাসের মধ্যে বই-এর ওপর মুখ দিয়েই পড়িয়ে যেতেন। কারোর দিকেই চেয়ে দেখতেন না। কিন্তু সেদিন সব দ্বিধা-সঙ্কোচ এড়িয়ে তাঁর লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তিনি তখন ফোর্থ-ইয়ার ক্লাস শেষ করে এসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। সেই সময়ে দরজার কাছে গিয়ে বললাম—স্যার!

বললেন—কী চাও?

বললাম। সব কথা তাঁকে মনে পড়িয়ে দিলাম। কথাটা শুনে তিনি আমার আপাদ-মস্তক আবার ভাল করে দেখে নিলেন। বললেন—মনে পড়েছে, কিন্তু এতদিন কলেজে পড়াচ্ছি, তোমার মত আগে কেউ আমাকে এ-প্রশ্ন তো করেনি! তা, তুমি এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাও, না ইকনমিক ব্যাখ্যা চাও?

আমি চুপ করে রইলাম।

অমলবাবু বললেন—বুঝেছি, তবে শোন—

বলে তিনি আরম্ভ করলেন বোঝাতে। অনেকদিন আগেকার ঘটনা। সেদিন সেই লাইব্রেরীর অন্ধকার ঘরে বসে অমলবাবু যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা আমার আজো মনে আছে। আজ সেই পুরোন আশুতোষ কলেজও নেই, সেই বিল্ডিংটাও নেই। তার জায়গায় নতুন কলেজ হয়েছে, নতুন বিল্ডিং। কিন্তু কথাগুলো মনে আছে।

সে দক্ষিণেশ্বরের কথা। পরমহংসদেব তখন বেঁচে। এগারো শ ক্রোশ দূর থেকে এক সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। সাধু হীরাচাঁদ। এসে স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বলুন তো, ভক্তের এত দুঃখ কেন?

বিবেকানন্দ বললেন—The scheme of the universe is devilish, I could have created a better world.

সাধু আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা দুঃখ না থাকলে সুখ বুঝবো কী করে?

তখন বিবেকানন্দ বললেন—Our only refuge is in Pantheism—ভক্ত আর ভগবান সবই এক, এই বিশ্বাসটুকু হলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়—অর্থাৎ আমিই সব করছি, এই বিশ্বাস—

গল্পটা বলে অমলবাবু একটু থামলেন। তারপর বললেন—আমি ইতিহাস পড়াই, ইতিহাসেরও একটা দিক আছে, ভারি ইম্পর্ট্যাণ্ট দিক, সেটা শোন—এ তার অনেক পরের ঘটনা। উনিশ শো পাঁচ সালের কথা। একদিন কয়েক হাজার লোক সবিনয়ে এক দেশের রাজার প্রাসাদের সামনে গিয়ে দরবার করলে। গেটের সামনে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল সেপাই-সান্ত্রী। তারা জিজ্ঞেস করলে—কী চাই তোমাদের?

লোকেরা বললে—হুজুরের কাছে আমরা একটা দরখাস্ত পাঠাতে চাই—

দরখাস্তখানা সেপাইটা রাজার কাছে নিয়ে গেল। অতি বিনীত দরখাস্ত। দরখাস্তে লেখা ছিল: "We come to thee sire, to seek truth and redress. We have been oppressed; we are not recognised as human beings, we are treated as salves, who must suffer their bitter fate and keep silence. The limit of patience has arrived. Sire, is this in accordance with the divine law by the grace of which thou reignest? Is it not

better to die, better for all the people, and let the capitalists, the exploiters of the working class live? Do not refuse assistance to thy people. Destroy the wall bewteen thyself and thy people and let them rule the country with thyself."

দরখাস্তখানা পাঠাবার খানিক পরেই এক কাণ্ড হলো। ওপরের বারান্দা থেকে বলা-নেই-কওয়া-নেই, তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলতে লাগলো, গুলির ওপর গুলি। সেই হাজার হাজার নিরীহ লোকের ওপর লক্ষ লক্ষ গুলির ঝাঁক এসে পড়তে লাগল। হাজারে হাজারে মরে পড়ল লোক, তারা কাত্‌রাতে লাগল, ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল যন্ত্রণায়—

আর মজা এই, ঠিক তার বারো বছর পরে ঠিক সেই বারান্দা থেকেই ১৯১৭ সালে একদিন আর একজন লোক হাজার হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন—Comrades, feeding people is a simple task. We will take from the rich and give to the poor. Take milk from the rich and give to the children of workers. He who does not work shall not eat. Workers will receive cards. Cards will bring food.

আরো অনেক কথা বলেছিলেন অমলবাবু। সব ভালো বুঝতে পারিনি। বেশি সময়ও ছিল না। ক্লাসের ঘণ্টা পড়তেই অমলবাবু চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন—পরে তোমাকে এ-সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলব।

কিন্তু তখন কি জানতাম সেই অমলবাবু অত শিগ্‌গির চলে যাবেন! কিন্তু পরে আর একদিন মাত্র এ-বিষয়ে কথা হয়েছিল অমলবাবুর সঙ্গে। ক্লাসের মধ্যে চুপ করে বসেছিলাম এক কোণে।

—রোল নাম্বার সিক্স্‌, রোল নাম্বার সিক্স—

দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—ইয়েস স্যার—

অমলবাবু হঠাৎ বললেন—তুমি তোমার সেই কোশ্চেনের উত্তর পেয়েছ?

বললাম—এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার—

অমলবাবু বললেন—পাবে পাবে, এর উত্তর কারো কাছে জিজ্ঞেস করে পাওয়া যায় না, এর উত্তর জীবন দিয়ে পেতে হয়, জীবন দিয়ে সন্ধান করলে তবে এর উত্তর পাবে তুমি—

১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় দীপঙ্কর সেই যাত্রা শুরু করল। আরম্ভ হলো সন্ধান। মানুষের মহাযাত্রার মিছিলে মিশে গেল নগণ্য একটি গ্রামের ছেলে। ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, সাহেব মেম-সাহেব—কলকাতার তাবৎ জনসাধারণ। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে শুরু করে একে-বারে কালীঘাটের ডাস্ট্‌বিন পর্যন্ত পরিক্রমা শুরু হলো তার। কেউ তাকে ভালবাসল, কেউ ঘৃণা করল, কেউ আঘাত দিলে, কেউ আনন্দ। কিন্তু দিনে দিনে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায়, প্রতিমুহূর্তের অনুভাবনায় দীপঙ্কর তখন মানুষ হয়ে উঠছে আর মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকটি মানুষকে একে একে তার মনের তালুকদারির সমস্ত স্বত্ব উপস্বত্ব সুস্থ চিত্তে বহাল-তবিয়তে দান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো সে। সর্বরিক্ত হয়ে দীপঙ্কর তার সর্বস্ব নিবেদনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে!

কিন্তু আমি মুক্তি পাইনি। দীপঙ্করের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি তখন। দীপঙ্করের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিক্রমা চলছে তখন স্বর্গ-মর্ত্য-ভুবন। রাত্রে ঘুম নেই। সারা পৃথিবী যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আমি আর আমার বাড়ির সামনের বার্লি-ফ্যাক্টরিটা জেগে আছি। জেগে-জেগে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছি। মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। আমিও দীপঙ্করের সঙ্গে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, প্যালেস-কোর্ট আর গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এ ঘোরা-ফেরা করছি। চোখের সামনে সব ঝাপ্‌সা দেখছি। সব অন্ধকার!

বাড়ির ডাক্তার কানাইলাল সরকার। কানাই বললে—ডাক্তার নীহার মুন্সীকে একবার দেখাও তুমি চোখটা।

জিজ্ঞেস করলাম—কত নেবেন তিনি?

ডাক্তার বললেন—মস্ত বড় ডাক্তার, দুদিন দেখাতে হবে, ষোল ষোল—বত্রিশ টাকা—

বত্রিশ টাকা! বত্রিশ টাকার দাম তখন আমার কাছে অনেক। কিন্তু চোখ যদি অন্ধ হয়ে যায়? দেখবো কী দিয়ে? লিখবো কী করে? শেষ পর্যন্ত বত্রিশটা টাকা পকেটে নিয়ে আগের থেকে দরখাস্ত দিয়ে দিন-ক্ষণ স্থির করে গিয়ে হাজির হলাম তাঁর গরচা লেনের বাড়িতে। বহু লোক বাইরে অপেক্ষা করছেন তখন। ভেতরের ঘরে তিনি রোগী দেখছেন। তাঁর পরিচারককে একটা স্লিপে নাম লিখে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললাম। ভয়ে ভয়ে বাইরে

অপেক্ষা করছি। হঠাৎ তিনি বাইরে এলেন সশরীরে। একেবারে নমস্কারের ভঙ্গি। বললেন—আমার বহু সৌভাগ্য—

আমি তো অবাক! সৌভাগ্য আমার না তাঁর!

যাহোক, পরীক্ষা করতে শুরু করলেন তিনি। প্রায় আধঘণ্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা।

শেষকালে চলে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম—কত দিতে হবে?

—কিছু না।

আমি আরো অবাক! এমন কথা আগে কখনও শুনিনি কোনও ডাক্তারের মুখে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তখনও। আমার হতভম্ব দৃষ্টির দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন—তার চেয়ে বরং আপনার একটা বই আমাকে দেবেন, সেইটেই আমি বেশি দামী বলে মনে করবো!

তার পর ১৯৬২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীতে একদিন শেষ হলো কড়ি দিয়ে কেনা। নিন্দা-স্তুতি মিশ্রিত অজস্র অসংখ্য চিঠিপত্র। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ থেকে সহস্রাধিক পত্রাঘাত। কিন্তু আমাকে তা স্পর্শ করেনি। কারণ আমি তখন বোম্বাইতে নির্জন নিরিবিলিতে নিবিষ্ট। আমি জানতে পারিনি, জানতে চাইওনি কড়ি দিয়ে কী কিনলাম, আর কী কিনলাম না। 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষ একটি চিঠিতে লিখলেন, "গতকাল 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', ১ম খণ্ড, হস্তগত হলো। বইটা হাতে নিয়ে অনুভব করলাম কী বিরাট কীর্তি আর কী অসাধ্য-সাধনই না করেছেন। এর পর আছে দ্বিতীয় খণ্ড। প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি আসছে, আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অকুণ্ঠ অভিনন্দন। পাঠকদের যে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে এই অগণিত চিঠিই তার প্রমাণ!"

কলকাতায় ফিরে এসে চিঠিগুলো পড়লাম। যাঁরা এই উপন্যাস পড়ে আমাকে পত্রযোগে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তখন তাঁদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আজকে এত দিন পরে এই সুযোগে তাঁদের প্রত্যেককে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ উপন্যাস যাঁদের ভাল লেগেছে সে তাঁদেরই মহত্ত্ব, আমার কেবল সৌভাগ্য! আমার এই সাহিত্যার্ঘের বিনিময়ে মাত্র সেইটুকুই আমার প্রাপ্য।

কিন্তু এবার এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছু না লিখলে এ-ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই তেরো বছরে অনেক স্মৃতি যেমন

কালের অতলগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে, তেমনি কিছু সঞ্চয়ও মনের কোণে জমা পড়েছে।

মনে আছে এই বই প্রকাশকালে একজন শ্রদ্ধেয় অগ্রজ লেখক আমার এই গ্রন্থের প্রকাশককে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন— তুমি 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাপছো বটে কিন্তু এ-বই পাঁচশো কপির বেশি বিক্রি হবে না—

কিন্তু তাতেই তিনি নিবৃত্ত হননি। যখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যেয় পরিণত হলো তখন তিনি 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে এই উপন্যাসের অসারতা প্রমাণ করবার জন্যে একটি অপব্যাখ্যাসূচক প্রবন্ধ লেখার কষ্ট স্বীকার করে আমাকে বিব্রত করতে প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন।

একজন সহযোগী সাহিত্যিক সেই একই 'অমৃত' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে তিনি নিজে লিখলে এই দু'হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাসকে আড়াইশো পাতার মধ্যে সঙ্কুচিত করে লিখতে পারতেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের এক মুমূর্ষু রোগী আমাকে পত্রযোগে জানিয়েছিলেন যে আমার এই বই পড়ে তিনি রোগ-যন্ত্রণা ভুলতে পেরেছেন।

সম্প্রতি নাগপুরে থাকার সময় এক বিখ্যাত প্রবীণ ডাক্তার (ডাঃ ব্যানার্জি) আমাকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর এক অনিদ্রা-গ্রস্ত রোগীকে তিনি প্রতিদিন তীব্র ওষুধ (পেথিড্রিন) ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াতে যেতেন। কিন্তু একদিন রোগীটি আর ইনজেকশান নিতে অস্বীকার করায় তার কারণ জানতে চাওয়ার জবাবে জানতে পারেন যে হিন্দী ভাষায় 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' পড়তে আরম্ভ করার পর রোগীটির ঘুমের ওষুধের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। তার অনিদ্রা রোগ দূর হয়েছে।

কেরলের একজন কথক শ্রীভি শম্ভুশিবন্ 'মালায়ালী' ভাষায় এই উপন্যাসের কাহিনী কথকতা করে এখনও সেখানকার শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে চলেছেন।

এ-রকম আরো অসংখ্য ঘটনা আছে।

কিন্তু এই ঘটনাগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ। এত তুচ্ছ যে তা হয়ত বা উল্লেখেরও যোগ্য নয়। তবে এ-সম্বন্ধে আমার বিনীত বক্তব্য এই যে তেরো বছরের দীর্ঘ পরিধিতে এই নিন্দা-প্রশংসা-কুৎসা-কটূক্তি-শ্রদ্ধা-আশীর্বাদ-সম্মান সব মিলিয়ে যা কিছু পেয়েছি সমস্তই আমি নত-মস্তকে গ্রহণ করেছি। যা আমার প্রাপ্য তাও গ্রহণ করেছি এবং যা আমার প্রাপ্য নয় তাও গ্রহণ করতে আমি কখনও

অস্বীকার করিনি। আসলে যে-সমাজে মানুষকে সম্মান পেতে গেলে নিজের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তা পেতে হয় সে-সমাজ আমার কাছে সম্মানীয় নয়। তাই প্রয়োজন-বোধে এই উপন্যাসের মধ্যে আমি সেই সমাজকে অনেক স্থানে আঘাত দিয়েছি। আঘাত দিয়েছি বটে কিন্তু তদজনিত আঘাত পেয়েছিও আমি অনেক। আমার রচনায় অনেক দোষ-ত্রুটি আছে, এবং সেগুলি রসের বিচারে কতখানি দোষাবহ তাও আমার অপরিজ্ঞাত নয়। এই তেরো বছরের নিন্দা-স্তুতির জঞ্জাল আজ আমার মানসিকতাকে এমন এক স্তরে নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যেখানে এই সম্পদগুলি একান্তই আমার নিজস্ব বলে দাবী করবার আর উপায় নেই। বলতে গেলে পরোক্ষভাবে এর সমস্ত দায়ই এখন পাঠক-সম্প্রদায়ের।

আজকাল আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষতা একটি বিশেষ ধরনের কূটনীতি বলে স্বীকৃত, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে এটি চিরকাল ধরেই একটি অপরিহার্য এবং অবশ্যপালনীয় ধর্ম বলে পালিত হয়ে আসছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই জাতীয় একজন জোটনিরপেক্ষ লেখক। আর সেই কারণেই আমার সাহিত্য-নীতি কখনও অপরের মতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি এবং আমার সাহিত্য-যাত্রার পথ সেই কারণেই এত বাধা-বিঘ্নিত ও এত কুৎসা-কণ্টকিত। এবং সেই একই কারণে এই 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' একাধারে এত বহু-নিন্দিত ও এত বহু-প্রশংসিত।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শেষ করি। তিনি লিখেছেন—"যে-সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন। যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয় সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি-সম্মানের ভাগ-বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য। সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া কেহ গায়ে ধুলা দেয় তবে সেই ধুলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া কেহ গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সংবর্ধনা।" তিনি আরো লিখেছেন—"যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই তাহা কখনও অমোঘ বলে কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।"

আজ এই উপন্যাস-এর ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকা মাত্র এই বলেই শেষ করি যে আমার এই 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' অবহেলায় রচিত নয়।

গল্প লেখার গল্প

আজকে এমন এক বিষয়ের ওপর আমাকে বলতে বলা হয়েছে যে-সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে কিনা জানি না। এই কলকাতা শহরে তো অনেক ডাক্তার আছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই কি চিকিৎসাবিদ্‌? তেমনি যাঁরা ওকালতি করেন, যাঁরা ওকালতি করে প্রচুর ধন-সম্পত্তি করেছেন, গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছেন, তাঁরা কি সবাই-ই আইন বিশারদ?

আমি গল্প লিখে থাকি বলেই যে গল্প-লেখা সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ এ-কথা কেউ কি মানবেন? আর তা ছাড়া এ-ও হতে পারে যে জীবনের অন্য কোনও ক্ষেত্রে সুবিধে করতে না পেরে হয়ত অগতির গতি হিসেবেই গল্প-লেখার পেশা গ্রহণ করেছি। কিংবা এও হতে পারে যে পত্রিকায় নাম ছাপিয়ে আত্মপ্রচারের দুর্বার মোহ থেকেই আমার এই প্রবৃত্তি।

সব কিছুই হতে পারে।

তবু এ-কথা বলতেই হবে যে যখন কিছু-কিছু গল্প আমার নামাঙ্কিত হয়ে পত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তা যত ছাই-পাঁশই হোক, তখন এক অর্থে আমিও একজন গল্প-লেখক! বোধ হয় সেই কারণেই আমাকে এই আসরে ডাকা হয়েছে।

যা হোক, গৌরচন্দ্রিকা থাক, আসল প্রশ্ন হলো কী ভাবে এই গল্পের সৃষ্টি হয়! সেই প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করি।

এখানে একটা উপমার সাহায্য নিতে হবে। সকলেই জানেন, সংসার-ধর্ম পালন করতে গেলে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন কিছু খাদ্যবস্তুর কাঁচা উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। কারণ তা না হলে সংসার চলে না।

গল্প লেখার বেলাতেও তাই। গল্প হলো মনের খোরাক। তাই গল্প-সাহিত্য না পড়লে আমাদের জীবনও অচল হয়ে পড়ে। তা সে মহাভারতের বা উপনিষদের গল্পই হোক আর নয় তো কথা-সরিৎ-সাগরের গল্পই হোক। সেই মানুষের মনের খোরাক জোগাবার জন্যেও আমাদের গল্পকারদের কিছু কাঁচা

উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। ছোটবেলা থেকে মানুষের আর মানুষের সমাজের সঙ্গে মিশে কখনও আনন্দ আবার কখনও বা আঘাত পেয়ে পেয়ে প্রত্যেক ় একটা বিশিষ্ট স্বভাব গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে যাদের দেখার প্রবণতা বেশি তারা পরবর্তী জীবনে হয় বৈজ্ঞানিক, যাদের ভাবার প্রবণতা বেশি তারা হয় দার্শনিক-প্রকৃতির। কিন্তু যারা একাধারে ভাবেও বেশি, দেখেও বেশি, অর্থাৎ জীবনের সমস্ত দিকেই যাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং জীবনের আর জগতের সমস্ত কিছুই যাদের চিন্তাকে আকৃষ্ট করে তারাই হয়ে ওঠে লেখক। তাই একমাত্র লেখককেই বলা হয় টোট্যালম্যান। অর্থাৎ সর্বাত্মক মানুষ।

পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত সাহিত্যিকরাই সেই অর্থে এই টোট্যালম্যান।

তাঁদের উপকরণ সংগ্রহের ইতিবৃত্ত অনেকেই পড়েছেন। তাঁরা কেমন করে তাঁদের গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং কেমন করে কী শিল্প-কৌশলে তা রসবস্তুতে পরিণত করেছেন তা সবিস্তারে নানাগ্রন্থে লেখা আছে। তাতে দেখা গেছে যে এই গল্প-সৃষ্টির কৃতিত্বের সবটুকু নির্ভর করে লেখক-বিশেষের বলিষ্ঠ কল্পনা আর অনলস অনুশীলনের ওপর। অনুশীলনের দ্বারাই বোঝা যায় কোন্‌টা বাইরের জিনিস আর কোন্‌টা অন্তরের, কোন্‌টা চিরকালের আর কোন্‌টা ক্ষণকালের আর কোন্‌টাই বা শুধু চোখের আর কোন্‌টাই বা কেবল মনের! তখন শুরু হয় যাচাই-বাছাই। অর্থাৎ সাধুভাষায় যাকে বলা যায় গ্রহণ-বর্জন। এই যাচাই-বাছাই বা গ্রহণ-বর্জনের সমন্বয় সাধনের ওপরেই নির্ভর করে গল্পের সার্থকতা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন গল্পলেখক তখন আর আমি প্রত্যক্ষ-সংসারের আমি নই। আমাকে তখন ভাবতে হয় আমার বাস্তব অস্তিত্বকে অতিক্রম করে উর্ধ্বলোকের আর এক অস্তিত্বে উত্তরণের কথা। ভাবতে হয় আমার কল্পনা আর অভিজ্ঞতার দেখাকে সকলের প্রত্যক্ষ দেখার স্তরে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবার কথা। এই একজনের একলার দেখাকে সকলের প্রত্যক্ষ দেখায় রূপান্তরিত করতে গেলে প্রথমে একটা চোখে দেখা বা কানে শোনা ঘটনার ভগ্নাংশকে আশ্রয় করতে হয়। কলমে লেখবার আগে মনে মনে সেই বাস্তব ভগ্নাংশটুকুর চারপাশে কল্পনা আর অভিজ্ঞতার মাধুরীর প্রলেপ দিয়ে দিয়ে একটা প্রতিমা গড়ে তুলতে হয়। প্রতিমাটি যদি মনের সব দাবী মেটাতে পারে, প্রতিমার মুখ-চোখ-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি আমার কল্পনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই তা নিয়ে লেখবার কথা ওঠে। তখনই কলম নিয়ে বসি। তার আগে নয়।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিলে জিনিসটা স্পষ্ট হবে।

তবে নিজের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেব না, উদাহরণটা ফরাসী সাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বালজাকের জীবনের।

বালজাক একবার এক পত্রিকার সম্পাদককে কথা দিয়েছিলেন একটা নির্দিষ্ট তারিখে তাঁর পত্রিকার জন্যে তিনি একটা গল্প লিখে দেবেন। তার দক্ষিণা হিসেবে আগাম কিছু টাকাও তিনি নিয়েছিলেন। গল্পের উপকরণ বা মাল-মশলাও যথাসময়ে জোগাড় হলো। গল্পটা একজন শিল্পীকে কেন্দ্র করে। শিল্পী একজন বেহালা-বাজিয়ে। কেমন করে গল্পটা আরম্ভ করবেন, কেমন করে মাঝখানটা লিখবেন, তারপর শেষের শীর্ষবিন্দুটাও কেমন করে গড়ে উঠবে তাও স্থির হয়ে গেল। সমস্ত যখন ঠিক হয়ে গেছে তখন লিখতে শুরু করতে গিয়ে মুশকিল হলো নায়কের নাম নিয়ে। যে-নামই ঠিক করেন তা পরে পছন্দ হয় না।

শেষকালে নির্দিষ্ট তারিখও এসে গেল। তবু গল্পের একটা অক্ষরও লেখা হলো না।

যথা সময়ে সম্পাদক এসে হাজির।

জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? গল্প কই? আমি যে এদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছি আপনার গল্প যাচ্ছে। আপনার গল্প না দেখতে পেলে যে পাঠকরা আমার বদনাম করবে—

বালজাক বললেন—গল্প আমার বলতে গেলে লেখা হয়েই গেছে, শুধু নায়কের যুৎসই একটা নাম পাচ্ছি না বলে আরম্ভ করতে দেরি হচ্ছে, আর একটা দিন সময় দিন আমাকে—

সম্পাদক ক্ষুণ্নমনে বিদায় নিলেন। কিন্তু বালজাকের মাথায় তখন বজ্রাঘাত। আকাশ-পাতাল খুঁজে-খুঁজেও একটা পছন্দসই নাম আর মাথায় আসে না। নায়কের পেশা হচ্ছে বেহালা বাজানো। যে-লোক বেহালা বাজায়, যে-লোক আর্টিস্ট তার একটা যা-তা নাম দিলে চলে না। নামের দোষে সমস্ত গল্পটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে!

যখন মনে মনে তিনি এই রকম ছট্‌ফট্ করছেন সেই সময়ে এক বন্ধু বাড়িতে এসে হাজির। সব শুনে বন্ধু বললেন—একটা সামান্য নামের জন্যে তুমি এত ভাবছো? যা-তা একটা নাম দিয়ে দিলেই তো হলো—

বালজাক বন্ধুকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেন। বললেন—সে তুমি বুঝবে

মাঁ। বুঝলে তুমিও লেখক হয়ে যেতে—আমার এ-গল্পে নামটাই আসল। খারাপ নাম হলে এ-গল্পটাই মাটি হয়ে যাবে—

প্যারিসের রাস্তায় দু'পাশের সার-সার বাড়িগুলো দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন তাঁরা। বাড়িগুলোর সামনে গেটের দেয়ালে বাসিন্দাদের নাম লেখা ট্যাব্‌লেট আঁটা। কারো নাম টম্, কারো নাম ডিক্, আবার কারো নাম বা হ্যারি। একটা নামও পছন্দ হয় না বালজাকের। আবার চলতে লাগলেন। চলতে চলতে একটা নামের কাছে এসে বালজাক থম্‌কে দাঁড়ালেন। বাঃ, চমৎকার নামটা। এতক্ষণে তাঁর পছন্দ মাফিক নাম পাওয়া গেছে একটা।

বালজাক বন্ধুকে বললেন—তুমি একবার ভেতরে গিয়ে খবর নিয়ে এসো তো ভদ্রলোক কী করেন! নিশ্চয়ই কোনও শিল্পী হবেন ভদ্রলোক—

বন্ধু ভেতরে গেলেন আর খানিক পরে ফিরে এসে জানালেন ভদ্রলোক পেশায় একজন দর্জি।

কথাটা শুনে বালজাকের বড় দুঃখ হলো। দর্জি! এত ভালো একটা নাম পেয়েও ভদ্রলোক তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি!

বললেন—ঠিক আছে, ভগবান ভদ্রলোককে মেরেছে মারুক, আমি ভদ্র-লোককে বিখ্যাত করে ছাড়বো, আমি ওকে আর্টিষ্ট করে অমর করে দেব—

সেইদিন বাড়ি ফিরে এসে সারা রাত জেগে গল্পটা লিখে ফেললেন বালজাক। সম্পাদক পরের দিন এসে গল্পটা নিয়ে গেলেন। একজন সামান্য দর্জি বালজাককে সেদিন সৃষ্টির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলে।

এই-ই হলো গল্প লেখার গল্প। শুধু বালজাক নয়, ডিকেন্স, মোপাসাঁ, ও-হেন্‌রি, চেখভ্—সমস্ত মহৎ শিল্পীর সৃষ্টির পেছনে এই যন্ত্রণার ইতিহাস। ডিকেন্স গভীর রাত্রে লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বেরোতেন। রাস্তার ফুটপাথে ভিখিরির দল সার-সার শুয়ে থাকতো। তিনি তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের দেখতেন, তাদের সুখ-দুঃখ অনুভব করতেন, আমেরিকার ও-হেন্‌রিও তাই। শুঁড়িখানায় ঢুকে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে মাতালদের মদ খাইয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করতেন। তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের জীবনের কাহিনী উদ্ধার করে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করতেন। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ গল্প-লেখকদের এই একই কাহিনী। গল্প-লেখার-গল্পের ইতিহাস এই নিরলস অনুশীলনের ইতিহাস। বাইরের সঙ্গে অন্তরের মস্তিষ্কের সঙ্গে মননের, চির-কালের সঙ্গে ক্ষণকালের অক্লান্ত সংগ্রামের ইতিহাস।

আর আমি? আমি আমার নিজের কথা নিজের মুখে বলবো না। সেটা অহঙ্কার। আমার গল্প-লেখার-গল্পের কথা বলবার লোক যদি কখনও জন্ম নেয় তখন তার মুখে আপনারা আমার কথা শুনবেন। কিন্তু আমি হয়তো তখন থাকবো না। আর তাছাড়া নিজের জীবদ্দশায় নিজের কথা নিজের কানে শুনতেও নেই।